

গৃহে বসে কৃষ্ণভজন

গৃহে থেকেও কিভাবে
পরমেশ্বর ভগবানকে ভজন করা যায়
এবং প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ করা যায়


আদর্শ গৃহস্থ জীবন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৃহে বসে কৃষ্ণভজন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যের

অনুকম্পিত

শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের

আশীর্বাদধন্য

শ্রীতেজগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

কর্তৃক সংকলিত



ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, নিউইয়র্ক, লস এ্যাঞ্জেলেস, লণ্ডন, সিডনি, রোম

Grihe Base Krishna Vajan (Bengali)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্রীশ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীরাধাষ্টমী ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ,
৩০০০ কপি।

প্রচ্ছদপট ঃ অপূর্ব গোবিন্দ দাস
পৃষ্ঠাসজ্জা ঃ রাধিকেশ দাস

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ভূমিকা

মানবজীবন কেবল বিচারবুদ্ধি বর্জিত খেয়ালখুশিমত বেঁচে থাকামাত্র নয়; মানবজীবনের উদ্দেশ্য পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান এবং ভক্তিযোগের পন্থায় তাকে উপলব্ধি করা যায়। এই কলহ ও প্রবঞ্চনার যুগ কলিযুগে সবচেয়ে প্রামাণিক ভক্তিপথ হল সেটিই যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়েছেন।

এই ধরণীতে আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আর্বিভূত হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন স্বয়ং এবং তিনি আত্মোপলব্ধির সবচেয়ে সরল পন্থা শিক্ষা দিয়েছেন—তা হল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, ভগবানের এই দিব্যনাম পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। তাঁর বাণী ফলপ্রসূ হয়েছে; এই দিব্যনাম কীর্তন এখন আর কেবল ভারতভূমিতেই আবদ্ধ নেই, সমগ্র বিশ্বে আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের এই পন্থাকে সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাসমূহ অবলম্বন করে শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৬৬ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই জগৎ থেকে অপ্রকট হয়েছেন ১৯৭৭ সালে, কিন্তু তিনি যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন, তা ক্রমবর্দ্ধমান।

প্রতিদিন আরও বেশি বেশি মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে এবং ইসকন

ভক্তবৃন্দের সঙ্গলাভ করে অনেকেই কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে অভিলাষী হচ্ছেন।

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন খুবই সহজ, কিন্তু এর পন্থা-পদ্ধতি শেখার জন্য অপরের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। অনেকেই পরিস্থিতিগত কারণে (যেমন ইসকন কেন্দ্র থেকে দূরে বাস করা) অভিজ্ঞ ভক্তের ব্যক্তিগত সহায়তা লাভে বঞ্চিত হন, ফলে কৃষ্ণভাবনামৃতে অনুরক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেকেই তা গ্রহণ করতে পারেন না।

বিশেষতঃ এইরকম ব্যক্তিদের জন্যই এই বইটি রচিত। কিভাবে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করতে হবে, গৃহে পূজার্চনা করতে হবে, তিলক নিতে হবে, উৎসবাদি পালন করতে হবে—ব্যবহারিক সবকিছুর দিক্‌নির্দেশ এই বইয়ে রয়েছে। এই বইয়ে অধিকাংশ পন্থা-পদ্ধতি সকল ভক্তগণের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য, তবে কেবল গৃহস্থদের জন্য বিশেষ কিছু নির্দেশ এখানে সংযোজিত হয়েছে।

অবশ্য, বইটি কারও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণের কখনই বিকল্প হতে পারে না। নিজেকে অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত করতে প্রয়াসী নবীন ভক্তকে অবশ্যই কারও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে থাকতে হবে। শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "যারা সদ্‌গুরুর তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষালাভ করেননি, তাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে এমনকি উপলব্ধি করতে শুরু করাটাও অসম্ভব" (ভগবদ্‌গীতা, ১১-৫৪, তাৎপর্য)।

সুতরাং এই বইটি কেবল সদ্‌গুরুর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভের সম্পূরক ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ এই বইয়ে আলোচিত তিলক গ্রহণ করা, কীর্তন করা ইত্যাদি মত বিষয়গুলি অভিজ্ঞ ভক্তদের দেখে সরাসরিভাবে তাদের কাছ থেকে শিখে নেওয়া প্রয়োজন।

ভূমিকা

এই বইয়ে বিধৃত নিয়ম-নির্দেশাদির ভিত্তি হল শ্রীচৈতন্যদেব হতে পরম্পরাক্রমে আগত বৈষ্ণব-ধারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচারিত পন্থা, যা হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং শ্রীউপদেশামৃতের মত প্রমাণিক শাস্ত্রসমূহে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, এ-বইয়ের শিক্ষা নির্দেশাদির ভিত্তি হচ্ছে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষাসমূহ।

পূর্বতন মহান আচার্যবর্গ এবং শাশ্বত শাস্ত্রসমূহ হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত না হয়েও শ্রীল প্রভুপাদ আধুনিক মানুষের উপযোগী করে কৃষ্ণভাবনামৃতকে উপস্থাপন করেছেন।

বৈষ্ণবীয় আচার অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনার সাথে সাথে নবীন কৃষ্ণভক্তদের জন্য অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অবশ্য এখানে কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন আলোচনা করা হয়নি, কেননা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহেই তা বিশদভাবে রয়েছে। যারা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট বিশ্বাসী হয়েছেন ও নিজেদের জীবনে তা প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক, এই বইটি তাদের সাহায্য করবে। এই বইয়ে আলোচিত আচার-অভ্যাসাদি যুক্তিসিদ্ধভাবে গ্রহণ করতে হলে নিষ্ঠাবান পাঠকবৃন্দের নিয়মিতভাবে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করা কর্তব্য।

কৃষ্ণভক্তির এই সরল বিধিনির্দেশগুলি অনুসরণের মাধ্যমে বয়স, জাতি, ধর্মমত, নারী-পুরুষ বা যোগ্যতা-নির্বিশেষে যে-কোন মানুষ সহজেই তাঁর অস্তিত্বকে পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করতে পারেন। এভাবে তিনি ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম বিকশিত করতে পারবেন; তিনি নিশ্চিতভাবে এই জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণাময় আবর্ত হতে চিরতরে রক্ষা পাবেন এবং আনন্দময় ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত

হতে পারবেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত মহান সংকীর্তন আন্দোলন সারা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে এই অনবদ্য সুযোগ দান করেছে।

বর্তমান গ্রন্থকার তাই পূর্ণ নিষ্ঠার সংঙ্গে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করার জন্য সকল পাঠকবৃন্দের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আহ্বান করেছেন, "জীব! জাগো, জেগে ওঠো! আর কতদিন মায়া পিশাচীর কোলে ঘুমিয়ে থাকবে? তোমাদের জড়রোগ নাশ করার জন্য আমি ওষুধ এনেছি। আর তা হল নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

মঙ্গলাচরণ

শ্রীগুরুপ্রণাম

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে ।
স্বয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্ব-পদান্তিকম্ ॥

অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে আমার জন্ম হয়েছিল, এবং আমার গুরুদেব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দিয়ে আমার চক্ষু উন্মীলিত করলেন। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূর্ণ করবার জন্য এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আমি কবে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করতে পারব?

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে, এবং পরম্পরাধারায় গুরুবর্গ, সমস্ত বৈষ্ণব, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সগণ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী, অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং পরিজন সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু, শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহিত ললিতা বিশাখাদি যুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে ।
নির্বিশেষ-শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত ও একান্ত প্রিয়ভক্ত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভুপাদ, হে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য, কৃপাপূর্বক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের দ্বারা, নির্বিশেষবাদ ও শূন্যবাদপূর্ণ পাশ্চাত্যদেশ উদ্ধারকারী, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রণতি

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোঽস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণীশ্রীমূর্তয়ে দীনতারিণে।
শ্রীরূপানুগবিরুদ্ধাপসিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রিত ও একান্ত প্রিয়ভক্ত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

যিনি শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাধন্য, অপ্রাকৃত কৃপাসিন্ধু এবং কৃষ্ণবিজ্ঞান বিতরণকারী, সেই শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িত দাসকে (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অপর নাম) আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল রূপ গোস্বামীর ধারায় আগত, রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য প্রেমের দ্বারা সমৃদ্ধ ভগবৎ-ভক্তি দানকারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণাশক্তি বিগ্রহ, আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ আপনাকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি হচ্ছেন পতিত জীবদের উদ্ধারকারী। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রকাশিত ভগবৎ-ভক্তির কোনও বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত আপনি সহ্য করেন না।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী প্রণতি

নমো গৌরকিশোরায় সাক্ষাদ্-বৈরাগ্যমূর্তয়ে ।
বিপ্রলম্ভরসাম্ভোধে পাদাম্বুজায় তে নমঃ ॥

সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্তি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজকে (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব) আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি সর্বদাই বিরহের অনুভূতিতে এবং প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমে নিমগ্ন থাকেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণতি

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে ।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত শক্তিস্বরূপ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তিনি হচ্ছেন শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রমুখ গোস্বামীদের একনিষ্ঠ অনুগামী।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী প্রণতি

শ্রীগৌরাবির্ভাবভূমেস্ত্বং নির্দেষ্টা সজ্জনপ্রিয়ঃ ।
বৈষ্ণব-সার্বভৌমঃ শ্রীজগন্নাথায় তে নমঃ ॥

সমগ্র বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থল আবিষ্কারক বৈষ্ণব সার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীবৈষ্ণব প্রণাম

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

সমস্ত বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, যাঁরা বাঞ্ছাকল্পতরুর মতো সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, যাঁরা কৃপার সাগর এবং পতিত পাবন, তাঁদের চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রণাম

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

আমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতার অপেক্ষা উদার, তিনি অত্যন্ত দুর্লভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেছেন, তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীপঞ্চতত্ত্ব প্রণাম

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্ত অবতার, ভক্ত এবং ভক্ত শক্তি এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

ভক্তরূপ—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু; ভক্তস্বরূপ—নিত্যানন্দ প্রভু, ভক্তাবতার—অদ্বৈত আচার্য প্রভু, ভক্ত—শ্রীবাস ঠাকুর, ভক্তশক্তি—শ্রীগদাধর পণ্ডিত।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি করুণার সিন্ধু, তুমি দীনের বন্ধু, তুমি সমস্ত জগতের পতি, তুমি গোপিকাদের ঈশ্বর এবং শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমাস্পদ, আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীরাধারাণী প্রণাম

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি ।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

শ্রীমতী রাধারাণী, যাঁর অঙ্গকান্তি তপ্ত কাঞ্চনের মতো এবং যিনি বৃন্দাবনের ঈশ্বরী, যিনি মহারাজ বৃষভানুর দুহিতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী, তাঁর চরণকমলে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীর প্রণাম মন্ত্র

নীলাচলনিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে ।
বলভদ্র সুভদ্রাভ্যাং জগন্নাথায় তে নমঃ ॥

পরমাত্মা স্বরূপ যাঁরা নিত্যকাল নীলাচলে বসবাস করেন, সেই বলদেব, সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবকে প্রণতি নিবেদন করি।

সম্বন্ধাধিদেব প্রণাম

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী ।
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

আমি পঙ্গু ও মন্দমতি; যাঁরা আমার একমাত্র গতি, যাঁদের পাদপদ্ম আমার সর্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধামদনমোহন জয়যুক্ত হোন।

অভিধেয়াধিদেব প্রণাম

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্প-দ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ ।
শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

জ্যোতির্ময়-শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের অরণ্যে কল্পবৃক্ষতলে রত্ন-মন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ (সখীগণ) কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন। আমি তাঁদের স্মরণ করি।

প্রয়োজনাধিদেব প্রণাম

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

রাসনৃত্য রসের প্রবর্তক বংশীবট-তটস্থিত পরম সুন্দর শ্রীগোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র

(জয়) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস আদি গৌরভক্তবৃন্দের জয় হোক।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

হরে—ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর নাম 'হরা', সম্বোধনে হরে। কৃষ্ণ—সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। রাম—সর্ব আনন্দের আধার পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য নাম।

হে ভগবানের-হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী, হে সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, হে সর্বানন্দদায়ক ভগবান, আপনারা আমাকে কৃপাপূর্বক আপনাদের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করুন।

কৃষ্ণভজনের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক জীবসত্তাই স্বরূপতঃ কৃষ্ণভাবনাময়। সাধনা হল আমাদের সুপ্ত কৃষ্ণচেতনা জাগ্রত করার পন্থা। এটিকে একটি শিশুর বিকাশের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। একটি শিশুর মধ্যে হাঁটা, কথা বলা এবং আরো সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু তা সুপ্ত, যা সময় এবং শিক্ষার প্রভাবে ক্রমশঃ বিকশিত হবে।

ভজন বা সাধনা হল সেইসব ভক্তদের জন্য, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার জন্য অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প এবং যাঁরা একথা অবগত যে সাধনা ব্যতীত কোন যথার্থ পারমার্থিক জীবন লাভ করা সম্ভব নয়।

ভজন বা সাধনার অর্থ হল "পারমার্থিক অনুশীলন"। ভক্তিযোগ অনুসারে ভজন হল মূলতঃ কৃষ্ণ-বিষয়ক শ্রবণ-কীর্তন। তা আমাদের কলুষিত হৃদয়কে নির্মল করার জন্য অত্যন্ত শক্তিসম্পন্ন এবং এই শ্রবণ-কীর্তন ধীরে ধীরে আমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্তী করে।

অবশ্য ভজন হওয়া চাই নিষ্ঠাপূর্ণ এবং সুনিয়মিত। প্রাত্যহিক ভজন আমাদেরকে মায়ার প্রলোভন হতে রক্ষা পেতে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে। সাধনায় এরকম নিষ্ঠাপরায়ণ না হলে কৃষ্ণভাবনায় কোন সত্যিকার উন্নতি লাভ প্রায় অসম্ভব। এমন কি আমাদের যদি কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন অনুভব-অনুভূতি থাকেও, ভক্তি-অনুশীলন ব্যতীত তা কখনই গভীরতা লাভ করবে না।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর মন্দিরসমূহে ভোরে ও সন্ধ্যায় ভজনের কার্যক্রম প্রবর্তন করেছিলেন। ভোরের কার্যক্রম শুরু হয় অন্ততঃ চারটেয় ওঠার মধ্য দিয়ে। নিষ্ঠাসম্পন্ন ভক্তদের জন্য ভোরে

শয্যাত্যাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কারণ সকাল হয়ে যাবার আগের সময়টিই (ব্রাহ্মমুহূর্ত) পরমার্থ সাধনের জন্য সবচেয়ে অনুকূল।

শয্যাত্যাগের পর, ভক্তগণ স্নান করে এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে মন্দিরে যান। তারপর তাঁরা মঙ্গল আরতি ও তুলসী আরতিতে যোগদান করেন, জপমালায় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন। এরপর তাঁরা গুরুপূজায় যোগ দেন এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন। সকালের কার্যক্রমটি চার থেকে সাড়ে চার ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। দেড় ঘন্টার সান্ধ্য কার্যক্রমে আরতি এবং ভগবদ্গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এইভাবে শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে তাঁর শিষ্যরা যেন প্রতিদিন প্রায় ছয় ঘন্টা ভজনের জন্য একত্রে সমবেত হয়।

গৃহে বসবাসরত এবং অন্যান্য ব্যস্ত ভক্তদের কাছে ভজনের জন্য এতটা সময় ব্যয় অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। আধুনিক যুগের কলরোলে ব্যস্ততা-মুখর জীবনে খুব কম মানুষই তাদের পরিবার প্রতিপালনের বাইরে অন্য কিছু করার সময় পায়। কিন্তু যে-জীবনে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার চেয়ে উচ্চতর কোন লক্ষ্য নেই, তা পশুজীবনের থেকে উন্নত কিছু নয়। যথার্থ মানবজীবনে পরমার্থ-অনুশীলনেরই অগ্রাধিকার, দেহরক্ষার জন্য কার্যকলাপ সেখানে গৌণ।

যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছেন, যাঁরা বুঝতে পেরেছেন—ভগবদ্ভক্তি ছাড়া জীবন অর্থহীন, তাঁরা যেভাবেই হোক, ভজনের জন্য কিছুটা সময় প্রাত্যহিক জীবনে নির্ধারিত রাখবেন।

এজন্য নবীন ভক্তের জীবনধারায় কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে। এমনকি এজন্য কাজ কমাতে এবং আর্থিক উপার্জন হ্রাস করতে হতে পারে, যাতে পারমার্থিক উন্নতিসাধনের জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়। যে-পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মরত,

সেক্ষেত্রে স্ত্রীটি তাঁর কাজ ছেড়ে দিয়ে গৃহকর্মাদি সুশৃঙ্খলভাবে করলে গৃহে অধ্যাত্ম-চর্চার পথ সুগম হবে।

এমনকি আমরা যদি আমাদের জীবনধারায় এমন বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে সক্ষম নাও হই, আমরা আমাদের হাতে যেটুকু সময় থাকে, তার সদ্ব্যবহার করতে পারি। অধিকাংশ মানুষই তাঁদের মূল্যবান সময় অর্থহীন প্রলাপে ও টিভি দেখার মত বৃথা চপলতায় নষ্ট করে। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের জন্য যতটা সম্ভব সময় বাঁচানোই প্রকৃত কল্যাণপ্রদ।

কিভাবে ভজন করতে হবে, এই বইয়ে তা আলোচিত হয়েছে। প্রাত্যহিক কার্যক্রম অধ্যায়টিতে ভজন কার্যক্রমের একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। পাঠকবৃন্দ যদি তাদের দৈনন্দিন জীবনে এই ভক্তিক্রিয়াগুলি সাধ্যানুসারে অভ্যাস করেন, তাহলে জীবনের যে পরমোদ্দেশ্য—শুদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম লাভ—তা অবশ্য সফল হবে।

পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম, তা'রা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফলে হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬/২৭৯-২৮১)

কৃষ্ণভজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য

আমরা স্বরূপতঃ দেহ নই, চিন্ময় আত্মা। দেহ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু প্রতিটি দেহে অবস্থানকারী জীবাত্মা নিত্য, অবিনশ্বর। প্রত্যেক জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক নিত্য,

আনন্দময় মধুর সম্বন্ধ রয়েছে। আমাদের প্রকৃত জীবন এই জড়জগতের নয়—তা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধামে।

অপ্রাকৃত জগৎ সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রভুত্বাধীন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অগণিত প্রেমপরায়ণ সেবকগণের দ্বারা নিয়ত পরিবৃত হয়ে বিরাজ করছেন। এই সেবকগণ পরিপূর্ণভাবে শুদ্ধভক্ত। তাঁরা সকলেই পূর্ণতার স্তরে অধিষ্ঠিত; তাঁদের কেবল একটি বাসনা রয়েছে ঃ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দবিধান করা। জড়জাগতিক কামনাবাসনা লোভ ও ঈর্ষা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

চিন্ময় জগতে ভূমি, বৃক্ষসমূহ, গৃহাদি, জল—সবই অপ্রাকৃত, চিন্ময়, আনন্দময়। সেখানে শোকদুঃখের কোন অস্তিত্ব নেই—রয়েছে কেবল অবিচ্ছিন্ন আনন্দসম্ভোগ। এই আনন্দ জড়জগতের পুঁতিগন্ধময় অলীক ইন্দ্রিয়সুখ নয়—তা হল কৃষ্ণ-সম্বন্ধিত প্রকৃত অর্থপূর্ণ চিন্ময় পরমানন্দ। শ্রীকৃষ্ণ গোলক-বৃন্দাবনে তাঁর অন্তরঙ্গ-ভক্ত-পার্ষদগণের সংগে নিত্যকাল ধরে চিন্ময় বৈচিত্রে পূর্ণ অনুপম লীলাবিলাস সম্পাদন করছেন। এটি হল পরমপুরুষ ভগবানের সংগে নৃত্য, গীত, ক্রীড়া এবং ভোজনের এক মধুর নিরবচ্ছিন্ন আনন্দোৎসব।

যে-সমস্ত জীবসত্তা ভোগকামনাজনিত প্রমত্ততা-বশতঃ কৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়ে, তারা জড়জগতে অধঃপতিত হয়। এই জড়জগৎ হল শাস্তি দ্বারা সংশোধিত করার এক কারাগার বা সংশোধনাগার বিশেষ। বদ্ধজীব এখানে চুরাশি লক্ষ জীব-প্রজাতির বিভিন্ন জীবদেহে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে পতিত হচ্ছে। মায়ার প্রভাবে এবং মিথ্যা অভিমানে মোহিত হয়ে বদ্ধ জীবাত্মা এমনকি একটি বিষ্ঠাহারী শূকর-দেহে অবস্থানকালেও নিজেকে সুখী বলে নিম্নতম থেকে উচ্চতম লোক—সবই দুঃখ-শোকের এক মহাসাগর ছাড়া কিছু নয়।

আমরা এই জড়জগতে অন্তহীন দুঃখ ক্লেশ ভোগ করে চলব—কৃষ্ণ তা চান না। তাঁর সংগে চিরকাল আনন্দে বাস করার জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা "শ্রীভগবদ্গীতা যথাযথ"-তে বিধৃত তাঁর কথা শ্রবণ করছেন এবং তাঁরা পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর সমস্যাটির সমাধান করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা তাঁদের সুপ্ত কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত করার জন্য এবং ভগবানের কাছে ফিরে যাবার জন্য কৃষ্ণের প্রতি প্রীতিময় ভক্তিসেবায় নিযুক্ত হচ্ছেন।

কৃষ্ণ স্বয়ং এই কলিযুগে তাঁর সবচেয়ে করুণাময় অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-রূপে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিয়েছেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন, যা হল ভগবানকে জানার সবচেয়ে আনন্দময় পন্থা। এটি হচ্ছে 'কেবল আনন্দ-কন্দ'।

কৃষ্ণভাবনামৃত মানেই হল সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন, পরমানন্দে নর্তন, কৃষ্ণপ্রসাদ ভোজন, শুদ্ধ ভক্তসঙ্গলাভ, পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন, শ্রীবিগ্রহের অনুপম সৌন্দর্য-আস্বাদন, কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদি শ্রবণ এবং কৃষ্ণ-মহিমা কীর্তন। এটি হল এক ক্রমবর্দ্ধমান আনন্দের জীবন এবং এভাবে এমন স্তরে উপনীত হওয়া যায় যেখানে আমরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করতে পারি এবং সরাসরি তাঁর সংগে কথপোকথন করতে পারি।

জীবনে যথার্থ পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত হল একটি পরীক্ষিত, আচরিত এবং প্রমাণিত পন্থা। অতীতে বহু বহু ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনা দ্বারা নির্মল, বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম লাভ করেছেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদেরকে তাঁর সংকীর্তন আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের প্রতি যে অপূর্ব করুণা প্রদর্শন

করেছেন, তা কেবল যাঁরা পারমার্থিক দিক দিয়ে উন্নত চেতনাসম্পন্ন তাঁরাই উপলব্ধি করতে সক্ষম। তাঁরা কৃষ্ণভক্তিকে পূর্ণ ঐকান্তিকতায় গ্রহণ করেন এবং এই জন্মকেই জড়জগতে তাঁর অন্তিম জন্মে পরিণত করার জন্য বদ্ধ পরিকর হন।

এমনকি সামাজিক ও ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেও কৃষ্ণভাবনামৃত এতই সুন্দর যে তা প্রত্যেকেরই বহুবিধ কল্যাণ সাধন করে। কেবল ভক্তিমূলক সেবাচর্চার মাধ্যমে ভক্তদের মধ্যে সকল সদ্‌গুণের স্ফুরণ ঘটে। তাঁরা দয়ালু, সহনশীল, সংযমী, বিনম্র, শান্ত এবং সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। এছাড়া, কৃষ্ণভাবনামৃত এমনকি সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং ধর্মীয় সমস্যাসমূহেরও পরম সমাধান দেয় (কিভাবে, তা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহে পূর্ণরূপে আলোচিত হয়েছে)।

সেইজন্য প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের কর্তব্য হল কালক্ষেপ না করে পূর্ণ ঐকান্তিকতায় কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করা।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যা'র ।
জন্ম স্বার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৯/৪১)

কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৭/১৪৮)

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি—৭/৭৩)

গৃহে কৃষ্ণভজনের অনুকূল পরিবেশ

সংস্কৃতে গৃহীদের প্রতি প্রযুক্ত দুটি অভিধা রয়েছে : "গৃহস্থ" এবং "গৃহমেধী"। "যিনি গৃহে পুত্র কলত্র সহ বাস করছেন এবং জীবনে পরমোদ্দেশ্য সম্পর্কে নিজে অবগত ও তা অর্জনে তৎপর—তিনি হচ্ছেন গৃহস্থ", আর অধ্যাত্মভাবনা-বর্জিত অন্য সকল গৃহীদের (সাধারণ জড়বিষয়াসক্ত মানুষ) বলা হয় "গৃহমেধী"। গৃহস্থের গৃহকে বলা হয় "গৃহস্থ-আশ্রম"। এটি একটি আশ্রম, কেননা এটি পরমার্থ-অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, আর সমগ্র গৃহাঙ্গনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র একটি মন্দির এখানে রয়েছে।

পরিবারের সদস্যগণ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের দাস বলে মনে করেন এবং প্রতিটি কর্ম তারা কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য তাঁকে উৎসর্গ করেন। গৃহে ভগবদ্‌বিগ্রহের উপাসনা এরকম সেবার মনোভাব অর্জনের সহায়ক। সেজন্য গৃহস্থের পক্ষে বিগ্রহ-আরাধনা অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেননা অন্যথায় তারা সহজেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পড়তে পারেন।

গৃহে অপ্রাকৃত পরিবেশ রচনা করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধভক্তদের আলেখ্য-চিত্রাদি রাখুন। চিত্র-তারকা, খেলোয়াড়, রাজনীতিবিদ্ এবং এরকম অন্য কারও স্থান কোন কৃষ্ণভাবনাময় গৃহে নেই; সেজন্য এদের ছবি থাকলেও তা সরিয়ে ফেলা কর্তব্য।

গৃহকে প্রবলভাবে অধ্যাত্ম-ভাবময় করে তোলার একটি খুব কার্যকর উপায় হল পূর্ব এক সেট শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী গৃহে রাখা। এই গ্রন্থগুলি ভগবানের শাস্ত্ররূপ অবতার এবং তাই সেগুলি বিগ্রহদের মতই পূজ্য।

ভক্তিমূলক ভিডিও প্রদর্শনের জন্য টেলিভিশনকে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে এটি একটি উৎপাত বিশেষ। এগুলি বর্জন করে চলতে পারলেই গৃহের মঙ্গল। টিভিকে প্রায়ই 'বোকা-বাক্স (Idiot box) বলা হয়, কেননা যে-সব কার্যক্রম টিভিতে দেখানো হয়, তা মূলতঃ অসার অর্থহীন জড়ীয় বিষয় মাত্র। টিভিকে বিদায় দিন। বরং গৃহে কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ করুন! ভাবছেন অসম্ভব? বিন্দুমাত্র অসম্ভব নয়। সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় নিমগ্ন হোন; সুন্দরভাবে তাঁর আরতি করুন, তাঁর দিব্যনাম উল্লাসভরে কীর্তন করুন ঃ দেখুন কেমন অচিরেই আপনি বোকা-বাক্স-র প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছেন!

রেডিও শোনা আর সিনেমায় চটুল গান বাজানোর পরিবর্তে বৈষ্ণব ভজন গান করুন আর শুদ্ধভক্তিময় ভজনের ক্যাসেট শ্রবণ করে অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করুন।

শৈশব থেকে সন্তানদের কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দান করা পিতামাতার কর্তব্য। গৃহে পিতার একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে—তাঁকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের গৃহের শিক্ষকস্বরূপ হতে হয়। সকলকে সযত্নে কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা তাঁর কর্তব্য।

অধনা অপি যে ধন্যাঃ সাধবো গৃহমেধিনঃ ।
যদগৃহা হ্যর্হবর্যাম্বু-তৃণভূমীশ্বরাবরাঃ ॥

(সনৎ কুমারাদি ঋষিগণের ন্যায়) (যাহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায়) পূজ্যতম সাধুগণের সেবা-যোগ্য জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবাসম্ভার বর্তমান থাকে, তাহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নির্ধন হইলেও ধন্য) (ভাঃ ৪/২২/১০)

শুণ মিশ্র, কলিকালে নাহি তপ, যজ্ঞ ।
যেইজন ভজে কৃষ্ণ, তার মহাভাগ্য ॥

অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া ।
সংশয় পরিহরি একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল ।
হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল ॥ (চৈঃ ভাঃ)

কৃষ্ণভাবনামৃতের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়

ভারতবর্ষে প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কম-বেশি অবগত। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু অসাধু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তধারণা প্রচার করেছে। ফলে, স্বাভাবিক কৃষ্ণভাবনাময় প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীরা এখন প্রকৃত কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। সেজন্য যাঁরা বিশুদ্ধ কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করতে চান, তাদের এ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে যে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে তাঁরা ইতিপূর্বে যা শুনেছেন তা আসলে পুরোপুরি ভুলে ভরা এবং তা আমাদের বিপথগামী করে।

বর্তমানে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধরণা এরকম ঃ

১। কৃষ্ণ একজন পৌরাণিক ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না (এবং এখনও নেই)।

২। কৃষ্ণ একজন মহান মানব ছিলেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান বলে কিছু নন।

৩। কৃষ্ণ ছিলেন নৈতিকতাবর্জিত।

৪। অনেক দেব-দেবী বা ঈশ্বর রয়েছেন, তাঁরা সকলেই এক, আর তাদের কারও পূজা কৃষ্ণ-পূজারই সমতুল্য।

৫। ধ্যান-চর্চা এবং সাধনার দ্বারা যে-কেউ কৃষ্ণের মত ভগবান হয়ে যেতে পারে।

৬। ব্যক্তি কৃষ্ণের পূজা নয়, কৃষ্ণের মধ্যেকার জন্মরহিত শাশ্বত সত্তার পূজা করা কর্তব্য।

৭। যখন কৃষ্ণ আমার প্রতি সদয় হবেন ও কৃপা করবেন, তখন আমি তাঁর প্রতি শরণাগত হব।

৮। ভক্তি হচ্ছে জ্ঞান লাভ করার একটি ক্রম বা ধাপ মাত্র।

এই সব মনগড়া ধারণাগুলির কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, এগুলির কোন শাস্ত্র সমর্থনও মেলে না। এগুলি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে-ভাবেই হোক হিন্দু সমাজে এই ধারণাগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এরকম ভজন ভজন কল্পনাপ্রসূত বিভ্রান্তিকর মতবাদ প্রতিনিয়ত প্রচারিত হচ্ছে। তা প্রচার করছে ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ কিছু লোক যাদের একমাত্র কাজই হল নিজেদেরকে ধার্মিক হিসাবে জাহির করা, আর সেই সাথে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য-যা হল পূর্ণ ভগবৎ শরণাগতি—সে উদ্দেশ্য থেকে তাদের অনুগামীদেরকে বিচ্যুত করা। কৃষ্ণ স্বয়ং এই প্রকার পূর্ণ শরণাগতি তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে আকাঙ্খা করেন ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না।" (ভগবদ্গীতা, ১৮/৬৬)

অনেকেই রয়েছে যাদের ধার্মিক সাধু বলে মনে হয়, কিন্তু তাদের যদি সর্বকারণের পরমকারণস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করতে এবং তাঁর প্রতি শরণাগত হতে বলা হয়, তাহলে তাঁরা সরাসরি তা করতে অস্বীকার করে। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ এদেরও বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

"মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিকভাবাপন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা আমার শরণাগত হয় না।" (ভগবদ্গীতা, ৭/১৫)

যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে অভিলাষী, তাদের অবশ্যই এইসব অভক্ত এবং কপট সাধুদের দ্বারা কলুষাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকতে হবে।

যে প্রধান দুই মতবাদ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থা হতে বিচ্যুত হয়েছে সেগুলি হল মায়াবাদ এবং সহজিয়াবাদ।

মায়াবাদীরা হল নির্বিশেষবাদী, যারা শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বকে পরমতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তাদের লক্ষ্য হল 'ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া।'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্পষ্টভাবে বলেছেন, "মায়াবাদী জন হয় কৃষ্ণ অপরাধী"—(চৈতন্যচরিতামৃত)। কেন তারা অপরাধী, শ্রীল প্রভুপাদ তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা-৭/১৪৪, তাৎপর্য দ্রষ্টব্য।

মোটকথা হল, মায়াবাদ দর্শন আধুনিক ভারতীয় চিন্তাধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "মায়াবাদ ভারতের বৈদিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে"। (Conversation-5-7-76)

ভক্তি মানে হল শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ কর্তৃত্ব, তাঁর অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর নিত্য চিন্ময় রূপ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর প্রতি শরণাগত হওয়া। কিন্তু মায়াবাদীরা ভগবানের সংগে সাধারণ জীবসত্তাকে সমান বলে দেখানোর অযৌক্তিক প্রচেষ্টা করে, আর

এই প্রচেষ্টা ভক্তির ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দেয়, সেইজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যারা শাস্ত্রের মায়াবাদী ব্যাখ্যা শ্রবণ করে তাদের সর্বনাশ হয়, তাদের পারমার্থিক জীবন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।*

সহজিয়ারা হল কপট ভক্ত, যারা ভক্তিচর্চাকে অত্যন্ত হাল্কাভাবে গ্রহণ করে থাকে। ভক্তি চর্চার বিধি-সম্মত নীতি-পদ্ধতি অনুসরণ না করেও তারা নিজেদের অত্যন্ত উন্নত ভক্ত বলে কল্পনা করে।

আরও কিছু মানুষ রয়েছে, যারা কৃষ্ণভক্তিকে জনসাধারণের মধ্যে একটি ব্যবসাতে পরিণত করেছে। এরা হল কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত পেশাদার ভাগবত পাঠক, পেশাদার ভজন-কীর্তন গায়ক, কৌতুকপূর্ণ ধর্মীয় পুস্তক প্রণেতা, এবং ভণ্ড গুরুগণ। তারা যদিও খুব চমৎকার কৃষ্ণকথা বলতে পারে বা সুন্দর ভাবে গাইতে পারে, তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেবল অর্থোপার্জন করা।

এরপর রয়েছে আরও অসংখ্য ভক্ত যারা প্রামাণিক বৈষ্ণব ধারা অবলম্বন করলেও বাহ্য প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে তারা তা হতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এবং এইভাবে তারা বৈষ্ণবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভগবান বিষ্ণুর প্রতি শরণাগতির মূল মনোভাবটিই হারিয়ে ফেলেছে।

এইরকম-সব মানুষই নকল ভণ্ড অবতারদের উপাসক। কলহ ও প্রবঞ্চনার যুগ এই কলিযুগে পরিবেশ অত্যন্ত কলুষিত হয়ে

---

*শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সমগ্র গ্রন্থাবলীতে, বিশেষতঃ 'ভগবদ্গীতা যথাযথ' গ্রন্থের তাৎপর্যে মায়াবাদ দর্শনকে সুদৃঢ়ভাবে খণ্ডন করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি সুস্পষ্ট যুক্তিতে বিশদভাবে চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলার ৭ম অধ্যায়ের তাৎপর্যে মায়াবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির অসারতা প্রমাণ করেছেন। বাংলা ভাষায় তাঁর মৌলিক রচনাগুলিতে (গীতার রহস্য গ্রন্থে সংকলিত) বিষয়টি বিশ্লেষিত হয়েছে।

পড়েছে, আর সেজন্য এইসব নকল অবতারেরা মূর্খ লোকেদের মনকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলেছে যে তাদের পূজা কৃষ্ণের পূজা থেকেও অধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর এরকম সব "ভগবান"-দের অর্থহীন বাগাড়ম্বরকে তাদের বিভ্রান্ত অনুগামীরা পবিত্র দর্শনতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছে।

সমস্ত শ্রেণীর এইসব অভক্ত, আধাভক্ত এবং কপট ভক্তেরা যদিও ভক্তিময় আচরণ করছে বলে ভাণ করে, আসলে তারা বিভ্রান্ত, বিপথগামী। তারা জড়সুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হবার ফলে তাদের সমস্ত প্রার্থনা, মন্ত্র এবং পূজাকে যথার্থ পরম্পরাক্রমে আগত ভক্তেরা প্রকৃত ভক্তি বলে স্বীকার করেন না।

শ্রীল রূপ গোস্বামী এ সম্বন্ধে সতর্ক করে বিষ্ণুযামলের এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন ঃ

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা ।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥

"শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রসমূহে প্রদত্ত বিধিনির্দেশ-বহির্ভূত ঐকান্তিক নিষ্ঠাযুক্ত হরিভক্তিও কেবল উৎপাত বিশেষ বলে পরিগণিত হয়।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১-২-১০১)

বর্তমান ভারতে সবধরনের বিকৃত, কাল্পনিক মত-বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রকৃত ধর্মানুশীলন চলছে। আজকের সমাজে অসংখ্য সব তথাকথিত যোগী, স্বামী, গুরু, বাবা, অবতার, অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনকারী, ফকির এবং ভণ্ড ভগবানেরা জুড়ে বসেছে; তাঁরা সমস্ত ধরনের উদ্ভট ব্যাপার শেখাচ্ছে আর সববিষয়েই 'উপদেশ' দান করছে, কিন্তু কেবল এই তত্ত্বটি বাদ দিয়ে ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরণাগতি।

বস্তুতঃ যা কিছু বাজে, মেকি তাই চলছে, আর যা খাঁটি, অকৃত্রিম তা দুর্লভ, বিরল হয়ে উঠেছে। মেকিই যেন এখন আসলের স্থান দখল করেছে।

এ-বিষয়ে অনভিজ্ঞদের কাছে আসল-নকলের পার্থক্য বোঝা খুব কষ্টসাধ্য। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষ্ণভক্তগণকে মনে হয় "আরেকটি হিন্দু ধর্মগোষ্ঠী"। আদর্শ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত অন্যান্য অনেক ধর্ম-সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের নিজ নিজ ভজন পদ্ধতি, মন্দির, উৎসব, শাস্ত্র, গুরু, তিলক—ইত্যাদি সবই রয়েছে। সেজন্য সরল জনগণ ব্যাপারটাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ না করে প্রথমেই সিদ্ধান্ত করে ঃ "সব পথই এক"।

কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার পন্থার সাথে অপর সমস্ত পথেরই বিশাল প্রভেদ রয়েছে। প্রভেদটি হল, একমাত্র পূর্ণসত্য হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত, যা সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহে নির্ণীত হয়েছে, এবং সমস্ত তত্ত্ববিদ্ আচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। কেবল কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞান (বিশেষতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাধারা অনুসারে) আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে কিভাবে সমস্ত ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা হতে মুক্ত হয়ে পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক হিসাবে আমরা আমাদের প্রকৃত চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারি।

শ্রীল রূপ গোস্বামী সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্তির এই পন্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ঃ

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যান্য সকল অভিলাষ শূন্য শুষ্কজ্ঞান-চর্চা এবং সকাম কর্মানুষ্ঠান হতে মুক্ত হয়ে আনুকূল্যতার সাথে কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমাভক্তি।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১-১-১০)

কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি লাভে প্রত্যেক নবীন ভক্তের এই পার্থক্যটি হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন নূতন আরেকটি হিন্দু সম্প্রদায় তৈরী করছে না বা নূতন কোন দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করছে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন হল এক সাংস্কৃতিক, দার্শনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক আন্দোলন যা সমগ্র বিশ্বকে পুনরায় পারমার্থিক চেতনায় উদ্দীপ্ত করবে। সভ্যতার এক চরম দুর্দিনে গভীর তমিস্রা থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করার জন্য এই আন্দোলন নিশ্চিতভাবেই এক ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হবে। "কৃষ্ণভাবনামৃত একটি গুরুতর শিক্ষণীয় বিষয়, এটি কোন সাধারণ ধর্মমতমাত্র নয়" (আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা থেকে)। "আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন একটি অকৃত্রিম, ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অপ্রাকৃত আন্দোলন, কারণ তা ভগবদ্গীতার যথার্থ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" (শ্রীল প্রভুপাদ, ভূমিকা, ভগবদ্গীতা যথাযথ)। "কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল সমগ্র বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্যবিদ্যাগত প্রচলিত নিয়মনীতির আমূল পরিবর্তন" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র ১৮-১-৬৯)। "আমাদের কর্মসূচী অত্যন্ত মহৎ। আমাদের দর্শন বাস্তবানুগ এবং প্রামাণিক; আমাদের চরিত্র—বিশুদ্ধতম, আমাদের কর্ম প্রণালী সরলতম; কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য সবচেয়ে মহৎ।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র ১৯-৩-৭০)

কৃষ্ণভাবনামৃত তাই তাত্ত্বিক ভিত্তিহীন ধর্মীয় আবেগ থেকে সৃষ্ট নূতন আরেকটি 'ধর্মমত' নয়। এটি পরমতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, স্মরণাতীত কাল ধরে যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ঠিক যেমন এখন তা দেওয়া হচ্ছে। সত্য কখনও পরিবর্তিত হয় না, বা সত্যকে

কখনো কালের বিবর্তনের সংগে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণভাবনামৃত হল অলীক মায়া হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃত বাস্তব, মিথ্যা হতে স্বতন্ত্র সত্য, অন্ধকার থেকে পৃথক আলোক। জড়জগতের কোন মত-বিশ্বাস-দর্শনের সংগে কৃষ্ণভাবনামৃত কোন ভাবেই তুলনীয় নয়।

ভক্তজীবনে যথাযথভাবে উন্নতী লাভ করতে হলে কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন তত্ত্বগত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেবলমাত্র ভক্তিচর্চার কিছু আচার-পদ্ধতি (এই বইয়ে যেমন দেওয়া হয়েছে) অনুসরণ করলে আশানুরূপ ফললাভ দুঃসাধ্য। অন্তরের পরিবর্তন প্রয়োজন।

কৃষ্ণভক্তিমূলক সমস্ত কাজকর্মই সর্বদা কল্যাণপ্রদ; কিন্তু যদি দ্রুত উন্নতি করতে হয়, তাহলে সমস্তরকম জড়জাগতিক ধর্ম-পন্থার সংগে সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে হবে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন ঃ

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোরো না।" (ভগবদ্গীতা ১৮/৬৬)

ধর্মপন্থাগুলির মধ্যে কোনটা অকৃত্রিম বিশুদ্ধ আর কোনটা কৃত্রিম, মেকি—তা বুঝতে হলে কিছু জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন—বিশেষতঃ যাঁরা বিভিন্ন ভুল ধরণায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের পক্ষে এটা খুব জরুরী। তাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হবে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী নিয়মিত পাঠ করা (এমন কি, যদি কেউ বহু গ্রন্থপাঠে সক্ষম না হয়, তা হলে কেবল ভগবদ্গীতা যথাযথ পাঠ করলেই তাদের সকল

সন্দেহের নিরসন হবে। কেননা, এই একটি গ্রন্থেই শ্রীল প্রভুপাদ অবিসংবাদিতভাবে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠতা এবং অপর সকল পন্থার নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন করেছেন)।

এই সাথে সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করাও দরকার, যাঁরা ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা করার প্রবণতা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং সুদৃঢ়ভাবে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত।

এ-বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদের রচনা থেকে কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ

"শ্রীল রূপ গোস্বামী উপদেশ দিয়েছেন যে, যে-সমস্ত ভক্ত ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তাদের উচিত এই সমস্ত শুষ্ক জ্ঞানী, স্বর্গলোক লাভের অভিলাষী কর্মী এবং মুক্তিকামী নির্বিশেষবাদীদের প্রভাব থেকে সাবধানতার সঙ্গে তাদের ভগবদ্ভক্তিকে রক্ষা করা। ভক্তদের উচিত ভগবৎ প্রেমরূপী মহামূল্যবান রত্ন দস্যু এবং তস্করদের নিকট থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ শুষ্কজ্ঞানী এবং ভণ্ড বৈরাগীর কাছে কখনই ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।

যারা ভগবদ্ভক্ত নয়, তারা কখনই ভগবদ্ভক্তির সুফল করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব তাদের কাছে সর্বদাই দুর্বোধ্য। কেবল যেসমস্ত মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করেছেন, তাঁরাই যথার্থ ভক্তিরসের অমৃত আস্বাদন করতে সক্ষম হন।" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, অধ্যায় ৩৪, পৃঃ ৩১১)

"প্রকৃতপক্ষে, বর্তমানে আমি শুধু কেবল দেব-দেবী পূজারই সমালোচনা করছিনা,—কৃষ্ণের প্রতি পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের পরম পন্থা থেকে যা কিছু হীনতর, সবকিছুরই সমালোচনা করছি। আমার গুরুমহারাজ কখনো আপস করেননি, আর আমিও কখনো আপস

করবো না; ঠিক সেরকম আমার শিষ্যবৃন্দের কেউই যেন কখনও আপস না করে।" (শ্রীল প্রভুপাদের পত্র, ১৯-১-৭২)

অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান ।
মহাজনপথ সর্ব্বশাস্ত্র প্রমাণ ॥ (চৈঃ ভাঃ)

সাধুসঙ্গ কৃপা কিম্বা কৃষ্ণের কৃপায় ।
কামাদি 'দুঃসঙ্গ' ছাড়ি শুদ্ধ ভক্তি পায় ॥
'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে 'কৈতব' আত্মবঞ্চনা ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪/৯৩-৯৫)

দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময় ।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত ৪/১৯২-৯)

নিজগৃহে মন্দির স্থাপন

যে সমস্ত ভক্ত গৃহী, বিশেষতঃ যারা ইসকন মন্দির হতে দূরে বাস করেন, তাদের জন্য গৃহে মন্দির প্রতিষ্ঠা একটি অপরিহার্য কাজ। গৃহে মন্দির স্থাপন করা হলে এবং এই মন্দিরকে পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু রূপে গড়ে তোলা হলে তা একটি সাধারণ গৃহকে এক দিব্য স্থানে পরিণত করে।

যাদের যথেষ্ট স্থান ও সঙ্গতি আছে, তারা সাধারণতঃ পৃথকভাবে মন্দির তৈরী করে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ গৃহীভক্তরাই তাদের গৃহসংলগ্ন একটি কক্ষকে মন্দির কক্ষ বা পূজার ঘরের জন্য বেছে

নেন। আর যাদের একেবারেই জায়গা কম তারা তাদের বাসগৃহের মধ্যে উপযুক্ত স্থানে একটি পূজাবেদী স্থাপন করে নিতে পারেন।

মন্দির-কক্ষটি এমন একটি স্থান যেখানে পরিবারের সদস্যগণ কীর্তন, আরতি এবং শাস্ত্রপাঠের জন্য একত্রিত হয়; যেখানে খাদ্যবস্তু কৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়, এবং পরিবারের সদস্যদের যে-কেউ ব্যক্তিগতভাবে জপ করতে, শাস্ত্রপাঠ করতে এবং কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করতে সেখানে আসতে পারে।

এজন্য পৃথক একটি ঘর হলে সবচেয়ে ভাল হয়, কেননা তাহলে ঘরটিতে পবিত্র পরিবেশ বজায় রাখা সহজ হয়। অন্যান্য ঘরগুলি গৃহকর্মাদি, ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, বড়দের খোলামেলা ভাবে বিশ্রাম নেওয়া—ইত্যাদির কাজে ব্যবহার হয়, আর মন্দির কক্ষটি শুধুমাত্র পরমার্থ-চর্চার জন্য কঠোরভাবে সংরক্ষিত রাখতে হয়।

মন্দির-কক্ষটি বিগ্রহ-প্রকোষ্ঠ এবং প্রার্থনা-গৃহ, এই দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে। মন্দির কক্ষের শেষ প্রান্তে একটি ভাগে বিগ্রহ-প্রকোষ্ঠ তৈরী হয়। একটা পর্দার সাহায্যে এটিকে প্রার্থনা গৃহ থেকে পৃথক রাখা হয়। যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে পৃথক কোন মন্দির কক্ষের স্থান সংকুলান হচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে বিগ্রহ-সমূহকে একটি পর্দা দ্বারা অন্তরালে রাখতে হয়।

গৃহে ভগবান এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের আলেখ্য (চিত্র) রূপের পূজা করা যেতে পারে। পরবর্তীতে যখন ভক্ত পূজা-আরাধনায় খুব অভিজ্ঞ এবং উন্নত হয়ে ওঠেন, তখন মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বস্তুতঃ, যে-সমস্ত গৃহীভক্ত দীক্ষালাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তারা বিগ্রহ আরাধনা করবেন, এটাই প্রত্যাশিত।

কেবল একজন বৈষ্ণব গুরুদেবের তত্ত্বাবধানে উন্নত স্তরের বিগ্রহ পূজা-অর্চনা শুরু করা কর্তব্য; সেজন্য এরকম অর্চন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ এই বইয়ে দেওয়া হয় নি। যদি আরাধক ভক্তের হৃদয়ে যথার্থ ভক্তি থাকে, তাহলে ভগবানের আলেখ্যরূপ (চিত্র-রূপ) কাষ্ঠ, প্রস্তর বা ধাতুনির্মিত ভগবদ্বিগ্রহের তুলনায় কোন অংশে নূন্য নয়। তবে যেহেতু বিগ্রহপূজা খুব জটিল এবং বিস্তৃত, সেজন্য অত্যন্ত অধ্যবসায়শীল নিষ্ঠাপরায়ণ ভক্তরাই কেবল বিগ্রহ পূজার্চনার অনুমোদন ভাল করতে পারেন।

একটি আদর্শ পূজাবেদীতে নিম্নলিখিত আলেখ্যগুলি থাকা উচিত ঃ

১) সম্প্রদায় আচার্যবর্গ ঃ ক) ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ; খ) শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গ) শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ এবং ঘ) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর (কোন কোন ভক্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীগুরুদেব শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী-র আলেখ্যও রাখেন)

২) বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী (শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামী) ঃ এঁরা হলেন মহাপ্রভুর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যবৃন্দ, যাঁরা মহাপ্রভুর নির্দেশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বসমূহ এবং বৈষ্ণব আচার-বিধি জগতে প্রচার করেছিলেন।

৩) পঞ্চতত্ত্ব (মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর চারজন পার্ষদ)।

৪) ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব ঃ ভক্তগণ ভগবানের এই বিশেষ রূপটির পূজা করেন এইজন্য—ক) শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তদেরকে ভগবৎ

বিদ্বেষী অসুরদের থেকে এবং নানাবিধ বাধা-বিপত্তি থেকে রক্ষা করেন; এই তিমিরাচ্ছন্ন কলিযুগে এই দুই-ই অত্যন্ত প্রবল, এবং খ) ভক্তের অন্তর থেকে আসুরিক চিন্তা-কামনা দূরীভূত করতেও তিনি ভক্তদেরকে বিশেষভাবে কৃপাশক্তি প্রদান করেন।

৫) রাধা-কৃষ্ণ

৬) শ্রীগুরুদেব ঃ দীক্ষাগ্রহণের পর, অথবা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসকনের কোন গুরুদেবের আশ্রয় দেবার পর গুরুদেবের আলেখ্যও বেদীর উপর রাখতে হয়।

এটা গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করতে হবে যে, যাঁরা উপাস্যগণের মধ্যে পারমার্থিক ক্রমোচ্চতা অনুসারে শ্রেষ্ঠ, বেদীতে তাদেরকে সবসময় তাঁদের উপাসকদের থেকে উচ্চে স্থাপন করা হয়। যেমন, গুরুদেবের আলেখ্য কখনও শ্রীকৃষ্ণের আলেখ্য থেকে উচ্চে রাখা হয় না। পঞ্চতত্ত্বগণ রাধাকৃষ্ণের পূজা করেন এবং সম্প্রদায় আচার্যগণ পঞ্চতত্ত্বের উপাসক। সেজন্য পঞ্চতত্ত্বকে রাধাকৃষ্ণের নিম্নে, কিন্তু সম্প্রদায়-আচার্যগণের উপরে স্থাপন করতে হয়।

বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রকাশ বিগ্রহ, অন্তরঙ্গা শক্তি এবং শুদ্ধ ভক্তবৃন্দসহ পূজিত হন। এর চেয়ে ন্যূনতর পূজা—যেমন দেব-দেবী পূজা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অনুমোদিত হয়নি। সেজন্য কোন্ কোন্ আলেখ্যগুলি পূজাবেদীতে রাখা যেতে পারে, সে বিষয়ে বৈষ্ণবেরা অত্যন্ত বিচারশীল। এছাড়া অন্যান্যসব শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি যেমন দেবদেবী, পিতামাতা—এঁরা নিশ্চয় সম্মানযোগ্য, তবু তাঁরাও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্রে পূজিত হবার যোগ্য নন। বলা বাহুল্য, ভণ্ড অবতার এবং মেকি সাধুদের বেদীতে কোন স্থান নেই।

সবচেয়ে ভালো হয় যদি কাঠ বা অন্যান্য দ্রব্যাদি দিয়ে বিশেষভাবে একটি পূজাবেদী করে নেওয়া হয়, যাতে সমস্ত

আলেখ্যগুলিকে তার উপর সুন্দর করে সাজানো যায়। একটি ছোট আরতি-পাত্র বা রেখাবি রাখার জন্য তিনফুট উঁচু একটি ছোট টুল বেদীর সামনে বাঁদিকে (বেদীর দিকে কেউ মুখকরে দাড়ালে তার বাঁদিকে) রাখতে হয়। ভোগ নিবেদনের জন্য আরেকটি এক ফুট উঁচু ছোট চৌকি দরকার। পূজার সময় বসার জন্য একটি কুশাসনও প্রয়োজন।

মন্দিরকক্ষ প্রতিদিন ফুল, মালা ইত্যাদি দিয়ে রুচিসম্মতভাবে সাজালে ভাল হয়। সুন্দরভাবে পূজার জন্য যত ব্যায় করা যায় ততই ভাল। যাদের অর্থনৈতিক সামর্থ অত্যন্ত কম, তারাও তাদের সাধ্যানুসারে যত সুন্দরভাবে সম্ভব পূজার্চনা করবেন।

মন্দির কক্ষে অনেক বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সেগুলির তালিকা রয়েছে। অবশ্য পারিবারিক ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সব বিধিনিয়ম কার্যকরী করা সম্ভব নয়, তবু যতদূর সম্ভব উচ্চমান বজায় রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

মন্দিরকক্ষ এমনই স্থান যেখানে আমরা অন্তত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রভু কৃষ্ণকে ব্যক্তিগতভাবে আসার এবং গৃহে প্রভু হিসাবে বিরাজিত থাকার আমন্ত্রণ জানাই সেজন্য মন্দিরকক্ষে গভীর শ্রদ্ধাসম্ভ্রমপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত।

বিগ্রহ-সেবা, আরতি এবং পূজা

বিগ্রহ-সেবা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের এক বিশদ অঙ্গ, এখানে তা কেবল সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। বিগ্রহ-সেবার বিশদ নিয়মাবলী বর্ণনা করে ইসকন ভক্তগণ 'পঞ্চরাত্র প্রদীপ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। অবশ্য এসব নিয়মাবলী এবিষয়ে অভিজ্ঞ

কারও কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে শিখে নিতে হয়। এখানে যে সেবা-পূজার রূপরেখা দেওয়া হয়েছে, তা যেসব গৃহীভক্তরা ভগবানের আলেখ্যরূপ (প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নয়) স্বগৃহে আরাধনা করছেন, তাঁদের জন্য।

কিছু ভক্ত পূজার্চনা করতে খুবই উৎসাহী। ভগবানের পূজা করার এরকম উৎসাহ খুবই সুন্দর। অবশ্য এটা স্মরণ রাখতে হবে যে এ-যুগে ভগবদুপলব্ধির মুখ্য উপায় হল ভগবানের দিব্যনামসমূহ কীর্তন করা। পূজা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা ফলপ্রদ করতে হলে তার সাথে কীর্তন করা অবশ্য প্রয়োজন।

হরিভক্তিবিলাস এবং অন্যান্য শাস্ত্রসমূহে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের পূজার্চনার বিধান দেওয়া হয়েছে। সেজন্য নিজ সাধ্যসামর্থ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে গৃহে পূজা-আরাধনার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। এমন নয় যে একটি বিখ্যাত, সমৃদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে গৃহে পূজানুষ্ঠান করতে হবে।

বিগ্রহ সেবার আদর্শ নিয়ম হল স্থায়ীভাবে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে কঠোর শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীবিগ্রহের সেবা-পূজা করা। কিন্তু সকল ভক্ত এরকম দুরূহ পূজার্চনার জন্য প্রস্তুত নন। এরকম পূজা কেবল কঠোর শাস্ত্রানুশাসন পালনে সক্ষম নিষ্ঠাবান ভক্তদের জন্য।

শাস্ত্রে পূজা করার কোন একটি নির্দিষ্ট পন্থা উল্লিখিত হয়নি। এখানে পূজার্চনার যে পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সরল এবং সকলের পক্ষেই তা সহজসাধ্য। যেমন, গৃহে নারীরা পূজা করতে পারেন, সেটা স্বাভাবিক; কিন্তু ভারতের কোন প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে কোন নারী পূজা করছেন—এমনটা ভাবাই যায় না। তবু এই নিয়মটি সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে যে, মাসের যে সময়টি তারা প্রকৃতিগতভাবে অপরিচ্ছন্ন থাকেন, সে-সময় তারা পূজার কর্মে যোগ দেবেন না।

ঠাকুর ঘরের সবকিছু, পূজার জন্য ব্যবহৃত সকল উপকরণ নিখুঁতভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিগ্রহ, চিত্রাদি, বেদী-বস্ত্র, শঙ্খ, আরতির সময়ে ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড, মেঝে এবং ঠাকুর ঘরের দেওয়াল—সবকিছু নিয়মিতভাবে পরিস্কার রাখতে হবে। বিগ্রহদের পোশাক পুরানো হবার প্রথম চিহ্ন দেখা গেলেই তা বদলাতে হবে। পিতল ও তামার বাসনগুলি রাত্রেই সরিয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভাল।

আরতি বা পূজার আগে (অর্চা বিগ্রহের ক্ষেত্রে রান্নার আগেই) স্নান করতে হয় এবং পরিচ্ছন্ন কাপড় পড়তে হয়। বিগ্রহ পূজার ক্ষেত্রে রেশম বস্ত্র সর্বোত্তম। সূতির বস্ত্রও পরা চলে। উল যদিও পবিত্র, তবু কঠোরভাবে শাস্ত্রানুগ বিগ্রহ অর্চনায় উল বস্ত্রও পরা উচিত নয়। পলিয়েস্টার, টেরিকটন এবং কৃত্রিম বস্ত্র বা সূতী-মিশ্রিত বস্ত্র পরা নিষিদ্ধ। আর, এসময় বৈষ্ণব পোশাক পরা উচিত, পাশ্চাত্যধাচের কোন পোশাকে পূজাদি কর্ম করা অনুচিত।

যদিও বিগ্রহ পূজায় গৃহস্থদের জন্য কিছু বিধিনিয়মের শিথিলতা রয়েছে, তবু গৃহের পূজায় কৃপণতা করা উচিত নয়। যদি একেবারেই বিত্তহীন না হন, তাহলে অন্ততঃ পক্ষে সুন্দর ধূপ এবং ফুল পূজায় ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখুন।

আরতি নিবেদন

কেবল আরতির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট একটি আরতি থালাতে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি রাখতে হবে ঃ

১। বাজানোর জন্য একটি শঙ্খ;

২। বিশুদ্ধ জলপূর্ণ একটি আচমন পাত্র ও একটি চামচ;

৩। ধূপ—অন্ততঃ তিনটি কাঠি;

৪। পঞ্চপ্রদীপ (ঘি দিয়ে পাঁচটি পলতে জ্বালাতে হয়, পরিবর্তে এক পলতে বিশিষ্ট ঘিয়ের প্রদীপও ব্যবহার করা যেতে পারে);

৫। একটি জলশঙ্খ এবং শঙ্খ রাখার ধারক;

৬। জলদানের জন্য একটি পাত্র;

৭। একটি বস্ত্রখণ্ড। সাধারণতঃ রুমাল ব্যবহার করা হয়। কোন লেখা বা ছাপশূন্য সুন্দরভাবে চিত্র-চিত্রিত রুমালই সর্বোত্তম। কেবল আরতিতে দানের জন্য এরকম দু'তিনটি রুমাল রাখতে হয়। সেগুলো অবশ্যই খুব সযত্নে ভাঁজ করা এবং পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন।

৮। এক রেকাবি ফুল;

৯। একটি তেলের প্রদীপ বা মোমবাতি;

১০। চামর;

১১। একটি ময়ূর পাখা;

১২। একটি ঘণ্টা।

যে-ভক্ত আরতি করবেন, তিনি প্রথমে ঠাকুর ঘরের বাইরে থেকে বিগ্রহ-সমূহকে প্রণাম করবেন। তারপর তিনি এইভাবে আচমন করবেন ঃ আচমন পাত্র থেকে বাঁ হাতে চামচে জল তুলে ডান হাতে দেবেন, তারপর ঐ জলটা চুমুক দেবেন ও বলবেন "ওঁ কেশবায় নমঃ"। তারপর আরেকটু জল ঐভাবে ডান হাতে নিয়ে পূর্বের মত সেটা দ্বিতীয়বার চুমুক দেবেন ও বলবেন, "ওঁ নারায়ণায় নমঃ" এর একইভাবে তৃতীয়বার চুমুক দিয়ে বলবেন, "ওঁ মাধবায় নমঃ"। আচমন পাত্রটি সমগ্র আরতি অনুষ্ঠানেই ব্যবহার করতে হবে—হাত এবং আরতি দ্রব্যাদি শুদ্ধিকরণের জন্য। কোন দ্রব্যকে শুদ্ধিকরণ করার পদ্ধতিটি খুব সরল; কেবল তিন ফোঁটা জল আচমন পাত্র থেকে নিয়ে তার উপর দিন। কোন দ্রব্য নিবেদন করার পূর্বে প্রতিবার তিন ফোঁটা জল দিয়ে হাতকে শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

আচমন করার পর প্রথমে বাজানোর শঙ্খকে শুদ্ধ করে নিন (এ শঙ্খটি বিগ্রহ প্রকোষ্ঠের বাইরে থাকবে)। তারপর ডানহাতে ধরে

এটিকে তিনবার বাজান। শঙ্খটিকে আবারও শুদ্ধ করে নিন। নিজের ডান হাতটি পুনরায় শুদ্ধ করুন এবং এবার ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করুন। ঘরের ভিতরে গিয়ে ঘণ্টাধ্বনি করতে করতে পর্দার আবরণ উন্মোচন করুন।

পর্দা উন্মোচনের পর শ্রীবিগ্রহসমূহ দর্শনমাত্র সমবেত ভক্তগণ ভূমিতে অবনত হয়ে প্রণাম করবেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কীর্তন শুরু করবেন। আরতি পাত্রটি একটি টুল বা চৌকির উপর রাখুন (সেটা এজন্য ঠাকুরঘরে রাখা থাকবে)। এবার ধূপ শুদ্ধ করে নিন (তিন ফোঁটা জল ধূপকাঠির গোড়াতে দিন), তারপর তা জ্বালিয়ে নিন। জ্বালানোর জন্য একটি তৈলপ্রদীপ রাখলে সবচেয়ে ভাল হয়, না হলে একটি মোমবাতি—এগুলো আগেই জ্বালিয়ে নিতে হয়। ঠাকুর ঘরে সর্বক্ষণের জন্য একটি তৈল প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে পারেন। এসব ব্যবস্থা না হলে সরাসরি দেশলাই দিয়ে ধূপ জ্বালিয়ে নিন।

দুটি হাতই নিয়মানুযায়ী শুদ্ধ করে নিন, তারপর ঘণ্টাটি; বাঁ হাতে ঘণ্টা এবং ডান হাতে ধূপ নিন ও তারপর আরতি শুরু করুন। প্রতিটি দ্রব্য আরতিতে নিবেদন করার সময় সর্বক্ষণ ঘণ্টা বাজাতে হয়।

আরতির সময়ে নিবেদিত প্রতিটি দ্রব্য পূজিত বিগ্রহ বা আলেখ্যর চতুর্দিকে ঘড়ির কাঁটা ঘোরার দিক অনুসারে (অর্থাৎ ডানদিকে) ঘুরিয়ে আরতি করুন। একটি নিয়ম অনুসারে, মনে মনে গুরুদেবের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে প্রতিটি দ্রব্য প্রথমে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করতে হয়, তারপর রাধারাণীকে, তারপর প্রভু নিত্যানন্দকে, তারপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে, তারপর পরমগুরু (গুরুদেবের গুরু)-কে সবশেষে দীক্ষাদাতা গুরুদেবকে। অপর পন্থা হল, প্রতিটি দ্রব্য

প্রথমে দীক্ষাদাতা গুরুদেবকে অর্পণ করাতে হয়, তারপর পরমগুরুদেবকে, তারপর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তারপর রাধারাণী এবং পরে শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীল প্রভুপাদ শেষোক্ত পন্থাটি তার মন্দিরগুলোতে প্রবর্তন করেছেন। কারণ, আরাধক ভক্ত মনে করেন যে তিনি সরাসরিভাবে কোনদ্রব্য কৃষ্ণকে অর্পণ করার যোগ্য নন। এজন্য সবকিছুই তিনি প্রথমে নিজগুরুদেবকে অর্পণ করেন। গুরুদেব তা তাঁর গুরুদেবকে অর্পণ করেন। এইভাবে পরম্পরাক্রমে প্রতিটি দ্রব্য কৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়। তাই পূজক যখন প্রত্যেক দ্রব্য পরম্পরাক্রমে অন্তিমে কৃষ্ণকে নিবেদন করেন, তখন তিনি ভাবেন যে, তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের পূজায় গুরুদেবকে সহায়তা করছেন, প্রত্যক্ষভাবে নিজে কিছু করছেন না।

নীচের লেখা ক্রম অনুসারে আরতির দ্রব্যগুলি নিবেদন করতে হয় :

১। ধূপ; ২। ঘৃত প্রদীপ; ৩। জলশঙ্খের জল; ৪। একটি বস্ত্রখণ্ড বা রুমাল; ৫। ফুল; ৬। চামর; ৭। ময়ূর পাখা।

জলশঙ্খের জল প্রত্যেক পূজ্য বিগ্রহকে নিবেদনের পর তিন ফোঁটা করে জল (এ উদ্দেশ্যে রাখা) জল পাত্রে দিন। এভাবে সকলকে জল নিবেদনের পর শঙ্খের অবশিষ্ট জলটুকু একটি জলের ঘটির মধ্যে ঢালুন। এবার জল-পাত্রটিকে বাঁহাতে নিয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে এসে সমবেত ভক্তবৃন্দের মস্তকে একটু করে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিন। আরতিতে ফুল নিবেদনের পর পূজিত বিগ্রহসমূহের পাদপদ্মে একটি বা কয়েকটি করে ফুল অর্পণ করুন, আর অবশিষ্ট ফুলের কিছু বা সব সমবেত ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করুন।

প্রত্যেক পূজিত বিগ্রহকে চামর ও ময়ূর পাখা দিয়ে কয়েকবার করে ব্যজন করতে হয়। শীতকালে যখন পাখার হাওয়ার প্রয়োজন

থাকে না, তখন পাখা ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। খেয়াল রাখুন যেন প্রত্যেক দ্রব্য অর্পণের আগে তা শুদ্ধ করে নেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দ্রব্য নিবেদনের পর যেন হাতের শুদ্ধিকরণ করা হয়।

আরতি প্রায় ২০ মিনিটে সম্পূর্ণ হয়। তারপর তিনবার শঙ্খধ্বনি করতে হয়, আর এসময় কীর্তনও সমাপ্ত হয় (সমগ্র আরতি সময় ধরে ভক্তরা কীর্তন করতে থাকেন) ঃ তারপর প্রেমধ্বনি করতে হয় (গীতাবলী দেখুন) এবং আরতির উপকরণ-গুলি পরিষ্কার করার জন্য সরিয়ে নিতে হয়।

আরতির সময় পূজারীর মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে তিনি যা করছেন তাতে ঃ পরমেশ্বর ভগবানের পূজা। পূজারীর মনোভাব হবে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ।

কখনও কখনও কেবল ধূপ, পুষ্প এবং চামর দিয়ে আরতি নিবেদন করা হয়। একে বলা হয় ধূপ আরতি। কিন্তু ভোরের মঙ্গল আরতিতে এবং সন্ধ্যারতিতে সমস্ত উপকরণ নিবেদন করা উচিত।

পূজা

শাস্ত্রসমূহে পূজার্চনার বিবিধ জটিল পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নয়, সেজন্য এখানে একটি মৌলিক রূপ-রেখা দেওয়া হল। ব্রাহ্মণ দীক্ষার পর পূজা-পদ্ধতি শেখাই যথার্থ পন্থা, তবু যেসব প্রাথমিক স্তরের ভক্ত প্রতিদিন স্বগৃহে সহজ পূজা অনুষ্ঠান করতে চান, এই সরলীকৃত পূজাপদ্ধতি তাদের জন্য। যারা ভগবানের আলেখ্য (চিত্র)-রূপ পূজা করবেন, বর্তমান নির্দেশাবলী তাদের জন্য; যেসব ভক্ত কাষ্ঠ, ধাতু বা পিতল নির্মিত বিগ্রহ পূজা করতে চান, তাদের উচিত কোন অভিজ্ঞ পূজারীর নিকট হতে পূজার নিয়মবিধি প্রত্যক্ষভাবে শিখে নেওয়া।

পূজা অনুষ্ঠান করতে হয় খুব সকালে, মঙ্গল আরতির পরে সমস্ত আলেখ্য, বেদী, ঠাকুরঘর পরিষ্কার করার পর। শাস্ত্রে পঞ্চবিধ, দশবিধ, ষোড়শ বা চৌষট্টি রকম উপাচারে পূজার বিধান রয়েছে। পঞ্চ উপাচার হল গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ধূপ, একটি ঘৃত-প্রদীপ এবং নৈবেদ্য।

প্রথমে গুরুদেব, তারপর গৌর-নিতাই এবং তারপর রাধা-কৃষ্ণের পূজা করার জন্য তাঁর অনুমতি নিতে হয় (প্রার্থনার মাধ্যমে)। পঞ্চউপাচারে পূজা পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

প্রথমে গন্ধদ্রব্য তৈরী করুন (ঘষে নেওয়া চন্দন এবং কর্পূর মিশিয়ে এটি তৈরী করতে হয়; হাল্কা লালচে রঙের চন্দন ব্যবহার করতে হয়—তবে রক্তচন্দন নয়)। এরপর ঠাকুর ঘরের মেঝের কুশাসনে বসে গুরুদেবের আলেখ্যটি আপনার সামনে রাখা একটি চৌকিতে রাখুন। গুরুদেবের ললাটে একটু গন্ধদ্রব্য দিন। এরপর গন্ধদ্রব্যের সাহায্যে একটি তুলসী পত্র গুরুদেবের (আলেখ্যের) দক্ষিণ হস্তে অর্পণ করুন (তুলসী কেবল বিষ্ণুতত্ত্ব বিগ্রহসমূহের চরণেই অর্পিত হয়; গুরুদেবের হস্তে তা দেওয়া হল এজন্য তিনি তা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অর্পণ করবেন। এবার ধূপ, ঘৃত প্রদীপ এবং তারপর পুষ্প নিবেদন করুন—ঠিক যেমনভাবে আরতির সময় নিবেদন করা হয় (আরতি নিবেদন দেখুন)। নিবেদনের পর, গুরুদেবের পাদপদ্মে পুষ্প অর্পণ করুন। এরপর একটি সদ্য তৈরী পুষ্পমালা গুরুদেবের আলেখ্যতে দিন (পূজারী বা পরিবারের যে কেউ ফুল তুলে মালা তৈরী করতে পারে)। এবার একইরকম ভাবে পঞ্চতত্ত্বের পূজা করুন, তারপর রাধাকৃষ্ণের। এরপর ভোগ নিবেদন করুন। ফলমূল, দুধ, মিষ্টি অথবা রান্না করা খাদ্যবস্তু ভগবানকে নিবেদন করা যায়। এই সাথে পূজা সমাপ্ত হবে, এখন আরতি করা যেতে পারে।

সমগ্র পূজার সময়ে গুরুদেব, গৌর-নিতাই এবং রাধাকৃষ্ণের গুণমহিমাপূর্ণ যথোপোযুক্ত মন্ত্রাদি কীর্তন ও ভজনগীতি কীর্তন করতে হয়।

প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলোতে প্রতিদিন একবার বা দু'বার করে বিগ্রহসমূহের পোশাক পরিবর্তন করা হয়। গৃহের ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার করলেই হবে।

তুলসী

"তুলসী দেবীর সমস্তকিছুই অত্যন্ত শুভ। কেবলমাত্র তুলসী দর্শন বা স্পর্শন করে, কেবল তুলসী দেবীকে প্রণাম করে অথবা কেবল তুলসীর গুণমহিমা শ্রবণ করে বা তুলসী বৃক্ষ রোপণ করে সর্বমঙ্গল লাভ করা যায়। কেউ যদি উপরোক্ত পন্থাগুলির মাধ্যমে তুলসীদেবীর সেবা করেন, তিনি নিত্যকাল বৈকুণ্ঠলোকে বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেন।" (স্কন্দপুরাণ)

তুলসী বৃক্ষের সেবা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তুলসী বৃক্ষ কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তুলসী পত্র এবং তুলসী মঞ্জরীর প্রতি কৃষ্ণ অত্যন্ত আসক্ত। প্রত্যেক ভক্ত যেন গৃহে অন্ততঃ একটি-দুটি তুলসীবৃক্ষ রাখেন, তাতে প্রতিদিন জলদান করেন, তুলসীদেবীকে প্রণাম নিবেদন করেন এবং যত্নসহকারে তুলসী বৃক্ষের পরিচর্যা করেন। কোন গৃহে যদি তুলসী বৃক্ষটি খুব সুন্দরভাবে বিকশিত-শোভিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে সে গৃহে উত্তম ভক্তিচর্চা হচ্ছে, গৃহবাসীর ভগবদ্ভক্তি বিকশিত হচ্ছে।

তুলসী আরতি

তুলসী আরতি সাধারণতঃ ঠাকুরঘরের সামনের মন্দির-কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। তুলসীদেবীকে মন্দির কক্ষে আনয়নের পূর্বে বিগ্রহ-

প্রকোষ্ঠের পর্দা বন্ধ করে দিতে হয়। (কেননা, বিগ্রহের সামনে তুলসীদেবীর পূজা করা উচিত নয়)। আরতির সময় যে টবে তুলসীদেবীকে রাখা হয় সেটি একটি সুন্দর বস্ত্রে সাজিয়ে নিতে হয়। এইভাবে সুসজ্জিত তুসসীদেবীকে মন্দিরকক্ষের মধ্যস্থলে রাখা একটি টেবিলের উপর রাখতে হয়। যখন তাঁকে আনা হয়, তখন একজন নীচের মন্ত্রটি আবৃতি করেন, আর সমবেত ভক্তবৃন্দ তাকে অনুসরণ করেন। ঃ

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি! সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

এরপর "নমো নমো তুলসী" গানটি গাওয়া শুরু হয় (গীতাবলী দেখুন) এবং সেইসাথে আরতিও শুরু হয়। আরতি পদ্ধতি নীচে দেওয়া হল।

তুলসী আরতি অত্যন্ত সরল। আরতি পাত্রে রাখতে হয় আচমন পাত্র, একটি ঘৃত-প্রদীপ এবং ছোট এক রেকাবি ফুল। একটি দেশলাই বা মোমবাতি অথবা তৈল-প্রদীপ প্রয়োজন। যে-ভক্ত আরতি করবেন তিনি কুশাসনে দাঁড়িয়ে প্রথমে আচমন করে নেন। তখন তিনি প্রজ্বলিত ধূপ তুলসী দেবীর সামনে চক্রাকারে ঘুরিয়ে আরতি করেন, এরপর একইভাবে ঘৃত-প্রদীপ এবং শেষে ফুল নিবেদন করেন।

ধূপ নিবেদনের পর তা একটি ধূপদানির মধ্যে রাখতে হয়। ঘৃত-প্রদীপে আরতির পর সেটা-একজন ভক্তকে দিতে হয়। সেই ভক্ত প্রদীপটি সমবেত ভক্তদের কাছে নিয়ে গেলে প্রত্যেকে দীপ-শিখা স্পর্শ করেন। আরতিতে ফুলগুলি নিবেদনের পর কিছু ফুল তুলসীবৃক্ষের গোড়ায় রাখতে হয়, অবশিষ্ট ফুল সমবেত ভক্তদের বিতরণ করতে হয়—তারা সেগুলি আঘ্রাণ করেন।

যখন তুলসী-আরতি সমাপ্ত হয়, তখন সমস্ত ভক্তবৃন্দ তুলসীদেবীকে ডান দিকে রেখে তাঁকে বেষ্টন করে পরিক্রমা করেন, এবং সেই সময় এই পদটি কীর্তন করেন ঃ

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাদি কানি চ ।
তানি তানি প্রণশ্যন্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

এরপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়।

তুলসী সম্বন্ধে আরও কিছু কথা

বিষ্ণুপূজায় তুলসীপত্র অপরিহার্য। তুলসীপত্র চয়ন করতে হয় সকালে (রাত্রে কখনই নয়)। একটি কাঁচি কেবল তুলসী চয়নের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হয়। তুলসী পরিক্রমার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় তুলসীদেবীর যেন কোন আঘাত না লাগে (তুলসী কোন সাধারণ বৃক্ষমাত্র নয়—তুলসীদেবী হচ্ছেন ভগবানের এক পরম শুদ্ধ ভক্ত)।

তুলসী বৃক্ষের মঞ্জরী দেখা দেওয়া মাত্র তা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দিতে হয়। না হলে সর্বত্র তুলসী গাছ জন্মাবে, আর তাদের উপযুক্ত যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। তাছাড়া, তুলসী মঞ্জুরী ঘন ঘন ছেঁটে দিলে তুলসী বৃক্ষটি সতেজ ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

তুলসী বৃক্ষকে সর্বদা জীবজন্তুদের নাগালের বাইরে রাখা উচিত। পথের পাশে তুলসী গাছ রাখতে নেই, কেননা লোকজন অজান্তেও তার ক্ষতিসাধন করতে পারে। ছোটদের (বড়দেরও!) এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা তুলসীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মের প্রবল তাপের সময় তুলসীকে ছায়াশীতল স্থানে রাখতে হয়।

তুলসীবৃক্ষ বেশ কিছু ভেষজগুণের জন্য বিখ্যাত, কিন্তু ভক্তেরা তাকে ভেষজ হিসাবে কখনও দেখেন না। তুলসীদেবী ভগবানের একজন শুদ্ধভক্ত এবং আমাদের কাছে পূজানীয়া। ভক্তরা তুলসী বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যা করেন ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধির জন্য—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়।

কেবলমাত্র বিষ্ণুতত্ত্ব-বিগ্রহ এবং আলেখ্যসমূহের চরণকমলে ভক্তিসহ তুলসীপত্র নিবেদন করতে হয়—অন্য কাউকে নয়। অর্থাৎ কৃষ্ণ, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু—প্রভৃতির পাদপদ্মেই কেবল তুলসীপত্র অর্পণ করা যায়; সম্প্রদায় আচার্যবৃন্দ-সহ শ্রীবাস পণ্ডিত, গদাধর পণ্ডিত এমন কি রাধারাণীর পাদপদ্মেও তুলসীপত্র নিবেদন করা যায় না। অবশ্য বিগ্রহ পূজার সময়ে গুরুদেবের দক্ষিণ হস্তে তুলসীপত্র অর্পণ করা যেতে পারে, যাতে তিনি তা কৃষ্ণের পাদপদ্মে দান করতে পারেন। ভগবানকে ভোগ নিবেদনের সময় তুলসীপত্রসহ তা নিবেদন করতে হয়।

তুলসী-স্নান মন্ত্র

(ওঁ) গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্ ।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনীম্ ॥

তুলসী চয়ন মন্ত্র

তুলস্য মৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া ।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥
(দ্বাদশী তিথিতে তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ)

দৈনন্দিন কার্যক্রম

পৃথিবীর সমস্ত ইসকন মন্দিরে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় নির্ধারিত পারমার্থিক কার্যক্রমে ভক্তরা সমবেত হন। গৃহীভক্তগণ যতদূর সম্ভব পরিবারের সকলকে একত্রিত করে এধরনের অনুষ্ঠান করতে পারেন। নির্দিষ্ট প্রাত্যহিক ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠান আমাদের কৃষ্ণভক্তিকে সুদৃঢ় ও সুস্থিত করে।

ইসকন মন্দিরগুলোতে প্রতিদিন যে নির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়, নীচে তার তালিকা দেওয়া হল। বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে অবশ্য কিছু সময়ের তারতম্য থাকতে পারে।

প্রভাতের কার্যক্রম

ভোর ৩-৪৫ : ভক্তদের জাগরণ, স্নান, তিলকগ্রহণ ও পোশাক পরিবর্তন।

„ ৪-১৫ : মঙ্গল আরতি।

„ ৪-৪৫ : প্রেমধ্বনি এবং নৃসিংহ আরতি।

„ ৪-৫৫ : তুলসী আরতি।

„ ৫-০৫ : জপ শুরুর সময়। এ সময় অধিকাংশ ভক্ত জপে নিমগ্ন হন। পূজারী শ্রীবিগ্রহসমূহ পূজা করেন এবং শুদ্ধ বস্ত্রে শ্রীবিগ্রহসমূহের অঙ্গসজ্জা করেন।

সকাল ৭-০০ : শৃঙ্গার আরতি (দর্শন আরতি)

„ ৭-৪৫ : গুরু পূজা (ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের পূজা)

„ ৮-০০ : শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

„ ৯-০০ : প্রভাতী কার্যক্রমের সমাপ্তি।

সান্ধ্য অনুষ্ঠান

৬-১৫ : তুলসী আরতি (শীতকালে ৫-৪৫)।

৬-৩০ : সন্ধ্যা আরতি (শীতকালে ৬-০০)।

৭-৩০ : প্রেমধ্বনি এবং নৃসিংহ আরতি ও কীর্তন।

৭-৪৫ : ভগবদ্গীতা পাঠ (প্রায় ১ ঘণ্টা)।

গীতাবলী

এখানে উদ্ধৃত গানগুলি সারা বিশ্বের সমস্ত ইসকন কেন্দ্রে গাওয়া হয়।

গাওয়ার সময়	যে-গান গাওয়া হয়
মঙ্গল আরতি	সংসার দাবানল.....
তুলসী আরতি	তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী......
গুরুপূজা	শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতিসদ্ম.....
সন্ধ্যা আরতি	জয় জয় গোরাচাঁদের......
গ্রন্থপাঠের পূর্বে	জয় রাধামাধব কুঞ্জবিহারী.....
প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে	শরীর অবিদ্যাজাল....

আরতি অনুষ্ঠানগুলিতে আরতির জন্য নির্দিষ্ট গানগুলি গাওয়ার পর শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র গাওয়া হয়, তারপর কীর্তন চলতে থাকে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রটি হল :

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

এরপর পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।) কীর্তন করে নিয়ে আরতি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥) কীর্তন করে যেতে হয়।

ভক্তদের সুবিধার জন্য এখানে প্রয়োজনীয় কিছু স্তব ও ভজনগীতি উদ্ধৃত করা হল।

শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

সংসার-দাবানল-লীঢ় লোক-
ত্রাণায় কারুণ্যঘনাঘনত্বম্ ।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ১ ॥

সংসার-দাবানল-সন্তপ্ত লোকসকলের পরিত্রাণের জন্য, যে কারুণ্য-বারিবাহ্ তরলত্ব প্রাপ্ত হইয়া কৃপাবারি বর্ষণ করেন, আমি সেই কল্যাণ গুণনিধি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

মহাপ্রভোঃ কীর্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন ।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ২ ॥

সংকীর্তন, নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমরসে উন্মত্ত চিত্ত যাঁহার রোমাঞ্চ, কম্প-অশ্রু-তরঙ্গ উদ্‌গত হয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির মার্জনাদৌ ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোহপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীবিগ্রহের কেশ-রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জন প্রভৃতি নানাবিধ সেবায় স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং (অনুগত) ভক্তগণকে নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্তসঙ্ঘান ।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৪ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তবৃন্দকে চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ রসসমন্বিত সুস্বাদু প্রসাদান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া (অর্থাৎ প্রসাদ-সেবনজনিত প্রপঞ্চ-নাশ ও প্রেমানন্দের উদয় করাইয়া) স্বয়ং তৃপ্তি লাভ করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

শ্রীরাধিকামাধবয়োরপার-
মাধুর্যলীলা গুণ-রূপ-নাম্নাম্ ।
প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৫ ॥

যিনি শ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যময় নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ আস্বাদন করিবার নিমিত্ত সর্বদা লুব্ধ চিত্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি ।

নিকুঞ্জযুনো রতিকেলিসিদ্ধ্যৈ
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া ।
তত্রাতিদাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৬ ॥

নিকুঞ্জবিহারী ব্রজযুবযুগলের রতিক্রীড়া সাধনের নিমিত্ত সখীগণ যে যে যুক্তির অপেক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে অতি নিপুণতাপ্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

নিখিলশাস্ত্র যাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং সাধুগণও যাঁহাকে সেইরূপেই চিন্তা করিয়া থাকেন,

কিন্তু যিনি প্রভু ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, সেই (ভগবানের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ) শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

যস্য প্রসাদাদ্ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৮ ॥

একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, আর যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই শ্রীগুরুদেবের কীর্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি।

—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর

শ্রীনৃসিংহদেবের স্তব ও প্রণাম

জয় নৃসিংহ শ্রীনৃসিংহ।
জয় জয় জয় শ্রীনৃসিংহ ॥
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং
জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং
মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥
শ্রীনৃসিংহ, জয় নৃসিংহ, জয় জয় নৃসিংহ।
প্রহ্লাদেশ জয় পদ্মমুখপদ্মভৃঙ্গ ॥

* * * * * *

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদ-দায়িনে।
হিরণ্যকশিপোর্বক্ষঃ শিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ।
বহির্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

শ্রীতুলসী আরতি

নমো নমঃ তুলসী। কৃষ্ণপ্রেয়সী ।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী ॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবনবাসী ।
মোর এই অভিলাষ, বিলাস-কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী ।
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥

শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব আরতি

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ-সংসারে ॥
পতিত পাবন হেতু তব অবতার ।
মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥

হা হা প্রভু নিত্যানন্দ! প্রেমানন্দ সুখী ।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি ।
তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥
হা-হা স্বরূপ, সনাতন, রূপ, রঘুনাথ ।
ভট্টযুগ, শ্রীজীব, হা প্রভু লোকনাথ ॥
দয়া কর শ্রীআচার্য প্রভু শ্রীনিবাস ।
রামচন্দ্রসঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥

শ্রীশ্রীরাধামাধব দর্শন আরতি

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
(শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা শ্লোক ৩০, ৩২)

শ্রীগুরু বন্দনা

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে ॥

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিল যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম-জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥

প্রতিদিন শাস্ত্র পাঠের আগে 'জয় রাধামাধব কুঞ্জবিহারী' ভজনটি ভক্তগণ কীর্তন করেন।

জয় রাধামাধব কুঞ্জবিহারী।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী ॥
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন;
যমুনাতীর-বনচারী ॥

ভোগ আরতি

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী,
নন্দ-যশোমতী-চিত্তহারী ॥ ১ ॥
বেলা হ'লো, দামোদর, আইস এখন।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥ ২ ॥

নন্দের নির্দেশে বৈসে গিরিবরধারী ।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥ ৩ ॥
শুকতা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড ।
ডালি ডাল্‌না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাঘণ্ট ॥ ৪ ॥
মুদ্‌গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন ।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলী পায়সান্ন ॥ ৫ ॥
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার ।
অমৃত রসালা, অম্ল দ্বাদশ প্রকার ॥ ৬ ॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডু রসাবলী ।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতুহলী ॥ ৭ ॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন ।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥ ৮ ॥
ছলে-বলে লাড্ডু খায় শ্রীমধুমঙ্গল ।
বগল বাজায়, আর দেয় হরিবোল ॥ ৯ ॥
রাধিকাদি গণে হেরি' নয়নের কোণে ।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা-ভবনে ॥ ১০ ॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি ।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি ॥ ১১ ॥
হস্ত-মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে ।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে ॥ ১২ ॥
জম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মসালা ।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥ ১৩ ॥
বিশালাক্ষ শিখি-পুচ্ছ চামর ঢুলায় ।
অপূর্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥ ১৪ ॥
যশোমতী-আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা-আনীত ।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হ'য়ে প্রীত ॥ ১৫ ॥

ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায় ।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণগুণ গায় ॥ ১৬ ॥
হরি-লীলা একমাত্র যাঁহার প্রমোদ ।
ভোগারতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥ ১৭ ॥

শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিকো শোভা ।
জাহ্নবী-তটবনে জগমনোলোভা ॥ ১ ॥
দক্ষিণে নিতাই চাঁদ, বামে গদাধর ।
নিকটে অদ্বৈত, শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥ ২ ॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে ।
আরতি করেন ব্রহ্মা-আদি দেবগণে ॥ ৩ ॥
নরহরি-আদি করি' চামর ঢুলায় ।
সঞ্জয়-মুকুন্দ-বাসুঘোষ-আদি গায় ॥ ৪ ॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥ ৫ ॥
বহুকোটি চন্দ্র জিনি' বদন উজ্জ্বল ।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥ ৬ ॥
শিব-শুক-নারদ প্রেমে গদগদ ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥ ৭ ॥

প্রেমধ্বনি

প্রত্যেকবার আরতির পর প্রেমধ্বনি উচ্চারণ করতে হয়। তারপর ভক্তগণ 'নমস্তে নরসিংহায়' স্তবটি কীর্তন করেন (গুরুপূজায় অবশ্য এটি গাওয়া হয় না)

জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রীশ্রীমৎ অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কী জয়!

ইসকন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ কী জয়!

অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়।

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কী জয়।

প্রেমসে কহো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ কী জয়!

বৃন্দাবন ধাম কী জয়। মথুরা ধাম কী জয়।

নবদ্বীপ ধাম কী জয়! দ্বারকা ধাম কী জয়।

জগন্নাথ পুরী ধাম কী জয়। গঙ্গা মায়ী কী জয়!

যমুনা মায়ী কী জয়! ভক্তিদেবী কী জয়!

তুলসী দেবী কী জয়। সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কী জয়!!

এরপর সকল ভক্ত গুরু প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করবেন।

ভক্তিমূলক কীর্তন

বৈষ্ণব বন্দনা

(১)

ওহে!

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি ॥
ছয় বেগ দমি, ছয় দোষ শোধি,'
ছয় গুণ দেহ' দাসে।

হয় সৎসঙ্গ, দেহ'হে আমারে
বসেছি সঙ্গের আশে ॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্তনে ।
তুমি কৃপা করি,' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ' কৃষ্ণ-নাম ধনে ॥
কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে ।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি,'
ধাই তব পাছে পাছে ॥

(২)

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি ॥
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ।
যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায় ॥
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়?
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন ।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম ।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম ।
গোবিন্দ কহেন—মম বৈষ্ণব-পরাণ ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি ।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥

(৩)

বৃন্দাবনবাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ॥
নীলাচলবাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমিতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ॥
নবদ্বীপবাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি॥
যে-দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি' বন্দোঁ সবার চরণ॥
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি' ঘাস॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ-পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে॥
মহাপ্রভুর গণ-সব পতিত-পাবন।
তাই লোভে মুঞি পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুঞি কত শক্তি ধরি।
তমো-বুদ্ধি-দোষে মুঞি দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মূকের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি' মো-অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, যম-বন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

(৪)

কবে মুই বৈষ্ণব চিনিব হরি হরি ।

বৈষ্ণব চরণ, কল্যাণের খনি,
মাতিব হৃদয়ে ধরি' ॥ ১ ॥

বৈষ্ণব-ঠাকুর, অপ্রাকৃত সদা,
নির্দোষ, আনন্দময় ।
কৃষ্ণনামে প্রীতি, জড়ে উদাসীন,
জীবেতে দয়ার্দ্র হয় ॥ ২ ॥

অভিমানহীন, ভজনে প্রবীণ,
বিষয়েতে অনাসক্ত ।
অন্তর-বাহিরে, নিষ্কপট সদা,
নিত্য-লীলা-অনুরক্ত ॥ ৩ ॥

কনিষ্ঠ, মধ্যম, উত্তম প্রভেদে,
বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি ।
কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা শুনি ॥ ৪ ॥

যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
আদর করিব যবে ।
বৈষ্ণবের কৃপা, যাবে সর্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে ॥ ৫ ॥

বৈষ্ণব চরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি' ।
ভক্তিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি' ॥ ৬ ॥

(৫)

কৃপা কর বৈষ্ণব-ঠাকুর ।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউ দূর ॥ ১ ॥
'আমি ত' বৈষ্ণব', এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি ।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥ ২ ॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
'গুরু'-অভিমান ত্যজি' ।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজল-রেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি ॥ ৩ ॥
'নিজে শ্রেষ্ঠ' জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান ভার ।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্বদা,
না লইব পূজা কা'র ॥ ৪ ॥
অমানী মানদ, হইলে কীর্তনে,
অধিকার দিবে তুমি ।
তোমার চরণে, নিষ্কপেটে আমি,
কাঁদিয়া লুটিব ভুমি ॥ ৫ ॥

(৬)

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ! করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার ।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার ॥

বিধি বড় বলবান, না শুনে ধরম-জ্ঞান,
সদাই করমপাশে বান্ধে ।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ, কাতরে তেঁই কান্দে ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে ।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥
না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ ।
নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥

(৭)

এ ঘোর-সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ ।
সাধু-সঙ্গ করি হরি ভজে যদি
তবে হয় অন্ত ক্লেশ ॥
সংসার-অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়য়ে অনল ।
অপরাধ ছাড়ি' কৃষ্ণনাম লয়
অনলে পড়য়ে জল ॥
নিতাই চৈতন্য চরণ-কমলে
আশ্রয় লইল যেই ।
কালীদাস বলে জীবনে মরণে
আমার আশ্রয় সেই ॥

(৮)

প্রভুপাদ চরণাশ্রয়, শুদ্ধভক্তিভাবোদয়,
প্রণমামি শরণ লয়ে ।
ভক্তগোষ্ঠী যাঁহার দেহ, সর্বজীব আশ্রয় গেহ,
গৌরাঙ্গের পাশ আমারে নিজয়ে ॥
কৃষ্ণকথামৃত-লেখক, গৌরতত্ত্ব জগৎ শিক্ষক,
করি তোমার নিত্যসঙ্গের আশা ।
প্রভুপাদের পথ বাহিরে, কলিকালের মায়া ভাইরে,
উদ্ধার পাইবার নাহি কোন আশা ॥
প্রচার অমৃত দিল যে, গুরুগৌরাঙ্গ প্রাণ সে,
কীর্তন করিবে রাধাদাস ।
প্রভুপাদ দিব্য দৃষ্টি সংসার গৌর প্রেমবৃষ্টি
হোক প্রভু তোমার আজ্ঞা চির দাস ॥
পাশ্চাত্যদেশ শূন্যবাদী, দুরাচারী মায়াবাদী,
উদ্ধার পাইল তোমার দয়ায় ।
প্রভুপাদ দয়া কর, কৃষ্ণভক্ত এবার কর,
তোমার দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হয়রে ॥

(৯)

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর ।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর ॥
কাঁহা মোর স্বরূপ-রূপ, কাঁহা সনাতন ?
কাঁহা দাস-রঘুনাথ পতিতপাবন ?
কাঁহা মোর ভট্টযুগ, কাঁহা কবিরাজ ?
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ?

পাষাণে কুটিব মাথা, অনলে পশিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব?
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস।
সে সঙ্গ না পাএগ্রা কান্দে নরোত্তম দাস॥

শ্রীগুরু বন্দনা

(১)

আশ্রয় করিয়া বন্দোঁ শ্রীগুরু-চরণ।
যাহা হৈতে মিলে ভাই কৃষ্ণপ্রেমধন॥
জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি।
ভুবনে প্রকাশ হন গুরুরূপ ধরি॥
মহিমায় গুরুকৃষ্ণ এক করি জান।
গুরু-আজ্ঞা হৃদে সব সত্য করি মান॥
সত্যজ্ঞানে গুরুবাক্যে যাহার বিশ্বাস।
অবশ্য তাহার হয় ব্রজভূমে বাস॥
যার প্রতি গুরুদেব হন পরসন্ন।
কোন বিঘ্নে সেই নাহি হয় অবসন্ন॥
কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবারে পারে।
গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিবারে নারে॥
গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু হন পতি।
গুরু বিনা এ সংসারে নাহি অন্য গতি॥
গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান না করিহ কখন।
গুরুনিন্দা কভু কর্ণে না কর শ্রবণ॥
গুরু-নিন্দুকের মুখ কভু না হেরিবে।
যথা হয় গুরুনিন্দা তথা না যাইবে॥

গুরুর বিক্রিয়া যদি দেখহ কখন ।
তথাপি অবজ্ঞা নাহি কর কদাচন ॥
গুরুপাদপদ্মে রহে যার নিষ্ঠা ভক্তি ।
জগৎ তারিতে সেই ধরে মহাশক্তি ॥
হেন গুরুপাদপদ্ম করহ বন্দনা ।
যাহা হৈতে ঘুচে ভাই সকল যন্ত্রণা ॥
গুরুপাদপদ্ম নিত্য যে করে বন্দন ।
শিরে ধরি বন্দি আমি তাঁহার চরণ ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদে করি আশ ।
শ্রীগুরু-বন্দনা করে সনাতন দাস ॥

(২)

গুরুদেব!

কৃপাবিন্দু দিয়া, কর' এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি হীন ।
সকল সহনে, বল দিয়া কর',
নিজ মানে স্পৃহা হীন ॥ ১ ॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ' নাথ! যথাযথ ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম-সুখে
অপরাধ হ'বে হত ॥ ২ ॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে, নাথ ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর' মোরে আত্মসাথ ॥ ৩ ॥

যোগ্যতা-বিচারে কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার ।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর ॥ ৪॥

(৩)

গুরুদেব! দয়াময়!
প্রাণের যাতনা জানাব কি তোমা
হয়েছে জীবন যন্ত্রণাময় ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিতে নাহি চাহে মতি,
বিষয় ভোগেতে প্রবলা আসক্তি,
বিষয়ের আশা নাহি ছাড়ে মন,
বিষয়েতে সদা ধায় ॥
কৃষ্ণ দাস্য ভুলি মায়ারে ভজিনু,
আপন স্বরূপ কভু না চিন্তিনু,
বিরূপে স্বরূপ ভাবি মূঢ় মন,
মায়াতে আকৃষ্ট হয় ॥
দুষ্ট সঙ্গ ফল না বুঝিনু হায়
সাধু কাছে যেতে চিত্ত নাহি চায়,
অসতের সঙ্গে থাকিয়া সতত,
চিত্ত হল বজ্র প্রায় ॥
কনক-কামিনী-লাভ-পূজা-আশা,
চাহে মোর চিত্ত আর প্রতিষ্ঠাশা
কিরূপে শোধিত হবে মোর চিত্ত
এই চিন্তা সদা হয় ॥

তব কৃপা-কণা আমার সম্বল,
তব কৃপা বিনা নাহি অন্য বল,
কৃপা কর প্রভু দিয়া চিদ্‌বল,
দাস তোমা প্রণময় ॥
সাধু সঙ্গে থাকি, ছয় বেগ দমি'
শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবি যেন আমি,
হেন মতি যাচে তব দাসাধম,
বন্দিতব রাঙ্গা পায় ॥
ওহে গুরুদেব! তব শ্রীচরণ,
সেবি যেন আমি জনম জনম,
এই আশীর্বাদ যাচি' অভাজন
তব পদে স্থান চায় ॥

(৪)

গুরুদেব!

বড় কৃপা করি', গৌড়বন মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান।
আজ্ঞা দিলা মোরে, এই ব্রজে বসি,
হরিনাম কর গান ॥ ১ ॥
কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এদাসের দয়া করি'।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্ত ভজিব হরি ॥ ২ ॥
শৈশব-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে
অভ্যাস হইল মন্দ।

নিজকর্ম-দোষে, এ দেহ হইল
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥ ৩ ॥
বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল' ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥ ৪ ॥

(৫)

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্মুখ, হয় কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি ।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাসদাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ॥
নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য-পরমহংসে,
শিষ্য বলি' অঙ্গীকার করে ।
অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হৈতে ।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে ॥
জয়ধর্মদাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম যতি,
তা' হতে ব্রহ্মণ্যতীর্থ-সূরি ।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাহা হৈতে মাধবেন্দ্রপুরী ॥

মাধবেন্দ্রপুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত বিভু ।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌর-মহাপ্রভু ॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগজনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন ॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব রঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণদাস প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ আশ ॥
বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্যসেবাপরা,
তাঁহার দয়িত দাস নাম ।
তাঁর প্রধান অনুগামী, শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী,
পতিতজনের দয়া ·ধাম ॥
তাঁ সবার পাদপদ্ম, ভকত-জনের সদ্ম,
সেই মোর একমাত্র ঠাম ।
এই সব হরিজন, গৌরাঙ্গের নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥

শ্রীনিত্যানন্দ বন্দনা

(১)

নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি ।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইল অবনী ॥
প্রেমের বন্যা লইয়া নিতাই আইল গৌড়দেশে ।
ডুবিল ভকতগণ দীন-হীন ভাসে ॥
দীন-হীন-পতিত-পামর নাহি বাছে ।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥
আবদ্ধ করুণা-সিন্ধু (নিতাই) কাটিয়া মুহান ।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম অমিয়ার বান ॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা না ভজিল ।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥

(২)

নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায় ।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যাঁ'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার ।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার ॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈএর, নিতাই-পদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি ।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইর চরণ দু'খানি ॥

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা-চরণের পাশ॥

(৩)

নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি॥
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥
সংসার-সুখের মুখে তুলে দিয়ে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাহিয়া নিতাই॥
যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব॥
গঙ্গা যাঁর পদজল, হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পেয়ে মরে॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে।
অনল ভেজাই তার মাঝ মুখখানে॥

(৪)

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান-শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি'।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি॥
এত বলি' নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোনার পর্বত, যেন ধূলাতে লুটায়॥

হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল ।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল ॥

(৫)

দয়া কর মোরে নিতাই দয়া কর মোরে ।
অগতির গতি নিতাই সাধু লোকে বলে ॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা পতাকা তোমার ।
অধম উত্তম কিছু না কৈলে বিচার ॥
প্রেমদানে জগজনে মন কৈলা সুখী ।
তুমি হেন দয়াল ঠাকুর, আমি কেনে দুঃখী ॥
কানুরাম দাস বলে কি বলিব আমি ।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি ॥

(৬)

বড় সুখের খবর গাই ।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই ॥ ১ ॥
বড় মজার কথা তায় ।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায় ॥ ২ ॥
যত ভক্তবৃন্দ বসি' ।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি' ॥ ৩ ॥
যদি নাম কিন্‌বে, ভাই ।
আমার সঙ্গে চল, মহাজনের কাছে যাই ॥ ৪ ॥
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম ।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হ'বে কাম ॥ ৫ ॥
বড় দয়াল নিত্যানন্দ ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম-আনন্দ ॥ ৬ ॥

একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
'গৌর' বলে' নিতাই দেন সকল সম্বল ॥ ৭ ॥
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণশিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যা, বল না করে অপেক্ষা ॥ ৮ ॥
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ॥ ৯ ॥
আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥ ১০ ॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাই-চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ॥ ১১ ॥

(৭)

নিতাই নাম হাটে, ও কে যাবিরে ভাই আয় ছুটে
এসে পাষণ্ড জগাই মাধাই দুজন সকল হাটের মাল নিলে লুটে ॥
হাটের অংশী মহাজন, শ্রীঅদ্বৈত, সনাতন,
ভাণ্ডারী শ্রীগদাধর পণ্ডিত বিচক্ষণ।
আছেন চৌকিদার আদি, হলেন শ্রীসঞ্জয় শ্রীশ্রীধর মুটে ॥
দালাল কেশব ভারতী, শ্রীবিদ্যাবাচস্পতি,
পরিচারক আছেন কৃষ্ণদাস প্রভৃতি
হন কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস পতি, ঝাড়ুদার কেদার জুটে ॥
হাটের মূল্য নিরূপণ, নয় ভক্তি প্রকরণ,
প্রেম হেন মুদ্রা সর্ব্বসার সংযমন নাই কমি বেশী সমান।
ও জন রে, সব এক মনে বোঝায় উঠে ॥
এই প্রেমের উদ্দেশ, একসাধু উপদেশ,
সুধাময় হরিনামরূপ সুসন্দেশ, এতে বড় নাই রে দ্বেষাদ্বেষ,
খায় একপাতে কাণাকুঠে ॥

(৮)

নদীয়া-গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন ।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥ ১ ॥
(শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন)
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা ।
বল 'কৃষ্ণ', ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা ॥ ২ ॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার ।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম—সবধর্ম্মসার ॥ ৪ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা

(১)

গৌরাঙ্গ তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ ।
আপন করিয়া রাঙ্গা চরণে রাখিহ ॥
তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু ।
শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু ॥
এ কুলে ও কুলে মুঞি দিনু তিলাঞ্জলি ।
রাখিহ চরণে মোরে আপনার বলি ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে চরণে ধরিয়া ।
কৃপা করি রাখ মোরে পদছায়া দিয়া ॥

(২)

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হ'বে পুলক শরীর ।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥

আর ক'বে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥

(৩)

গৌরাঙ্গ সুন্দর প্রেম জলধর
তপত কাঞ্চন কায় ।
নদীয়া নগরে হরিপ্রেম-ভরে
নাচিয়া নাচিয়া যায় ॥
রকত-কমল করপদতল
শতদল মুখশশী ।
নখরে নখরে সতত বিহরে
শশধর রাশি রাশি ॥
বেণু-বীণা রব মানে পরাভব
কণ্ঠে মধুর ভাষা ।
তাহে অবিরাম গায় হরিনাম
জাগায়ে প্রেম-পিপাসা ॥
শ্রীবাস-অঙ্গনে নিতায়ের সনে
নাম সংকীর্তনে নাচে ।
ঘরে ঘরে গিয়া, জীব উদ্ধারিয়া
যারে তারে প্রেম যাচে ॥

ভারত ভ্রমিয়া পদ পরশিয়া
পূত করিল ধূলি ।
সে চরণ রজ হর-কমলজ
সদা শিরে লয় তুলি ॥
লীলার তুলনা মেলেনা মেলেনা
তুমি লীলাময় হরি ।
হরিনাম দিলে জীব উদ্ধারিলে
নদীয়াতে অবতরি ॥

(৪)

গৌরাঙ্গের দু'টি পদ, যা'র ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতিরস-সার ।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্মল ভেল তা'র ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তা'র হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারি ।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তা'রে স্ফুরে,
সে-জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি' মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ ।
শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তা'র হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ!' ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তা'র সঙ্গ ॥

(৫)

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু ।
প্রেম-রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু ।
আপন করম-দোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্মবন্ধ-ফাঁস ॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু ।
গৌরকীর্তনরসে মগন না হৈনু ॥
এমন গৌরাঙ্গের গুণে না কান্দিল মন ।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম গেল অকারণ ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া ।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥

(৬)

কে যাবে কে যাবে ভাই ভবসিন্ধুপার ।
ধন্য কলিযুগের চৈতন্য অবতার ॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে অদান খেয়া বয় ।
জড় অন্ধ আতুর অবধি পার হয় ॥
হরিনামের নৌকাখানি শ্রীগুরু কাণ্ডারী ।
সংকীর্তন কোরোয়াল দুই বাহু পসারি ॥
সব জীব হৈল পার প্রেমের বাতাসে ।
পড়িয়া রহিল লোচন আপনার দোষে ॥

(৭)

কে গো তুমি কাঙ্গাল-বেশে
দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াও ।
অতি বড় ব্যথার ব্যথি
(তাই) নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাও ॥
অধম পতিত আচণ্ডালে
স্নেহের কোলে লওগো তুলে,
দিব্য-প্রেমের আঁখি খুলে
ভব-বাঞ্ছিত-পদ দেখায়ে দাও ॥
এমন দয়াল কে গো তুমি
বিলালে প্রেম-চিন্তামণি,
ধর লও ব'লে প্রেমের খনি
আচণ্ডালে বিলায়ে দাও ॥
আচণ্ডালে প্রেম বিলালে,
ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়াইলে,
(মায়া-) মুগ্ধ-জীবের ভবক্ষুধা
চিরতরে মিটিয়ে দাও ॥
যমুনার কূলে কদম্বের মূলে
বাজাতে বাঁশী রাধা ব'লে ।
সেই না তুমি গৌর হয়ে
নদে' এসে জীব তরাও ॥

(৮)

গোরাগুণ গাও শুনি ।
বহু পুণ্য ফলে, সো পহুঁ মিলল,
প্রেম পরশমণি ॥

অখিল জীবের, এ শোক-সাগর,
নয়ন নিমেষে শোষে ।
ওই প্রেম লেশ, পরশ না পাইলে,
পরাণ জুড়াবে কিসে ॥
অরুণ নয়নে, বরুণ আলয়,
করুণায় নিরিখণে ।
মধুর আলাপে, আখরে আখরে,
সুধাধারা বরিষণে ॥
প্রেমে ঢল ঢল, পুলকে পূরল,
আপাদ মস্তক তনু ।
বাসুদেব কহে, শত ধারা বহে,
সুমেরু সিঞ্চিত জনু ॥

(৯)

(যদি) গৌর না হইত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিতাম দে' ।
রাধার মহিমা, প্রেম-রসসীমা,
জগতে জানাত কে?
মধুর বৃন্দা- বিপিন-মাধুরী,
প্রবেশ চাতুরী সার ।
বরজ-যুবতী- ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কা'র?
গাও গাও পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল করিয়া মন ।
এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল,
না দেখিয়ে একজন ॥

(আমি) গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া,
কেমনে ধরিনু দে' ।
বাসুর হিয়া, পাষাণ দিয়া,
(বিধি) কেমনে গড়িয়াছে ॥

(১০)

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায় ।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু ।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে ।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জনগমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কয় অপরূপ শোভা ।
শিশুরূপ দেখি হয় জগমন লোভা ॥

(১১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি' ।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি' ॥ ১ ॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান ।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥ ২ ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ,—বিশ্বাস, পালন ॥ ৩ ॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্যের স্বীকার ।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জনাঙ্গীকার ॥ ৪ ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার ।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥ ৫ ॥

রূপ সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি' ।
ভক্তিবিনোদ পড়ে দুহঁ পদ ধরি' ॥ ৬ ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে "আমি ত' অধম ।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥ ৭ ॥

(১২)

সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি-কীর্তন মেঁ ।
ভালে চন্দন তিলক মনোহর,
অলকা শোভে কপোলন মেঁ ॥
সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি-কীর্তন মেঁ ।
শিরে চূড়া দরশীবালে,
বনফুলমালা হিয়াপর দোলে ॥
পহিরন পীত-পটাম্বর শোভে,
(নূপুর) রুণু ঝনু চরণো মেঁ ।
রাধা-কৃষ্ণ এক তনু হ্যায়,
নিধুবন মাঝে বংশী বাজায় ॥
বিশ্বরূপ কি প্রভুজী সহি
আওত প্রকটহি নদীয়ামে ।
সুন্দরলালা শচীদুলালা,
নাচত শ্রীহরি-কীর্তন মেঁ ॥
কোহি গায়ত হ্যায় রাধাকৃষ্ণ নাম,
কোহি গায়ত হ্যায় হরিগুণ গান ।
মঙ্গলতান—মৃদঙ্গ রসাল,
বাজত হ্যায় কোহি রঙ্গণ মে ॥

(১৩)

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া ।

ভোজন-শয়নে, দেহের যতন,
ছাড়িব বিরক্ত হঞা ॥ ১ ॥
নবদ্বীপ ধামে, নগরে নগরে,
অভিমান পরিহরি' ।
ধামবাসী-ঘরে, মাধুকরী ল'ব,
খাইব উদর ভরি' ॥ ২ ॥
নদীতটে গিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি,
পিব প্রভু-পদজল ।
তরুতলে পড়ি', আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল ॥ ৩ ॥
কাকুতি করিয়া, 'গৌর-গদাধর',
'শ্রীরাধা-মাধব' নাম ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ডাকি' উচ্চরবে,
ভ্রমিব সকল ধাম ॥ ৪ ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া, পড়িব চরণে,
হৃদয়ের বন্ধু জানি' ।
বৈষ্ণব ঠাকুর, 'প্রভুর কীর্তন',
দেখাইবে দাস মানি' ॥ ৫ ॥

(১৪)

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে-করিবেন দয়া ।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া ॥ ১ ॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান ।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥ ২ ॥

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলী বৈষ্ণব-নিকটে ।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥ ৩ ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম ।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥ ৪ ॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর ।
আমা-লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥ ৫ ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণদয়াময় ।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয় ॥ ৬ ॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে ।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥ ৭ ॥

(১৫)

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর ।
হেন অবতার, কবে কি হয়েছে,
হেন প্রেম পরচার ॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে ।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥
ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি ।
কাঙালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি ॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ।

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল-করতালে
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে ।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল-সোর ।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল মোর ॥

(১৬)

ওহে প্রেমের ঠাকুর গোরা ।
প্রাণের যাতনা কিবা ক'ব নাথ ।
হয়েছি আপন হারা ॥
কি আর বলিব যে কাজের তরে,
এনেছিলে নাথ! জগতে আমারে,
এতদিন পরে কহিতে সে কথা
খেদে দুঃখে হই সারা ।
তোমার ভজনে না জন্মিল রতি,
জড় মোহে মত্ত সদা দুরমতি,
বিষয়ীর কাছে থেকে থেকে আমি
হইনু বিষয়ী পারা ॥
কে আমি, কেন যে এসেছি এখানে,
সে কথা কখনো নাহি ভাবি মনে,
কখনো ভোগের, কখনো ত্যাগের
ছলনায় মন নাচে ।

কি গতি হইবে কখনো ভাবি না,
হরি-ভকতের কাছেও যাই না,
হরি-বিমুখের কুলক্ষণ যত
আমাতেই সব আছে ॥
শ্রীগুরুকৃপায় ভেঙেছে স্বপন,
বুঝেছি এখন তুমিই আপন,
তব নিজজন পরম বান্ধব,
সংসার-কারাগারে ।
আর না ভজিব ভক্ত-পদ বিনু,
(ঐ) রাতুল চরণে শরণ লইনু,
উদ্ধারহ নাথ! মায়াজাল হ'তে
এ দাসের কেশে ধ'রে ॥
পাতকীরে তুমি কৃপা কর নাকি?
জগাই মাধাই ছিল যে পাতকী,
তাহাতে জেনেছি, প্রেমের ঠাকুর।
পাতকীরে তার' তুমি ।
আমি ভাগ্যহীন, দীন, অকিঞ্চন
অপরাধী-শিরে দাও দু'চরণ ।
তোমার অভয় শ্রীচরণে চির
শরণ লইনু আমি ॥

(১৭)

মনরে! কহনা গৌর কথা ।
গৌরের নাম অমিয়ার ধাম
পীরিতি মূরতি দাতা ॥

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়নের তারা ।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলায় হার ॥
হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গে রাখিয়ে
বিরলে বসিয়া র'ব ।
মনের সাধেতে সে রূপ-চাঁদেরে
নয়নে নয়নে থোব ॥
গৌর বিহনে না বাঁচি পরানে
গৌর করেছি সার ।
গৌর বলিয়া যাউক জীবন
কিছু না চাহিব আর ॥
গৌর গমন গৌর গঠন
গৌর মুখের হাসি ।
গৌর পীরিতি গৌর মূরতি
হিয়ায় রহল পশি ॥
গৌর ধরম গৌর করম
গৌর বেদের সার ।
গৌর চরণে পরাণ সঁপিনু
গৌর করিবেন পার ॥
গৌর শবদ গৌর সম্পদ
যাহার হিয়ায় জাগে ।
নরহরি দাস তার দাসের দাস
চরণে শরণ মাগে ॥

(১৮)

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন ॥
নীলাচলে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
নদীয়া নগরে দণ্ড-কমণ্ডলু কর ॥
কেহো বলে পুরবেতে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বৈভব-লীলা প্রকাশ করিলা ॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরেকৃষ্ণ নাম গৌর করিলা প্রচার ॥
বাসুদেব ঘোষ বলে করি জোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥

(১৯)

আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি' গৃহ-বিষকূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশ হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি' সব লাজ-ভয়,
কায়মনে লহ রে শরণ।
পরম দুর্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল,
তারা হৈল পতিতপাবন ॥

গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার-শমন ।
নরোত্তমদাসে কহে, গোরা-সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

(২০)

অবতার সার, গোরা-অবতার,
কেননা ভজিলি তাঁরে ।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে ॥
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন),
অমৃত পাইবার আশে ।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন),
নাশাতে পশিল কীট ।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি', কাঠ চুষিলি (মন),
কেমনে পাইবি মিঠ ॥
'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন),
শমন-কিঙ্কর সাপ ।
'শীতল' বলিয়া, আগুন পোহালি (মন),
পাইলি বজর-তাপ ॥
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা ।
ইহ-পরকাল, দু'কাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা ॥

(২১)

কলিঘোর তিমিরে গরাসল জগজন,
ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর ॥
ভাইরে ভাই, গোরা গুণ কহন না যায়।
কত শত আনন কত চতুরানন,
বরণিয়া ওর নাহি পায় ॥
চারিবেদ ষড়-দরশন করি যদি অধ্যয়ন,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে ॥
বেদ বিদ্যা দুই কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে সেই ত' সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার ॥

(২২)

না যাইহ ওরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ চাইয়া ॥
কমলনয়ন তোমার শ্রীচন্দ্রবদন।
অধর সুরঙ্গ কুন্দর মুকুতা দশন ॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কিসে গজেন্দ্রগমন ॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥

পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে ।
গৃহে থাকি সংকীর্তন কর তুমি রঙ্গে ॥
ধর্ম বুঝাইতে বাপ তব অবতার ।
জননী ছাড়িবা কোন্ ধর্মের বিচার ॥
তুমি ধর্মময় যদি জননী ছাড়িবা ।
কেমনে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা ॥
তোমার অগ্রজ আমা ছাড়িয়া চলিলা ।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিনু ।
তুমি গেলে জীবন ত্যজিব তোমা বিনু ॥
প্রেমশোকে কহে শচী বিশ্বম্ভর পাশ ।
প্রেমেতে রোধিতকণ্ঠ বৃন্দাবন দাস ॥

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বন্দনা

(১)

দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন ।
নাচ্‌রে আমার মন্ নাচ্‌রে আমার মন ॥
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে পাবে প্রেমধন ।
(ও নামে অপরাধ বিচার তো নাই হে)
(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে ঘুচিবে বন্ধন ॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হ'বে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হবে জীবের জীবন ।
(কৃষ্ণে রতিবিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামে পাবে দরশন ॥
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

(২)

নাচেরে নাচেরে নিতাই-গৌর দ্বিজমনিয়া ।
বামে প্রিয় গদাধর, শ্রীবাস অদ্বৈত বর,
পারিষদ তারাগণ জিনিয়া ॥
বাজে খোল-করতাল, মধুর সংগীত ভাল,
গগন ভরিল হরি ধনিয়া ।
চন্দন-চর্চিত কায়, ফাণ্ড বিন্দু বিন্দু তায়,
বনমালা দোলে ভালে বনিয়া ॥
গলে শুভ্র উপবীত, রূপে কোটি কামজিত,
চরণে নূপুর রণ রণিয়া ।
দুই ভাই নাচি যায়, সহচরগণ গায়,
গদাধর অঙ্গে পড়ে ঢুলিয়া ॥
পুরব রহস্য লীলা এবে পঁহু প্রকাশিলা,
সেই বৃন্দাবন এই নদীয়া ।
বিহরে গঙ্গার তীরে সেই ধীর সমীরে,
বৃন্দাবন দাস কহে জানিয়া ॥

(৩)

পরম করুণ, পঁহু দুইজন,
নিতাই গৌরচন্দ্র ।
সব অবতার, সার-শিরোমণি,
কেবল আনন্দ-কন্দ ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল হরি হরি ॥

দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা ।
পশু-পাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি যাঁর গুণগাথা ॥
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন,
কহয়ে লোচন দাস ॥

(৪)

নিতাই-গৌর নাম, আনন্দের ধাম,
যেই জন নাহি লয় ।
তারে যমরাজা, ধরে লয়ে যায়,
নরকে ডুবায় তায় ॥
তুলসীর হার, না পরে যে ছার,
যমালয়ে বাস তাঁর ।
তিলক ধারণ, না করে যে জন,
বৃথায় জনম তার ॥
না লয় হরিনাম, বিধি তারে বাম
পামর পাষণ্ড মতি ।
বৈষ্ণব সেবন, না করে যে জন,
কি হবে তার গতি ॥
গুরুমন্ত্র সার, কর এইবার,
ব্রজেতে হইবে বাস ।
তমোগুণ যাবে, সত্ত্বগুণ পাবে,
হইবে কৃষ্ণের দাস ॥

এ দাস লোচন, বসে অনুক্ষণ,
(নিতাই) গৌরগুণ গাও সুখে ।
এই রসে যার, রতি না হইল,
চুন কালি তার মুখে ॥

(৫)

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।
অদ্বৈত-আচার্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম ॥
বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত-পুরাণ ॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস ।
বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মন ঘেরা,
কহে দীন নরোত্তমদাস ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বন্দনা

(১)

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন ।
রতন বেদীর উপর বসাব দু'জন ॥

শ্যামগৌরী-অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ ।
চামর ঢুলাব কবে, হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে ।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর-তাম্বুলে ॥
ললিতা-বিশাখা-আদি যত সখীবৃন্দ ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস ।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥

(২)

'রাধাকৃষ্ণ' বল্ বল্ বল্ রে সবাই ।
(এই) শিক্ষা দিয়া, সব নদীয়া,
ফিরছে নেচে গৌর-নিতাই ।
(মিছে) মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে,'
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই ॥ ১ ॥
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস
করলে ত' আর দুঃখ নাই ।
('কৃষ্ণ') বলবে যবে, পুলক হ'বে,
ঝরবে আঁখি, বলি তাই ॥ ২ ॥
('রাধা) কৃষ্ণ' বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই ।
(যায়) সকল বিপদ, ভক্তিবিনোদ,
বলেন, যখন ও-নাম গাই ॥ ৩ ॥

(৩)

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ যুগল-মিলন ।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ ॥ ১ ॥
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর ।
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া-মনোহর ॥ ২ ॥
ললিতমাধব-বামে বৃষভানু-কন্যা ।
সুনীলবসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা ॥ ৩ ॥
নানাবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল ।
হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল ॥ ৪ ॥
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায় ।
প্রিয়নর্ম্মসখী যত চামর ঢুলায় ॥ ৫ ॥
শ্রীরাধামাধব-পদ-সরসিজ-আশে ।
ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে ॥ ৬ ॥

(৪)

মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল,
মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল ।
তেরা ক্যা লাগেগা মূল?
মাতা কহে পুত্র হামারা,
বহিন কহে এ বীরা ।
ভাই কহে—ভুজা হামারি,
নারী কহে—নর মেরা ॥
মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল ।
যব নর রোগশয্যামে হ্যায়,
তব্ সব রোনে লাগি ।

যব পিঞ্জরসে প্রাণ নিকলি হ্যায়,
তব্ লেচল লেচল হৈ (লাগিরে) ॥
মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল ।
পেট পাকড়কর মাতা রোয়ে,
বাহা পাকড়কর ভাই ।
লপটি-ঝপটিকর স্ত্রীয়া রোয়ে,
হন্‌সে একেলা যাই ॥
রে মনুয়া, রাধেকৃষ্ণ বোল ।
চারিগজ কি চাদর মাঙ্গাওয়ে,
বনে কাঠ কি ঘোড়ী ।
চারো ওরসে আগ লাগাওয়ে,
ফুক দিয়ে যায়সে হোরি ॥

(৫)

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা ।
কৃষ্ণভজন তব অকারণ গেলা ॥ ১ ॥
আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি ।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥ ২ ॥
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী ।
রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥ ৩ ॥
কবঁহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ ।
চিত্তে ইচ্ছসি যদি ব্রজরস-রঙ্গ ॥ ৪ ॥
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান ।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল-কান ॥ ৫ ॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী ।
রাধিকা-পদরজ পূজয়ে মানি ॥ ৬ ॥

উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী ।
রাধা-অবতার সবে,—আম্নায় বাণী ॥ ৭ ॥
হেন রাধা-পরিচর্যা যাঁকর ধন ।
ভক্তিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥ ৮ ॥

(৬)

রাধারাণী কী জয় মহারাণী কী জয় ।
বোলো বরষাণে বালী কী জয় জয় জয় ॥
ঠাকুরাণী কী জয় হরি-পিয়ারী কী জয় ।
বৃষভানু-দুলালী কী জয় জয় জয় ॥
গৌরাঙ্গী কী জয় হেমাঙ্গী কী জয় ।
ব্রজরাজকুমারী কী জয় জয় জয় ॥
ব্রজরাণী কী জয় ব্রজদেবী কী জয় ।
গহ্বর বনবারী কী জয় জয় জয় ॥

(৭)

ভজ রাধা কৃষ্ণ, গোপাল কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মুখে ।
নামে বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়,
স্বভাব জাগায় মহাসুখে ॥
হরি দীনবন্ধু, চিরদিন বন্ধু,
জীবের চির সুখে দুঃখে ।
(তাহি) ভজরে অন্ধ, চরণারবিন্দ
দুস্তর মায়া-বিপাকে ॥
ভজ মূঢ়মতি, তব চিরসাথী,

যাঁহার করুণা লোকে লোকে ।
তবে কেন পান্থ, এত তুমিভ্রান্ত,
কোথায় ছুটিছ দিকে দিকে?
(সেই) লীলাময় হরি, এসেছে নদীয়াপুরী
রাধার পিরীতি ল'য়ে বুকে ॥

(৮)

কৃষ্ণ জিন্‌কো নাম হ্যায়,
গোকুল জিন্‌কা ধাম হ্যায়,
এয়সে শ্রীভগবানকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ।
যশোদা জিন্‌কী মাইয়া হ্যায়,
নন্দজী বাপাইয়া হ্যায়,
এয়সে শ্রীগোপালকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥
রাধা জিন্‌কী জায়া হ্যায়,
অদ্ভুত জিন্‌কী মায়া হ্যায়,
এয়সে শ্রীঘনশ্যামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ।
লুট লুট দধি মাখন খায়ো,
গোয়ালবাল-সঙ্গ ধেনু চরায়ো,
এয়সে লীলাধামকো বারংবার প্রণাম হ্যায় ॥
দ্রুপদসুতাকো লাজ বচায়ো,
গ্রাহসে গজকো ফন্দ ছোড়ায়ো,
এয়সে কৃপাধামকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ।
কুরু-পাণ্ডবকা যুদ্ধ মচায়ো,
অর্জ্জুনকো উপদেশ শুনায়ো,
এয়সে দীননাথকো বারম্বার প্রণাম হ্যায় ॥

(৯)

জয় রাধে, জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি-গোবর্ধন ।
কালিন্দী যমুনা জয়, জয় মহাবন ॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ কানন ।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ॥
শ্রীনন্দযশোদা জয়, জয় গোপগণ ।
শ্রীদামাদি জয়, জয় ধেনুবৎসগণ ॥
জয় বৃষভানু, জয় কীর্তিদা-সুন্দরী ।
জয় পৌর্ণমাসী, জয় আভীর নগরী ॥
জয় জয় গোপীশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ ॥
জয় রামঘাট, জয় রোহিণীনন্দন ।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন ॥
জয় দ্বিজপত্নী, জয় নাগকন্যাগণ ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দচরণ ॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয়, জয় রাধাশ্যাম ।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব মনোরম ॥
জয় জয়োজ্জ্বল রস সর্বরস-সার ।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥
শ্রীজাহ্নবাপাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম-সংকীর্তন ॥

(১০)

যমুনা পুলিনে, কদম্ব-কাননে,
কি হেরিনু সখি! আজ।
শ্যাম বংশীধারী, মণিমঞ্চোপরি,
করে' লীলা রসরাজ ॥ ১ ॥
কৃষ্ণকেলি সুধা-প্রসবণ।
অষ্টদলোপরি, শ্রীরাধা-শ্রীহরি,
অষ্টসখী পরিজন ॥ ২ ॥
সুগীত নর্তনে, সব সখীগণে,
তুষিছে যুগলধনে।
কৃষ্ণলীলা হেরি, প্রকৃতি সুন্দরী,
বিস্তারিছে শোভা বনে ॥ ৩ ॥
ঘরে না যাইব, বনে প্রবেশিব,
ও লীলা-রসের তরে।
ত্যজি' কুললাজ, ভজ ব্রজরাজ,
বিনোদ মিনতি করে ॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীনাম-সংকীর্তন

(১)

নানাদ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ,
কৃপা করি কর আগমন।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন, আনিল মোহান্তগণ,
কীর্তনের করে অধিবাস।

অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কালি হবে মহোৎসববিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলাগান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, সকল ভকতবৃন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥

(২)

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘট স্থাপন,
আম্রপল্লব সারি সারি ।
দ্বিজ বেদধ্বনি পড়ে, নারীগণ জয়কারে,
আর সবে বলে হরি হরি ॥
দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল,
করিয়া আনন্দ পরকাশ ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালাচন্দন,
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস ॥
সবার আনন্দমন, বৈষ্ণবের আগমন,
কালি হবে চৈতন্যকীর্ত্তন ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম,
গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥

(৩)

শ্রীহরি-বাসরে হরিকীর্ত্তন বিধান ।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥
পূর্ণবস্তু শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি গোপাল-গোবিন্দ ॥

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা ।
আনন্দে নাচয়ে সবে হইয়া বিহ্বলা ॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল ।
সংকীর্তন সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ ।
চৌদিকের অমঙ্গল সব যায় নাশ ॥
চতুর্দিকে শ্রীহরি মঙ্গল সংকীর্তন ।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে ।
যাঁর রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥
যাঁর নামে বাল্মিকী হইল তপোধন ।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন ॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধন ঘুচে ।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥
যাঁর নাম লইয়া শুক-নারদ বেড়ায় ।
সহস্র বদনে প্রভু যার গুণ গায় ॥
সর্ব মহাপ্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম ।
সেই প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান ॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর ॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায় ।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

(৪)

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকতসমূহ লইয়া সাথে
গেলা নগর ব্রাজে।
'তাথই তাথই' বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ,
চরণে নূপুর বাজে ॥ ১ ॥
মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলেন বলরে বদন ভরি,'
মিছে নিদ-বশে গেলরে রাতি,
দিবস শরীর-সাজে।
এমন দুর্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,
চরমে পড়িবে লাজে ॥ ২ ॥
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই,
না ভজ হৃদয় রাজে।
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে ॥ ৩ ॥

জীবের কল্যাণ-সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম,
অবিদ্যা-তিমির তপন-রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে ।
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন-মাঝে ॥ ৪ ॥

(৫)

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে ।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে ॥ ১ ॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার-ভিতরে ।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥ ২ ॥
তোমারে লইতে আমি হৈনু অবতার ।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥ ৩ ॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি' ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি' ॥ ৪ ॥
ভকতিবিনোদ প্রভু-চরণে পড়িয়া ।
সেই হরিনাম-মন্ত্র লইল-মাগিয়া ॥ ৫ ॥

(৬)

বিভাবরী শেষ, আলোক-প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব ।
বল হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি,
রাম কৃষ্ণ হয়গ্রীব ॥ ১ ॥

নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম ।
পূতনা-ঘাতন, কৈটভ-শাতন,
জয় দাশরথি-রাম ॥ ২ ॥
যশোদা দুলাল, গোবিন্দ-গোপাল,
বৃন্দাবন পুরন্দর ।
গোপীপ্রিয়-জন, রাধিকা-রমণ,
ভুবন-সুন্দরবর ॥ ৩ ॥
রাবাণান্তকর, মাখন তস্কর,
গোপীজন-বস্ত্রহারী ।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল,
চিত্তহারী বংশীধারী ॥ ৪ ॥
যোগীন্দ্র-বন্দন, শ্রীনন্দ-নন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী ।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহনবংশীবিহারী ॥ ৫ ॥
যশোদা-নন্দন, কংস-নিসূদন,
নিকুঞ্জরাস-বিলাসী ।
কদম্ব-কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ॥ ৬ ॥
আনন্দ-বর্ধন, প্রেম-নিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম ।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্ত-বিনোদন,
সমস্ত-গুণগণ-ধাম ॥ ৭ ॥

যামুন-জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানসচন্দ্র-চকোর।
নাম-সুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর ॥ ৮ ॥

(৭)

(হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভাগবত, গীতা ॥
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পূরণ ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর, মুঞি তাঁর দাস।
তাঁ' সবার পদরেণু-মোর পঞ্চগ্রাস ॥
তাঁদের-চরণ-সেবি ভক্তসনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥
আনন্দে বল হরি, ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।
নাম-সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস ॥

(৮)

গায় গোরা মধুর স্বরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১ ॥
গৃহে থাক, বনে থাক, সদা 'হরি' বলে ডাক,
সুখে-দুঃখে ভুল না'ক,
বদনে হরিনাম কর রে ॥ ২ ॥
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আজ মিছে কাজ ল'য়ে
এখনও চেতন পেয়ে,
'রাধা-মাধব' নাম বল রে ॥ ৩ ॥
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ,
ভক্তিবিনোদোপদেশ,
একবার নামরসে মাত রে ॥ ৪ ॥

(৯)

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ধ্রু ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ১ ॥
একবার বল্ রসনা উচ্চৈঃস্বরে ।
(বল) নন্দের নন্দন, যশোদা জীবন,
শ্রীরাধারমণ, প্রেমভরে ॥ ২ ॥
(বল) শ্রীমধুসূদন, গোপী-প্রাণধন,
মুরলীবদন, নৃত্য করে' ।

(বল) অঘ-নিসূদন, পূতনা-ঘাতন,
ব্রহ্ম-বিমোহন, ঊর্দ্ধকরে
হরে কৃষ্ণ হরে ॥ ৩ ॥

(১০)

'হরি' বলে' মোদের গৌর এলো ॥ ধ্রু ॥
এল রে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলোথেলো ।
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল ॥ ১ ॥
সঙ্কীর্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল ।
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল ॥ ২ ॥
গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল ।
ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল ॥ ৩ ॥
নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এল নামের হাটে ।
গৌর এল হাটে, সঙ্গে নিতাই এল হাটে ॥ ৪ ॥
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে ।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে ॥ ৫ ॥
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে ।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে ॥ ৬ ॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে ।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে ॥ ৭ ॥

(১১)

যশোমতী-নন্দন, ব্রজবর-নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান ।
গোপী-পরাণ-ধন, মদন-মনোহর,
কালিয়দমন বিধান ॥ ১ ॥

অমল হরিনাম
অমিয়-বিলাসা ।
বিপিন-পুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥ ২ ॥
ব্রজজন-পালন, অসুরকুল-নাশন,
নন্দ-গোধন-রাখওয়ালা ।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত-তস্কর
সুন্দর নন্দগোপালা ॥ ৩ ॥
যামুনতটচর, গোপী-বসনহর,
রাস-রসিক, কৃপাময় ।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥ ৪ ॥

(১২)

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
'রাধিকারমণ'-নামে ।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে ॥ ১ ॥
অমিয়-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ যুগলে-গিয়া ।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া ॥ ২ ॥
মাধুরীপুর, আসব পশি',
মাতায় জগত-জনে ।

কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ॥ ৩ ॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি',
প্রেমের সঘন রোল ।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
'বোল বোল হরি বোল' ॥ ৪ ॥
সহস্রানন, পরমসুখে,
'হরি হরি' বলি' গায় ।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম রস সবে পায় ॥ ৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি',
পুরা'ল আমার আশ ।
শ্রীরূপ-পদে যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ দাস ॥ ৬ ॥

(১৩)

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল ।
বিষয় বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম ।
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম ॥ ১ ॥
হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর,
স্থির হইতে না পারে চরণ ॥ ২ ॥

চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম, পুলকিত সব চর্ম,
বিবর্ণ হইল কলেবর।
মূর্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন,
ভাবে সর্ব-দেহ জর জর ॥ ৩ ॥
করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব,
মোরে ডারে প্রেমের সাগরে।
কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত' বাতুল কৈল,
মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে' ॥ ৪ ॥
লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র,
বর্ণিতে না পারি এ সকল।
কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়,
সেই মোর সুখের সম্বল ॥ ৫ ॥
প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম,
হেন বল করয়ে প্রকাশ।
ঈষৎ বিকশি পুনঃ, দেখায় নিজ-রূপ-গুণ,
চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥ ৬ ॥
পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা,
দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস।
মোরে সিদ্ধ-দেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া,
এ দেহের করে সর্বনাশ ॥ ৭ ॥
কৃষ্ণনাম-চিন্তামণি, অখিল রসের খনি,
নিত্য-মুক্ত শুদ্ধরসময়।
নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত,
তবে মোর সুখের উদয় ৮ ॥

শরণাগতি

(১)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি' ।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি' ॥ ১ ॥
অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান ।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥ ২ ॥
দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ,—বিশ্বাস, পালন ॥ ৩ ॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্যের স্বীকার ।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জনাঙ্গীকার ॥ ৪ ॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার ।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥ ৫ ॥
রূপ সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি' ।
ভক্তিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি' ॥ ৬ ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে "আমি ত' অধম ।
শিখায়ে শরণাগতি কর হে উত্তম ॥ ৭ ॥

(২)

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা ।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা ॥ ১ ॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধনপাশে ।
একবার প্রভু! দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥ ২ ॥

তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া
করিব ভজন তব ।
জনম হইল, পড়ি' মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান লব ॥ ৩ ॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে,
হাসিয়া কাটানু কাল ।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল ॥ ৪ ॥
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক-সহ ।
আর কিছু দিনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ॥ ৫ ॥
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি' দেশে দেশে,
ধন উপার্জন করি ।
স্বজন পালন, করি একমনে,
ভুলিনু তোমারে, হরি । ৬ ॥
বার্ধক্যে এখন, ভকতিবিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি ।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হবে গতি ॥ ৭ ॥

(৩)

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ ।

পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥ ১ ॥
নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর ।
পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পর-দুঃখ সুখকর ॥ ২ ॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসাগর্ব বিভূষণ ॥ ৩ ॥
নিদ্রালস্য হত, সুকার্যে বিরত,
অকার্যে উদ্যোগী আমি ।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী ॥ ৪ ॥
এ হেন দুর্জন, সজ্জন-বর্জিত,
অপরাধী নিরন্তর ।
শুভকার্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর ॥ ৫ ॥
বার্ধক্যে এখন, উপায়বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন ।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন ॥ ৬ ॥

(৪)

(প্রভু হে!)

এমন দুর্মতি সংসার ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি ।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥ ১ ॥
দয়া করি' মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া ।
ওহে দীনজন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হ'বে হিয়া ॥ ২ ॥
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার ।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভবপার ॥ ৩ ॥
বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ বিপ্রসুত ।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥ ৪ ॥
নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাই (শ্রী),
নিজ-নাম করি' দান ।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ-পরিত্রাণ ॥ ৫ ॥
সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি, নাথ !
তোমার চরণতলে ।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন-কাহিনী বলে ॥ ৬ ॥

(৫)

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,'
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥ ১ ॥
অশোক অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয়।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥ ২ ॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী।
তব সুখ যাহে করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥ ৩ ॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥ ৪ ॥
পূর্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥ ৬ ॥

(৬)

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর ॥ ১ ॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে ।
দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে ॥ ২ ॥
মারবি রাখবি—যো ইচ্ছা তোহারা ।
নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা ॥ ৩ ॥
জন্মাওবি মোএ ইচ্ছা যদি তোর ।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥ ৪ ॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস ।
বহির্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥ ৫ ॥
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা বিহীন যে ভক্ত ।
লভইতে তাঁক সঙ্গ অনুরক্ত ॥ ৬ ॥
জনক, জননী, দয়িত, তনয় ।
প্রভু, গুরু, পতি—তুহুঁ সর্বময় ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান!
রাধানাথ! তুহুঁ হামার পরাণ ॥ ৮ ॥

(৭)

আমার' বলিতে প্রভু! আর কিছু নাই ।
তুমিই আমার মাত্র পিতা-বন্ধু-ভাই ॥ ১ ॥
বন্ধু, দারা, সুত-সুতা—তব দাসী দাস ।
সেই ত' সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস ॥ ২ ॥
ধন, জন, গৃহ, দাস 'তোমার' বলিয়া ।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া ॥ ৩ ॥

তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন ।
তোমার সংসারব্যয় করিব বহন ॥ ৪ ॥
ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি ।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী ॥ ৫ ॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা ।
শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন-বাসনা ॥ ৬ ॥
নিজসুখ লাগি' কিছু নাহি করি আর ।
ভকতিবিনোদ বলে, তব সুখ-সার ॥ ৭ ॥

(৮)

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার ।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥ ১ ॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন ।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥ ২ ॥
তব ইচ্ছামতে শিব করেন সংহার ।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥ ৩ ॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ ।
সমৃদ্ধি-নিপাতে দুঃখ সুখ-সংঘটন ॥ ৪ ॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশেপাশে ফিরে' ।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥ ৫ ॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার ।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥ ৬ ॥
নিজ-বল-চেষ্টা-প্রতি ভরসা ছাড়িয়া ।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন ।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন মরণ ॥ ৮ ॥

(৯)

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত ।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত-তারণে রত ॥ ১ ॥
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ!
তুমি ত' করুণাময় ।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥ ২ ॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী-ভিতরে নাহি ।
দয়াল ঠাকুর! ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥ ৩ ॥
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে, নাথ!
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা, জগন্নাথ ॥ ৪ ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি ।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি ॥ ৫ ॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পা-য় ।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ॥ ৬ ॥

(১০)

শুদ্ধভকত- চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম-সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ॥ ১ ॥
মাধব-তিথি ভক্তি-জননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি'
পরম আদরে বরি ॥ ২ ॥
গৌর আমার যে সব স্থানে,
করিল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥ ৩ ॥
মৃদঙ্গবাদ্য শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত কীর্তন শুনি',
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥ ৪ ॥
যুগলমূর্তি দেখিয়া মোর,
পরম-আনন্দ হয়।
প্রসাদ সেবা করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয় ॥ ৫ ॥
যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।
চরণ-সীধু দেখিয়া গঙ্গা,
সুখ না সীমা পায় ॥ ৬ ॥

তুলসী দেখি' জুড়ায় প্রাণ,
মাধবতোষণী জানি'।
গৌর প্রিয় শাক-সেবনে,
জীবন সার্থক মানি ॥ ৭ ॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে,
অনুকূল পায় যাহা।
প্রতিদিবসে, পরম-সুখে,
স্বীকার করয়ে তাহা ॥ ৮ ॥

(১১)

হরি হে!
প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার ॥ ১ ॥
করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥ ২ ॥
বাক্য-মনো-বেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসা'য়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ॥ ৩ ॥
অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।

অনাথের নাথ! ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥

প্রার্থনা

(১)

কৃষ্ণ তব পুণ্য হবে ভাই ।
এ পুণ্য করিবে যবে, রাধারাণী খুশী হবে,
ধ্রুব অতি বলি তোমা তাই ॥
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শচী-সুত প্রিয় অতি,
কৃষ্ণ-সেবায় যাঁর তুল্য নাই ।
সেই সে মোহান্ত-গুরু, জগতের মধ্যে উরু,
কৃষ্ণভক্তি দেয় ঠাঁই ঠাঁই ॥
তাঁর ইচ্ছা বলবান, পাশ্চাত্যেতে ঠান্‌ঠান্‌,
হয় যাতে গৌরাঙ্গের নাম ।
পৃথিবীতে নগরাদি, আসমুদ্র নদনদী,
সকলেই লয় কৃষ্ণনাম ॥
তাহলে আনন্দ হয়, তবে হয় দিগ্বিজয়,
চৈতন্যের কৃপা অতিশয় ।
মায়াদুষ্ট যত দুঃখী, জগতে সবাই সুখী,
বৈষ্ণবের ইচ্ছা পূর্ণ হয় ॥
সে কার্য যে করিবারে, আজ্ঞা যদি দিলে মোরে,
যোগ্য নহি অতি দীন হীন ।
তাই সে তোমার কৃপা, জাগিতেছে অনুরূপা,
আজি তুমি সবার প্রবীণ ॥
তোমার সে শক্তি পেলে, গুরু-সেবা বস্তু মিলে,
জীবন সার্থক যদি হয় ।

সেই সে সেবা পেলে, তাহলে সুখী হলে,
তব সঙ্গ ভাগ্যেতে মিলয় ॥

এবং জনং নিপতিতং প্রভবাহিকূপে ।
কামাভিকামমনু যঃ প্রপতন প্রসাঙ্গাৎ ॥
কৃত্বাত্মসাৎ সুরর্ষিণা ভগবান গৃহীতঃ ।
সোঽহং কথং নু বিসৃজে তব ভৃত্যসেবাং ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৭/৯/২৮)

তুমি মোর চিরসাথী, ভুলিয়া মায়ার লাথি,
খাইয়াছি জন্ম-জন্মান্তরে ।
আজি পুনঃ এ সুযোগ, যদি হয় যোগাযোগ,
তবে পারি তুহে মিলিবারে ॥
তোমার মিলনে ভাই, আবার সে সুখ পাই,
গোচারণে ঘুরি দিন ভোর ।
কত বনে ছুটাছুটি, বনে খাই লুটাপুটি,
সেই দিন কবে হবে মোর ॥
আজি সে সুবিধানে, তোমার স্মরণ ভেল,
বড় আশা ডাকিলাম তাই ।
আমি তব নিত্য দাস, তাই মোর এত আশ,
তুমি বিনা অন্য গতি নাই ॥

(২)

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন ।
বিষয়ী দুর্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ ॥ ১ ॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি ।

তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে ।
না জানি ভকতি, কর্মে জড়মতি,
পড়েছি সংসার-ঘোরে ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া ।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান ।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার ।
দুর্জনে তারিতে, তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার ।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, আমি কি দোষে দোষী ।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি' ॥ ৮ ॥

(৩)

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার জ্বালা ।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা ॥ ১ ॥

গোপীনাথ, আমি ত' কামের দাস ।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম ফাঁস ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি ।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফুরিবে তুমি ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন ।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন-ধন ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান ।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, এই কি বিচার তব ।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ-জনে,
না কর' করুণা-লব ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, আমি ত' মূরখ অতি ।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, তুমি ত' পণ্ডিতবর ।
মূঢ়ের মঙ্গল, তুমি অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব' পর ॥ ৮ ॥

(৪)

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই ।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই ॥ ১ ॥

গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে ।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥ ২ ॥
গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর ।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ঘোর ॥ ৩ ॥
গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি ।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥ ৪ ॥
গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি ।
প্রবল ইন্দ্রিয়, বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥ ৫ ॥
গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর ।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর ॥ ৬ ॥
গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে ।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তার' হে সংসৃতি-ঘোরে ॥ ৭ ॥
গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস ।
কৃপা-অসি ধরি' বন্ধন ছেদিয়া,
বিনোদে করহ দাস ॥ ৮ ॥

(৫)

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।

এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায় ॥ ১ ॥
আশা-পাশ-শত-শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি ঊর্ম্মির তাহে খেলা ।
কাম ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা ॥ ২ ॥
জ্ঞান-কর্ম—ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে ।
এহেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে ॥ ৩ ॥
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্ম ধূলি করি',
দেহ ভক্তিবিনোদ আশ্রয় ।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥ ৪ ॥

(৬)

হরি হরি। বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেনে তায় ।
সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই ।

দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তা'র সাক্ষী জগাই-মাধাই ॥
হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥

(৭)

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব,
জুড়াইব তাপিত-পরাণ ।
সাজাইয়া দিবা হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া,
নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান ॥
হে সজনি! কবে মোর হইবে সুদিন ।
সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে,
সুখময় যমুনাপুলিন ॥
ললিতা-বিশাখা লঞা, তাঁহারে ভেটিব গিয়া,
সাজাইয়া নানা উপহার ।
সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি,
হেন ভাগ্য হইবে আমার ॥
দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট,
তিলমাত্র না রাখিল তার ।
কহে নরোত্তমদাস, কি মোর জীবনে আশ,
ছাড়ি' গেল ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

(৮)

এইবার পাইলে দেখা চরণ দু'খানি ।
হিয়ার মাঝারে রাখি' জুড়াব পরাণী ॥
তাঁরে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ ।
অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ ॥
মুখের মুছাব ঘাম, খাওয়াব পান গুয়া ।
ঘামেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া ॥
বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার ।
বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার ॥
কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ ।
নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ ॥

(৯)

কবে গৌরবনে, সুরধুনী তটে,
হা রাধে, হা কৃষ্ণ ব'লে ।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ সুখ ছাড়ি',
নানা লতা তরুতলে ॥ ১ ॥
(কবে) শ্বপচ গৃহেতে মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী-জল ।
পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ কোলাহল ॥ ২ ॥
(কবে) ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ ।
বৈষ্ণবচরণ- রেণু গায় মাখি'
ধরি' অবধূত বেশ ॥ ৩ ॥

(কবে) গৌড়ব্রজবনে, ভেদ না দেখিব,
হইব বরজ-বাসী ।
(তখন) ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥ ৪ ॥

(১০)

কবে হ'বে বল সে-দিন আমার ।
(আমার) অপরাধ ঘুচি', শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হ'বে হৃদয়ে সঞ্চার ॥ ১ ॥
তৃণাধিক হীন, কবে নিজে মানি',
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি' ।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হ'য়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ॥ ২ ॥
ধন জন আর কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ সুখকরী ।
জন্মে-জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি !
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ॥ ৩ ॥
(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ-নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদ্‌গদ্ বচন ।
বৈবর্ণ্য-বেপথু হ'বে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥ ৪ ॥
কবে নবদ্বীপে সুরধুনী-তটে,
গৌর-নিত্যানন্দ বলি' নিষ্কপটে ।
নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥ ৫ ॥

কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া ।
দিয়া মোরে নিজ-চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥ ৬ ॥
কিনিব, লুটিব হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ ।
রসের রসিক-চরণ পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার ॥ ৭ ॥
কবে জীবে দয়া হইবে উদয়,
নিজ-সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয় ।
ভকতিবিনোদ করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ॥ ৮ ॥

(১১)

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার ।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল ।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি ।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী ॥
ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায় ।
সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায় ॥
অদোষ-দরশি প্রভু, পতিত উদ্ধার ।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥

(১২)

প্রভু তব পদযুগে মোর নিবেদন ।
নাহি মাগি দেহ সুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥ ১ ॥
নাহি মাগি স্বর্গ আর মোক্ষ নাহি মাগি ।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥ ২ ॥
নিজকর্ম-গুণ দোষে যে যে জন্ম পাই ।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥ ৩ ॥
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে ।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥ ৪ ॥
বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার ।
সেইমত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥ ৫ ॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে ।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ॥ ৬ ॥
পশু-পক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে ।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ হৃদয়ে ॥ ৭ ॥

(১৩)

হরি ব'লব আর মদনমোহন হেরিব গো ।
এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো ॥
যা'ব গো ব্রজেন্দ্রপুর, হ'ব গোপী-পায়ের নূপুর,
নূপুর হ'য়ে রুনুঝুনু বাজিব গো ॥
রাধাকৃষ্ণের রূপমাধুরী দেখিব দু'নয়ন ভরি',
নিকুঞ্জের দ্বারের দ্বারী রহিব গো ॥
বিপিনে বিনোদ খেলা, সঙ্গেতে রাখালের মেলা,
তাঁদের চরণের ধূলা মাখিব গো ॥

ব্রজবাসী তোমরা সবে, এ অভিলাষ পুরাও এবে,
আর কবে কৃষ্ণের বাঁশী শুনিব গো ॥
এ দেহ অন্তিমকালে, রাখব শ্রীযমুনার জলে,
জয় রাধে গোবিন্দ ব'লে ভাসিব গো ॥
কহে নরোত্তমদাস, না পুরিল অভিলাষ,
আর কবে ব্রজে বাস করিব গো ॥

(১৪)

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ ॥
বহু যোনি ভ্রমি' নাথ লইনু শরণ ।
নিজগুণে কৃপা কর অধমতারণ ॥
জগত-কারণ তুমি জগত-জীবন ।
তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ ॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি ।
তুমি উপেখিলে নাথ, কি হইবে গতি ॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত-মাঝারে ।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে ॥

(১৫)

হে নাথ, নারায়ণ, হরি,
জয় গোপাল, কৃষ্ণ, মুরারি ।
জয় যাদব, মাধব, মুকুন্দ,
কৃষ্ণ, কেশব, গোবিন্দ,
বাসুদেব, গিরিধারী ॥

সত্য সনাতন প্রভু,
হে নিত্য নিরঞ্জন বিভু।
দীনবন্ধু দুঃখহারী,
হে নাথ, নারায়ণ হরি ॥

উপদেশ

(১)

দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু,—দুঃখ কহিব কাহারে? ১ ॥
'সংসার' 'সংসার', ক'রে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু, ঘটিল জঞ্জাল ॥ ২ ॥
কিসের সংসার এই ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি' বৃথা দিন যায় ॥ ৩ ॥
এ দেহ পতন হ'লে কি র'বে আমার ?
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র-পরিবার ॥ ৪ ॥
গর্দভের মতো আমি করি পরিশ্রম।
কা'র লাগি' এত করি, না ঘুচিল ভ্রম ॥ ৫ ॥
দিন যায় মিছা কাজে, নিশা নিদ্রা-বশে।
নাহি ভাবি—মরণ নিকটে আছে ব'সে ॥ ৬ ॥
ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন।
নাহি ভাবি, এ দেহ ছাড়িব কোন্ দিন ॥ ৭ ॥
দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত ॥ ৮ ॥
হায়, হায়। নাহি ভাবি,—অনিত্য এ সব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব? ৯ ॥

শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে ।
বিহঙ্গ-পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ॥ ১০ ॥
কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে ।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে ॥ ১১ ॥
যে দেহের এই গতি, তা'র অনুগত ।
সংসার-বৈভব আর বন্ধুজন যত ॥ ১২ ॥
অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান ।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥ ১৩ ॥

(২)

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে ।
দুর্লভ মানব- জনম সৎসঙ্গে,
তরহ এ ভবসিন্ধু রে ॥
শীত আতপ, বাত বরিষণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে ।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ লব লাগি' রে ॥
এ ধন যৌবন, পুত্র-পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে ।
কমলদলজল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে ॥
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন, দাস্য রে ।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দদাস-অভিলাষ রে ॥

(৩)

ভজ ভজ হরি, মন দৃঢ় করি,
মুখে বোল তার নাম ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন, গোপীপ্রাণধন,
ভুবনমোহন শ্যাম ॥
কখন মরিবে, কেমন তরিবে,
বিষয় শমন ডাকে ।
যাহার প্রতাপে, ভুবন কাঁপয়ে,
না জানি মর বিপাকে ॥
কুলধন পাইয়া, উনমত হৈয়া,
আপনাকে জান বড় ।
শমনের দূতে, ধরি পায়ে হাতে,
বান্ধিয়া করিবে জড় ॥
কিবা যতি সতী, কিবা নীচ জাতি,
যেই হরি নাহি ভজে ।
ভবে জনমিয়া, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
রৌরব নরকে মজে ॥
দাস লোচন, ভাবে অনুক্ষণ,
মিছাই জনম গেল ।
হরি না ভজিলুঁ, বিষয়ে মজিলুঁ,
হৃদয়ে রহল শেল ॥

(৪)

এ ঘোর-সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ ।

সাধু-সঙ্গ করি হরি ভজে যদি
তবে হয় অন্ত ক্লেশ ॥
সংসার-অনলে জ্বলিছে হৃদয়
অনলে বাড়য়ে অনল ।
অপরাধ ছাড়ি' কৃষ্ণনাম লয়
অনলে পড়য়ে জল ॥
নিতাই চৈতন্য চরণ-কমলে
আশ্রয় লইল যেই ।
কালীদাস বলে জীবনে মরণে
আমার আশ্রয় সেই ॥

(৫)

এ মন! কি লাগি আইলি ভবে ।
এমন জনমে, হরি না ভজিলি,
সে তুই মানুষ কবে ॥
মানুষ-আকার, হইলে কি হয়,
করহ ভূতের কাম ।
নহিলে বদনে, কেন না বলহ,
'শ্রীকৃষ্ণ'-'গোবিন্দ' নাম ॥
পাখীরে যে নাম, লওয়াইলে লয়,
শারী শুক আদি কত ।
তুমি যে ইহাতে, আলস্য করহ,
এ হয় কেমন মত ॥
দিবস-রজনী, আবোল-তাবোল,
পচাল পাড়িতে পার ।

তাহার ভিতরে, কখন কেন কি,
'গোবিন্দ' বলিতে নার ॥
ভজিব বলিয়ে, কহিয়া আইলি,
ভুলিলি কি সুখ পাইয়ে।
বুঝিনু আবার, শমন-নগরে,
নরকে মজিবি যাইয়ে ॥
বদন ভরিয়া, 'হরি' বল যদি,
ক্ষতি না হইবে তায়।
কহে প্রেমানন্দ, তবে যে নিতান্ত,
এড়াবে কৃতান্ত-দায় ॥

(৬)

এ মন! 'হরিনাম' কর সার।
এ ভব-সাগর, হবে বালি-চর,
হাঁটিয়া হইবি পার ॥
ধরম করম, এ জপ এ তপ,
জ্ঞান-যোগ-যাগ-ধ্যান।
নহি নহি নহি, কলিতে কেবল,
উপায় 'গোবিন্দ' নাম ॥
ভুকতি-মুকতি, যে গতি সে গতি,
তাহে না করিহ রতি।
মেঘের ছায়ায়, জুড়ায় যেমন,
কহ না সে কোন গতি ॥
বদন ভরিয়া, 'হরি হরি' বল,
এমন সুলভ কবে।

ভারত-ভূমেতে, মানুষ-জনম,
আর কি এমন হবে ॥
যতেক পুরাণ- প্রমাণ দেখ না,
নামের সমান নাই ।
নামে রতি হৈলে, প্রেমের উদয়,
প্রেমেতে হরিকে পাই ॥
শ্রবণ কীর্তন, কর অনুক্ষণ,
অসত পচাল ছাড়ি ।
কহে প্রেমানন্দ মানুষ-জনম,
সফল কর না ভাড়ি ॥

(৭)

ওরে মন, ভাল নাহি লাগে এ সংসার ।
জনম-মরণ-জরা, যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল' সার ॥ ১ ॥
ধন-জন-পরিবার, কেহ নহে কভু কা'র,
কালে মিত্র, অকালে অপর ।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর ॥ ২ ॥
আয়ু অতি অল্পদিন, ক্রমে তাহা হয় ক্ষীণ,
শমনের নিকট দর্শন ।
রোগ-শোক অনিবার, চিত্ত করে' ছারখার,
বান্ধব-বিয়োগ দুর্ঘটন ॥ ৩ ॥
ভাল ক'রে দেখ ভাই, অমিশ্র আনন্দ নাই,
যে আছে, সে দুঃখের কারণ ।

সে সুখের তরে তবে, কেন মায়া-দাস হ'বে,
হারাইবে পরমার্থ-ধন ॥ ৪ ॥
ইতিহাস-আলোচনে, ভেবে দেখ নিজ মনে,
কত আসুরিক দুরাশয় ।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার, করি' কত দুরাচার,
শেষে লভে মরণে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥
মরণ-সময় তা'রা, উপায় হইয়া হারা,
অনুতাপ-অনলে জ্বলিল ।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায়, জীবন কাটায় হায়,
পরমার্থ কভু না চিন্তিল ॥ ৬ ॥
এমন বিষয়ে মন, কেন থাক অচেতন,
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা ।
শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়, কর' সবে ভব জয়,
এ দাসের সেই ত' ভরসা ॥ ৭ ॥

(৮)

জনম সফল তা'র কৃষ্ণ দরশন যা'র,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার ।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ-দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥ ১ ॥
বৃন্দাবন-কেলিচতুর বনমালী ।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময়নিধি, গুণশালী ॥ ২ ॥
বর্ণ নবজলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায় ।

পরিধান পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগত মাতায় ।। ৩ ।।
ইন্দ্রনীল জিনি', কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমূলে ।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে ।। ৪ ।।
(সখি হে) সুধাময়, সে রূপমাধুরী ।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময় বারি ।। ৫ ।।
কিবা চূড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ-ঠাম ।
চরণকমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুরদাম ।। ৬ ।।
সদা আশা করি, ভৃঙ্গরূপ ধরি',
চরণকমলে স্থান ।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ।। ৭ ।।

(৯)

ধর্মপথে থাকি' কর জীবন যাপন, ভাই ।
হরিনাম কর সদা (ওরে ও ভাই) হরি বিনা বন্ধু নাই ।। ১ ।।
যে কোন ব্যবসা ধরি', জীবন নির্বাহ করি',
বল মুখে হরি হরি, এই মাত্র ভিক্ষা চাই ।। ২ ।।
গৌরাঙ্গচরণে মজ, অন্য অভিলাষ-ত্যজ,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ভজ, তবে বড় সুখ পাই ।। ৩ ।।

আমি চাঁদ-বাউলদাস, করি তব কৃপা আশ,
জানাইয়া অভিলাষ, নিত্যানন্দ-আজ্ঞা গাই ॥ ৪ ॥

(১০)

'বাউল বাউল' বলছে সবে, হচ্ছে বাউল কোন্ জনা ।
দাড়ি-চূড়া দেখিয়ে (ও ভাই) করছে জীবকে বঞ্চনা ॥ ১ ॥
দেহতত্ত্ব—জড়ের তত্ত্ব, তা'তে কি ছাড়ায় মায়ার গর্ত,
চিদানন্দ পরমার্থ, জানতে ত তায় পারবে না ॥ ২ ॥
যদি বাউল চাও রে হ'তে, তবে চল ধর্ম্মপথে,
যোষিৎসঙ্গ সর্ব্বমতে ছাড় রে মনের বাসনা ॥ ৩ ॥
বেশভূষা-রঙ্গ যত, ছাড়ি' নামে হও রে রত,
নিতাইচাঁদের অনুগত, হও ছাড়ি' সব দুর্ব্বাসনা ॥ ৪ ॥
মুখে 'হরেকৃষ্ণ' বল, ছাড়রে ভাই কথার ছল,
নাম বিনা ত' সুসম্বল, চাঁদ-বাউল আর দেখে না ॥ ৫ ॥

(১১)

ব্রজেন্দ্রনন্দন, ভজে যেই জন,
সফল জীবন তার ।
তাহার উপমা, বেদে নাহি সীমা,
ত্রিভুবনে নাহি আর ॥
এমন মাধব, না ভজে মানব,
কখন মরিয়া যাবে ।
সেই সে অধমে, প্রহারিবে যমে,
রৌরবে ক্রিমিতে খাবে ॥
তারপর আর, পাপী নাহি ছার,
সংসার জগত মাঝে ।

কোন কালে তার, গতি নাহি আর,
মিছাই ভ্রমিছে কাজে ॥
লোচন দাস, ভকতি আশ,
হরিগুণ কহি লেখি ।
হেন রসসার, মতি নাহি যার,
তার মুখ নাহি দেখি ॥

(১২)

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণচরণারবিন্দ ॥ ১ ॥
(জ্ঞান-কর্ম পরিহরি রে)
(ভজ) (ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত গুরু-নিত্যানন্দ ।
(গৌরকৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥ ২ ॥
(গৌরপ্রেমে স্মর, স্মর রে)
(স্মর) (শ্রীনিবাস হরিদাসে)
(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথদ্বন্দ্ব ।
(কৃষ্ণভজন যদি করবে রে)
(রূপ-সনাতনে স্মর)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট স্বরূপ-রামানন্দ ॥ ৩ ॥
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)

(স্বরূপ-রামানন্দে স্মর)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপূর, সেন শিবানন্দ ।
(অজস্র স্মর, স্মর রে)
(গোষ্ঠীসহ কর্ণপূরে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥ ৪ ॥
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)
(রূপানুগ সাধু স্মর)

(১৩)

ভাব না ভাব না, মন, তুমি অতি দুষ্ট ।
(বিষয়-বিষে আছ হে)
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদাদি-আবিষ্ট ॥ ১ ॥
(রিপুর বশে আছ হে)
অসদ্বার্তা-ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা-আকৃষ্ট ।
(অসৎকথা ভাল লাগে হে)
প্রতিষ্ঠাশা-কুটিনাটি-শঠতাদি-পিষ্ট ।
(সরল ত' হ'লে না হে)
ঘিরেছে তোমারে, ভাই, এ সব অরিষ্ট ॥ ২ ॥
(এ সব ত' শত্রু হে)
এ সব না ছেড়ে' কিসে পা'বে রাধাকৃষ্ণ ।
(যতনে ছাড়, ছাড় হে)
সাধুসঙ্গ বিনা আর কোথা তব ইষ্ট ।
(সাধুসঙ্গ কর, কর হে)
বৈষ্ণব-চরণে মজ, ঘুচিবে অনিষ্ট ॥ ৩ ॥
(একবার ভেবে' দেখ হে)

(১৪)

যার মুখে ভাই, হরিকথা নাই
তার কাছে তুমি যেও না।
যার মুখ দেখি ভুলে যাবে হরি
তার মুখপানে চেও না ॥
কদিন রহিবে ভবমাঝে আর
অবিলম্বে কর যাহা করিবার।
পরের কথায় কিবা আসে যায়?
মিছে দাগা তুমি পেও না ॥
কে তোমাকে কবে কি কথা কহিবে
সে কথা ভাবিলে আর কি চলিবে।
বিপদে সম্পদে রাখিবে যে পদে
তাঁর পদ কেন ভাব না ॥
(কেবল) হরিকথা কহ, হরিগুণ গাও
হরিনাম-রসে সদা মত্ত হও।
হরিনাম-গীতি গাও নিতি নিতি
অন্য কোন গীতি গেও না ॥

(১৫)

'হরি' বল, 'হরি' বল, 'হরি' বল ভাই রে।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ-নিতাই রে ॥ ১ ॥
(মোদের দুঃখ দেখে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে।
হরিনামে শুদ্ধ হ'লো জগাই-মাধাই রে ॥ ২ ॥
(বড় পাপী ছিল রে)

মিছে মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে ।

(আমি আমার ব'লে রে)

আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে ॥ ৩ ॥

(আশার শেষ নাই রে)

হরি ব'লে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে ।

(নিরাশ তো সুখ রে)

ভোগ মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে ॥ ৪ ॥

(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)

না চেয়েও নামের গুণে ও সব ফল পাই রে ।

(তুচ্ছ ফলে প্রয়াস ছেড়ে রে)

বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে ॥ ৫ ॥

(নামের বালাই ছেড়ে রে)

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নাম

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর ।
কৃষ্ণচন্দ্র কর কৃপা করুণাসাগর ॥
জয় জয় গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥
হরিনাম বিনে রে গোবিন্দনাম বিনে ।
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে ॥
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে ।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দে ॥
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু ।
মিছা-মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষসম হৈনু ॥

ফলরূপে পুত্র-কন্যা ডাল ভাঙ্গি' পড়ে ।
কালরূপে সংসারেতে পক্ষী বাসা করে ॥
যখন কৃষ্ণ জন্ম নিল দেবকী উদরে ।
মথুরাতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
বসুদেব রাখি' আইল নন্দের মন্দিরে ।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ দিনে দিনে বাড়ে ॥
শ্রীনন্দ রাখিল নাম 'নন্দের নন্দন' ।
যশোদা রাখিল নাম 'যাদু বাছাধন' ॥
উপানন্দ নাম রাখে 'সুন্দর গোপাল' ।
ব্রজবালক নাম রাখে 'ঠাকুর রাখাল' ॥
সুবল রাখিল নাম 'ঠাকুর কানাই' ।
শ্রীদাম রাখিল নাম 'রাখালরাজা-ভাই ॥
'ননীচোরা' নাম রাখে যতেক গোপিনী ।
'কালোসোনা' নাম রাখে রাধাবিনোদিনী ॥
চন্দ্রাবলী নাম রাখে 'মোহন-বংশীধারী' ।
কুব্জা রাখিল নাম 'পতিতপাবন হরি' ॥
'অনন্ত' রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া ।
'কৃষ্ণ' নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া ॥
কণ্বমুনি রাখে নাম 'দেব চক্রপাণি' ।
'বনমালী' নাম রাখে বনের হরিণী ॥
গজরাজ নাম রাখে 'শ্রীমধুসূদন' ।
অজামিল নামে রাখে 'দেব নারায়ণ' ॥
পুরন্দর নাম রাখে 'দেব শ্রীগোবিন্দ' ।
দ্রৌপদী রাখিল নাম 'দেব দীনবন্ধু' ॥
সুদামা রাখিল নাম 'দারিদ্র্যভঞ্জন' ।
ব্রজবাসী নাম রাখে 'ব্রজের জীবন' ॥

'দর্পহারী' নাম রাখে অর্জুন সুধীর ।
'পশুপতি' নাম রাখে গরুড় মহাবীর ॥
যুধিষ্ঠির নাম রাখে 'দেব যদুবর' ।
বিদুর রাখিল নাম 'কাঙ্গালের ঠাকুর' ॥
বাসুকী রাখিল নাম 'দেব সৃষ্টি-স্থিতি' ।
ধ্রুবলোকে নাম রাখে 'ধ্রুবের সারথী' ॥
নারদ রাখিল নাম 'ভক্তপ্রাণধন' ।
ভীষ্মদেব নাম রাখে 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ॥
সত্যভামা নাম রাখে 'সত্যের সারথী' ।
জাম্ববতী নাম রাখে 'দেব যোদ্ধাপতি' ॥
বিশ্বামিত্র নাম রাখে 'সংসারের সার' ।
অহল্যা রাখিল নাম 'পাষাণ-উদ্ধার' ॥
ভৃগুমুনি নাম রাখে 'জগতের হরি' ।
পঞ্চমুখে 'রাম'-নাম গান ত্রিপুরারি ॥
কুঞ্জকেশী নাম রাখে 'বলী সদাচারী' ।
প্রহ্লাদ রাখিল নাম 'নৃসিংহ মুরারি' ॥
দৈত্যারি দ্বারকানাথ দারিদ্রভঞ্জন ।
দয়াময় দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ ॥
স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি ।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি ॥
বাসুদেব-প্রদ্যুম্নাদি-চতুর্ব্যূহ-সহ ।
মহৈশ্বর্যপূর্ণ হ'য়ে বিহার করহ ॥
অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ নৃসিংহ বামন ।
মৎস্য-কূর্ম-বরাহাদি অবতারগণ ॥
ক্ষীরোদকশায়ী হরি গর্ভোদবিহারী ।
কারণসাগরে শক্তি মায়াতে সঞ্চারী ॥

বৃন্দাবনে কর লীলা ধরি গোপবেশ।
সে লীলার অন্ত প্রভু নাহি পায় 'শেষ' ॥
পূতনাবিনাশকারী শকটভঞ্জন।
তৃণাবর্ত-বক-কেশী-ধেনুক-মর্দন ॥
অঘারি গোবৎসহারী ব্রহ্মার মোহন।
গিরিগোবর্ধনধারী অর্জুনভঞ্জন ॥
কালীয়দমনকারী যমুনাবিহারী।
গোপীকুলবস্ত্রহারী শ্রীরাসবিহারী ॥
ইন্দ্রদর্পনাশকারী কুব্জামনোহারী।
চাণুর-কংসাদি-নাশী অক্রুরনিস্তারী ॥
নবীন-নীরদ-কান্তি শিশুগোপবেশ।
শিখিপুচ্ছবিভূষিত ব্রহ্ম-পরমেশ ॥
পীতাম্বর-বেণুধর শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
গোপগোপীপরিবৃত কমল-নয়ন ॥
বৃন্দাবন-বনচারী মদনমোহন।
মথুরামণ্ডলচারী শ্রীযদুনন্দন ॥
সত্যভামাপ্রাণপতি রুক্মিণীরমণ।
প্রদ্যুম্নজনক শিশুপাল্যাদি-দমন ॥
উদ্ধবের গতিদাতা দ্বারকার পতি।
ত্রিভুবনপরিত্রাতা অখিলের গতি ॥
শাল্ব-দন্তবক্র-নাশী মহিষীবিলাসী।
সাধুজন-ত্রাণকর্তা ভূভার-বিনাশী ॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ বিদুরের প্রভু।
ভীষ্মের উপাস্যদেব ভুবনের বিভু ॥
দেবের আরাধ্যদেব মুনিজনগতি।
যোগিধ্যেয়-পাদপদ্ম রাধিকার পতি ॥

রসময় রসিক নাগর অনুপম ।
নিকুঞ্জবিহারী হরি নবঘনশ্যাম ॥
শালগ্রাম দামোদর শ্রীপতি শ্রীধর ।
তারক-ব্রহ্ম সনাতন পরম ঈশ্বর ॥
কল্পতরু কমললোচন হৃষীকেশ ।
পতিতপাবন গুরু জ্ঞান-উপদেশ ॥
চিন্তামণি চতুর্ভুজ দেব চক্রপাণি ।
দীনবন্ধু দেবকীনন্দন যদুমণি ॥
অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা ।
নারদাদি ব্যাসদেব দিতে নারে সীমা ॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার ।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার ॥
শতভার-সুবর্ণ-গো-কোটি-কন্যাদান ।
তথাপি না হয় কৃষ্ণনামের সমান ॥
যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি ।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥
শুন শুন ওরে ভাই নাম-সংকীর্তন ।
যে নাম শ্রবণে হয় পাপ-বিমোচন ॥
কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে ।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥
কৃষ্ণনাম হরিনাম বড়ই মধুর ।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর ॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁরে ধ্যানে নাহি পায় ।
সে-হরি-বঞ্চিত হ'লে কি হবে উপায় ॥
হিরণ্যকশিপুর করি উদর বিদারণ ।
প্রহ্লাদে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ ॥

বলিরে ছলিতে প্রভু হইলা বামন ।
দ্রৌপদীর লজ্জা হরি কৈলা নিবারণ ॥
অষ্টোত্তরশত নাম যে করে পঠন ।
অনায়াসে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করে নন্দের নন্দন ।
মথুরায় কংসধ্বংস লঙ্কায় রাবণ ॥
বকাসুরবধ আদি কালীয়দমন ।
দ্বিজ হরিদাস কহে নাম-সংকীর্তন ॥

শ্রীশ্রীষড় গোস্বামীর অষ্টক

কৃষ্ণোৎকীর্তন-গান-নর্তন-পরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ১ ॥

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্তন ও নৃত্যগীত-পরায়ণ, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতের সমুদ্র-স্বরূপ ও বিদ্বান অবিদ্বান সকলেরই প্রিয় যাঁরা সকলের প্রিয় কার্য করেন, যাঁরা মাৎসর্যলেশ-শূন্য, সর্বলোক-পূজ্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র এবং যাঁরা ইহলোকে জীবোদ্ধার করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ২ ॥

যাঁরা বিবিধ শাস্ত্র-বিচারে পরম নিপুণ, সদ্ধর্মের স্থাপন-কর্তা, মানবগণের পরম মঙ্গলকারী, ত্রিভুবন-পূজ্য, আশ্রয়-দাতা ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের পদারবিন্দ ভজনানন্দে প্রমত্ত মধুকর সদৃশ, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দগানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৩ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ-বর্ণনে যাঁদের একান্ত আগ্রহ, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণগুণগানামৃত-সেচনে জীবের পাপ-তাপ শান্তি করেন, যাঁরা আনন্দ-জলধি-বর্ধনে সুনিপুণ ও যাঁরা মোক্ষপ্রাপ্তি থেকে রক্ষা করেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীনগণেশকৌ করুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৪ ॥

যাঁরা অসংখ্য মণ্ডলপতিদের সহবাস ঝটিতি তুচ্ছবৎ পরিত্যাগ করতঃ কৃপাপূর্বক দীনহীনগণের পতি হয়ে কৌপীন-কন্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং যাঁরা গোপীপ্রেম-রসামৃত-সিন্ধু-তরঙ্গে সদাই নিমগ্ন ছিলেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারসগণাকীর্ণে ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিটপ শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনে।

রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৫ ॥

কোকিল, হংস, সারস, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষীগণের মধুর কলধ্বনি-নিনাদিত ও বিবিধ-রত্ন-নিবদ্ধ-মূলবিশিষ্ট বৃক্ষরাজি সুশোভিত শ্রীবৃন্দাবনে যাঁরা দিবানিশি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করতেন, এবং যাঁরা হৃষ্টচিত্তে জীবের মনোবাসনা পূর্ণ করতেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

সংখ্যাপূর্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাতন্ত্যদীনৌ চ যৌ ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৬ ॥

যাঁরা সংখ্যাপূর্বক নাম জপ, কীর্তন ও প্রণাম করে সময় অতিবাহিত করতেন, যাঁরা আহার-বিহার-নিদ্রাদি জয় করেছিলেন, যাঁরা অত্যন্ত দীন-হীনের মতো বিচরণ করতেন এবং যাঁরা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের গুণ-মাধুর্য স্মরণ করে পরমানন্দে বিভোর হতেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা ।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৭ ॥

যাঁরা শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ত হয়ে অশেষবিধ দশা প্রাপ্ত হতেন—কখনও উন্মত্তের মতো বিচরণ করতেন, কখনও বা হরি-গুণ-গান করতেন, কখনও বা আনন্দের

বশে ভাবাভিভূত হতেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

হে রাধে ব্রজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসূনো কুতঃ
শ্রীগোবর্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দী-বন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥ ৮ ॥

"হে ব্রজদেবি রাধে! তুমি কোথায়? হে ললিতে! তুমি কোথায়? হে কৃষ্ণ! তুমি কোথায়? তোমরা কি শ্রীগোবর্ধনের কল্পতরুতলে, না কালিন্দী-কুলস্থ বনমধ্যে"—এইভাবে বলতে বলতে যাঁরা নিরতিশয় শোকাতুর হয়ে ব্রজভূমির সর্বত্র ব্যাকুলভাবে পরিভ্রমণ করতেন, আমি বার বার সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি।

শিক্ষাষ্টকম্

শ্লোক ১

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হোন।

শ্লোক ২

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-

স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি

দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

হে ভগবান! তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করেন। এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দ'-আদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের কালাদিনিয়ম (বিধি বা বিচার) করনি। হে প্রভু! এইভাবে কৃপা করে জীবের পক্ষে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তবুও আমার নামাপরাধরূপ দুর্দৈব এমনই প্রবল যে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মাতে দেয় না।

শ্লোক ৩

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

যিনি নিজেকে তৃণাপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর মতো সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য হয়ে অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সর্বদা হরিকীর্তনের অধিকারী।

শ্লোক ৪

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।

মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে

ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

হে জগদীশ! আমি ধন, জন বা সুন্দরী রমণী কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্মে-জন্মে তোমাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হোক।

শ্লোক ৫

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্য কিঙ্কর (দাস) হয়েও স্বকর্ম-বিপাকে বিষম ভব-সমুদ্রে পড়েছি। তুমি কৃপা করে আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত-ধূলিসদৃশ চিন্তা কর।

শ্লোক ৬

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ।

হে নাথ! তোমার নাম গ্রহণে কবে আমার নয়ন-যুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে? বাক্য-নিঃসরণের সময়ে বদনে গদগদ-স্বর নির্গত হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হবে?.

শ্লোক ৭

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥

হে গোবিন্দ! তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সমূহ 'যুগ'-বৎ বোধ হচ্ছে, চক্ষুদ্বয় মেঘের মতো অশ্রুবর্ষণ করছে এবং সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হচ্ছে।

শ্লোক ৮

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা ।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ।

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই করুন, তিনি আমার সঙ্গে যেরকম আচরণই করুন না কেন, তিনি সর্বদা আমারই প্রাণনাথ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

নিখিল-শ্রুতি-মৌলিরত্নমালা-
দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত ।
অয়ি। মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥ ১ ॥

হে হরিনাম। তুমি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ থেকে অভিন্ন বলে নিখিল উপনিষদ-রূপ রত্নমালার কিরণ দ্বারা তোমার শ্রীপাদপদ্মের নখরসমূহ নির্মঞ্ছিত হচ্ছে, অর্থাৎ সমস্ত বেদগণ তোমার পাদপদ্ম প্রান্তেরও মহিমা কীর্তন পূর্বক স্তব করছে এবং যোগী, ঋষি প্রভৃতি মুক্তপুরুষগণও তোমার উপাসনা করছেন; অতএব আমি সর্বতোভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি।

জয় নামধেয়! মুনিবৃন্দ গেয়!
জন-রঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে ।
ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং
নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি ॥ ২ ॥

হে কৃষ্ণনাম! মুনিগণ সর্বদা তোমাকে কীর্তন করছেন, তুমি নিখিল জনমণ্ডলীর চিত্ত বিনোদনার্থে পরম-অক্ষর-রূপ আকৃতি অর্থাৎ বিগ্রহ ধারণ করেছ এবং অবহেলাপূর্বকও যদি কেউ তোমাকে একবার মাত্র উচ্চারণ করে, তাহলে তুমি তার ভীষণ পাপরাশি ধ্বংস ক'রে থাক; অতএব হে নাম! তোমার জয় হোক।

যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্ত-বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্ ।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥ ৩ ॥

হে কৃষ্ণনাম-রূপ সূর্য! যদি কেউ কোনও সঙ্কেতে বা আভাসেও তোমাকে উচ্চারণ করে, তাহলে তুমি তার সংসারাসক্তি-রূপ অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত ক'রে থাক এবং তুমি তত্ত্বজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিকেও কৃষ্ণভক্তি বিষয়িণী জ্ঞান-দৃষ্টি প্রদান ক'রে থাক; অতএব হে নাম! এ জগতে এমন বিদ্বান্ কে আছেন যে তিনি তোমার মহিমা বর্ণন করতে সমর্থ হবেন?

যদ্ ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ ।
অপৈতি নাম! স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধ-কর্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥ ৪ ॥

অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার মতো নিষ্ঠা সহকারে অবিরাম ব্রহ্মচিন্তা করলেও ভোগ ব্যতিরেকে যে প্রারব্ধ কর্মের অর্থাৎ অনাদিকাল সঞ্চিত পাপ ও পুণ্যজনিত কর্মসমূহের ফলাফল বিনষ্ট হয় না, হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্পন্দন মাত্রেই অর্থাৎ মুখে তোমার উচ্চারণ করা মাত্রই সেই প্রারব্ধ কর্ম বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো
কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ ।
প্রণতকরুণাকৃষ্ণাবিত্যনেক-স্বরূপে
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্ধিতাং নামধেয় ॥ ৫ ॥

হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দসূনো! হে কমল-নয়ন! হে গোপীকান্ত! হে বৃন্দাবনেন্দ্র! হে প্রণতকরুণ! হে কৃষ্ণ!

ইত্যাদি অনেক স্বরূপে হে নাম। তুমি জীবের ভববন্ধ-মোচনের জন্য প্রকটিত থেকে অপার করুণা প্রদর্শন করছ; অতএব হে নাম। তোমাতে আমার অনুরাগ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হোক।

বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপ-দ্বয়ং
পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ নিহিতাপরাধানিবহঃ প্রাণীসমন্তাজ্জনে
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥ ৬ ॥

হে নাম। তোমার দুইটি স্বরূপ—(১) বাচ্য অর্থাৎ বিভু-চৈতন্যানন্দময় বিগ্রহ (মূর্তিমান শ্রীবিগ্রহ) ও (২) বাচক অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ প্রভৃতি বর্ণাত্মক বিগ্রহ (অক্ষরময় নাম-বিগ্রহ); তুমি এই দুইটি স্বরূপে বিরাজ করছ; পরন্তু আমি তোমার বিভু-চৈতন্যাত্মক বাচ্য-স্বরূপ থেকে কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি-নামাত্মক বাচক-স্বরূপকেই অধিকতর সদয় বিবেচনা করি, যেহেতু যদি কোন ব্যক্তি তোমার বিভু-চৈতন্যাত্মক বাচ্য-স্বরূপ অবলম্বন ক'রে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ আশ্রয় ক'রে তোমার উপাসনা করতে করতে অপরাধী হয়ে পড়েন এবং তখন যদি তিনি মুখে তোমার কৃষ্ণ-গোবিন্দাদি-নামোচ্চারণাত্মক বাচক-স্বরূপ অবলম্বন ক'রে অর্থাৎ অক্ষরময় 'নাম' আশ্রয় পূর্বক 'নাম' কীর্তন ক'রে উপাসনা করতে থাকেন, তাহলে হে নাম। তোমার প্রভাবে তিনি সব রকম অপরাধ থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দসাগরে নিমগ্ন হন।

সূদিতাশ্রিতজনার্তিরাশয়ে
রম্য-চিদ্ঘন-সুখ-স্বরূপিণে।
নাম! গোকুল-মহোৎসবায়তে
কৃষ্ণ পূর্ণ-বপুষে নমো নমঃ ॥ ৭

হে নাম! হে কৃষ্ণ-স্বরূপ! তুমি আশ্রিত জনগণের নামাপরাধ-জনিত দুর্গতি বিনাশ ক'রে থাক, তুমি পরম চিদানন্দ-ঘন-রূপ বিগ্রহে

বিরাজিত, তুমি গোকুলবাসিগণের সাক্ষাৎ আনন্দ-স্বরূপ এবং তুমি স্বীয় মহিমা ও মাধুর্যে পরিপূর্ণরূপে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছ; অতএব হে নাম! আমি তোমাকে বার বার নমস্কার করি।

নারদ-বীণোজ্জীবন। সুধোর্মি-নির্যাস-মাধুরীপুর।

ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥ ৮ ॥

হে কৃষ্ণনাম! তুমি দেবর্ষি নারদের বীণার জীবনস্বরূপ এবং তুমি অমৃতময় মাধুর্য-তরঙ্গে পরিপূর্ণ; তুমি কৃপাপূর্বক আমাকে তোমাতে অনুরক্ত ক'রে আমার জিহ্বায় অবিশ্রান্ত স্ফূর্তি লাভ কর অর্থাৎ আমাকে এই কৃপা কর যেন আমি মুখে সর্বদা তোমাকে উচ্চারণ করতে পারি।

শ্রীশ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠক্কুর কৃতঃ)

যদি তে হরি-পাদসরোজ-সুধা
রসপানপরং হৃদয়ং সততম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১ ॥

ধন-যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং
নহি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।
ত্যজ গ্রাম্যকথা-সকলং বিফলং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ২ ॥

রমণীজন-সঙ্গসুখঞ্চ সখে
চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্।
হরিনাম-সুধারস-মত্তমতি-
র্ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৩ ॥

জড়কাব্যরসো ন হি কাব্যরসঃ
কলিপাবন গৌররসো হি রসঃ ।
অলমন্যকথাদ্যনুশীলনয়া
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৪ ॥
বৃষভানু-সুতান্বিত-বামতনুং
যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্ ।
মুরলীকল-গীতবিনোদপরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৫ ॥
হরিকীর্তন-মধ্যগতং স্বজনৈঃ
পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভ-হরিম্ ।
নিজগৌড়-জনৈক-কৃপাজলধিং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৬ ॥
গিরিরাজসুতা-পরিবীতগৃহং
নবখণ্ডপতিং যতিচিত্তহরম্ ।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৭ ॥
কলিকুক্কুর-মুদগর-ভাবধরং
হরিনাম-মহৌষধ-দানপরম্ ।
পতিতার্ত-দয়ার্দ্র-সুমূর্তিধরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৮ ॥
রিপু-বান্ধব-ভেদবিহীন-দয়া
যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাব্জ-ততৌ ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ৯ ॥
ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-
দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ ।

নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১০ ॥
অবতারবরং পরিপূর্ণকলং
পরতত্ত্বমিহাত্মবিলাসময়ম্ ।
ব্রজধাম-রসাম্বুধি-গুপ্তরসং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১১ ॥
শ্রুতি-বর্ণ-ধনাদি ন যস্য কৃপা-
জননে বলবদ্‌জননেন বিনা ।
তমহৈতুক ভাবপথা হি সখে
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১২ ॥
অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং
কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম্ ।
অবিচিন্ত্যবলং শিব কল্পতরুং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৩ ॥
সুরভীন্দ্রতপঃপরিতুষ্টমনা
বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ ।
তমজস্রসুখং মুনিধৈর্যহরং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৪ ॥
অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-
মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্বমিদম্ ।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৫ ॥
হরিসেবকসেবন-ধর্মপরো
হরিনাম-রসামৃত-পানরতঃ ।
নতি-দৈন্য-দয়াপর-মানযুতো
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৬ ॥

বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে
বদ রাম জনার্দন কেশব হে ।
বৃষভানুসুতা-প্রিয়নাথ সদা
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৭ ॥
বদ যামুনতীর-বনাদ্রিপতে
বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে ।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৮ ॥
চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং
পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা ।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত-গাঙ্গতটং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ১৯ ॥
স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌর-গদাধরপক্ষচরঃ ।
শৃণু গৌর-গদাধর চারুকথাং
ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥ ২০ ॥

গঙ্গাস্তোত্রম্

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে ।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ ১ ॥

সুরেশ্বরী, ভগবতী, ত্রিভুবনতারিণী, তরলতরঙ্গযুক্তা, শঙ্কর-মৌলি-নিবাসিনী, বিমলা, দেবী গঙ্গা, তোমার পাদপদ্মে আমার সুমতি হোক।

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব
জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং
ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

ভাগীরথী সুখদায়িনী মা, তোমার জলের মহিমা নিগমে খ্যাত। আমি তোমার মহিমা জানি না; হে কৃপাময়ি, অজ্ঞ আমাকে ত্রাণ কর।

হরিপাদপদ্মতরঙ্গিনি গঙ্গে
হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং
কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীহরির পাদপদ্ম থেকে তরঙ্গাকারে নির্গতা এবং হিম, চন্দ্র ও মুক্তার মতো শুভ্রতরঙ্গযুক্তা গঙ্গে, আমার দুষ্কর্মের ভার দূর কর এবং কৃপাপূর্বক আমায় ভবসাগর থেকে উদ্ধার কর।

তব জলমমলং যেন নিপীতং
পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ
কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্ত ॥ ৪ ॥

তোমার অমল যে পান করেছে, সে সর্বশ্রেষ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হয়েছে। মা গঙ্গে, যে তোমার ভক্ত, তাকে যম নিশ্চয়ই দেখতে অসমর্থ (অর্থাৎ সে অমর)।

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবর কন্যে
পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥ ৫ ॥

হে পতিত-উদ্ধারিণী, জাহ্নবী, খণ্ডিত গিরিবরের দ্বারা মণ্ডিত তরঙ্গশালিনী, ভীষ্মজননী, জহ্নুকন্যা, পতিতনিবারিণী গঙ্গা, তুমি ত্রিভুবনে ধন্যা।

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে
প্রণমতি যস্ত্বাং ন পতিত লোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে
বিবুধবধূকৃততরলাপাঙ্গে ॥ ৬ ॥

পারাবারবিহারিণী, দেববধূগণ কর্তৃক চঞ্চল কটাক্ষ অবলোকিতা গঙ্গা, পৃথিবীতে কল্পলতার মতো ফলদা তোমাকে যে প্রণাম করে, সে ইহলোকে পতিত হয় না।

তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃস্নাতঃ
পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥ ৭ ॥

নরকনিবারিণী, কলুষবিনাশিনী, স্বমহিমায় অতি যশস্বিনী জাহ্নবী গঙ্গা, তোমার কৃপার প্রভাবে কেউ যদি তোমার স্রোতে স্নান করে, তবে সে পুনর্বার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না।

পরিলসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে
জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে
সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥ ৮ ॥

উজ্জ্বল অঙ্গবিশিষ্টা, পবিত্রতরঙ্গা, কৃপাকটাক্ষময়ী, ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা রাজিতচরণা, সুখদা, শুভদা, সেবকের আশ্রয়স্বরূপা জাহ্নবী, তুমি জয়যুক্তা হও, জয়যুক্তা হও।

রোগং শোকং পাপং তাপং
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং।

ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে
ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥

ভগবতী, তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, তাপ ও কুমতিকলাপ দূর কর। ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠা, বসুধার হারস্বরূপা তুমি নিশ্চয়ই সংসারে আমার একমাত্র গতি।

অলকানন্দে পরমানন্দে
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০ ॥

স্বর্গের আনন্দবিধায়িনী, পরমানন্দরূপিণী, কাতরজনের বন্দিতা তুমি আমার প্রতি করুণা কর। তোমার তটসমীপে যার বাস তার বৈকুণ্ঠেই নিবাস বলতে হবে।

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ
কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যূতৌ শ্বপচো দীনো
ন পুনর্দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥ ১১ ॥

এই জলে বরং কচ্ছপ বা মৎস্য, কিংবা এই তীরে ক্ষুদ্র টিকটিকি অথবা দুই ক্রোশ মধ্যে দীন কুকুরভোজী হয়েও থাকা ভাল, তবুও তোমার থেকে দূরে নৃপতিশ্রেষ্ঠ হওয়াও ভাল নয়।

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে
দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিমমলং নিত্যং পঠতি
নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২ ॥

হে ভুবনেশ্বরী, পুণ্যময়ী, ধন্যে দ্রবময়ী, মুনিবরকন্যা দেবী, যে মানুষ এই অমল গঙ্গাস্তব নিত্য পাঠ করে, সে অবশ্যই জয়যুক্ত হয়।

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিঃ
তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩ ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং
বাঞ্ছিতফলদং বিদিতমুদারং।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং
পঠতু বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥

যাদের হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি আছে তারা সর্বদা অনায়াসে মুক্ত হয়। সংসারের সারস্বরূপ, বাঞ্ছিত ফলপ্রদ, বিখ্যাত এবং উদার এই গঙ্গাস্তোত্রটি পরমানন্দে নিবদ্ধ, সুন্দর, মধুর ও মনোমুগ্ধকর পজ্ঝটিকাছন্দে মহাদেবের সেবক শঙ্করের দ্বারা রচিত হয়েছে, এবং যে ব্যক্তি বিষয়ভোগে নিমগ্ন, সে এটি পাঠ করুক।

পুরুষসূক্ত মন্ত্র

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥

(হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী) পুরুষ (দ্বিতীয় পুরুষাবতার, নারায়ণ) সহস্র (অনন্ত) মস্তক, সহস্র নয়ন ও সহস্র চরণ বিশিষ্ট, ইনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে ব্যাপ্ত ক'রে এবং দশাঙ্গুল (পুরুষ) অর্থাৎ জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রদেশমাত্র অন্তর্যামী পুরুষকে অতিক্রম করে বিরাজ করেন।

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥

অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড (বা বিশ্ব) সেই পুরুষেরই প্রকাশ। কিন্তু পুরুষ স্বয়ং অমৃতত্বের অধীশ্বর, যে অমৃতত্ব (নিত্যত্ব)

অন্নের দ্বারা বর্ধমান (অনিত্য) সত্তার অতীত এবং তদবসানেও বিদ্যমান।

এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥

এই পুরুষের মহিমা বা বিভূতি এতদূর যে সমগ্র ভূতজগৎ তাঁর বিভূতির এক-চতুর্থাংশ মাত্র (কিন্তু নশ্বর)। তাঁর বিভূতির অপর তিন-চতুর্থাংশ অমৃত বা নিত্য দিব্যধামে (মায়াতীত পরব্যোমে) অবস্থিত। অথচ এই পুরুষ স্বয়ং এই সমস্ত বিভূতি অপেক্ষাও মহান।

ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥

ঊর্ধ্বে অর্থাৎ পরব্যোমের ত্রিপাদবিভূতির (প্রকাশের) সঙ্গে সেই পুরুষ বৈকুণ্ঠে (ঊর্ধ্বে) নিত্য বিরাজমান। এই ভূতব্যোমে অর্থাৎ জড় বিশ্বে তাঁর পাদ-বিভূতি বারবার প্রকাশিত হয়। তিনি সাশন (অশন সহিত) অর্থাৎ নিত্য অমৃত-জগৎ এবং অনশন (অশন-রহিত) অর্থাৎ অনিত্য মর-জগৎ—এই উভয় জগৎ জুড়ে সর্বতোভাবে বিক্রম প্রকাশ করেছেন।

তস্মাদ্‌বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥

তাঁর (পুরুষ) থেকে বিরাট্‌রূপের (পুরুষের স্থূল-দেহরূপ বিশ্বরূপের) প্রকাশ। সহস্রশীর্ষা পুরুষ এই বিরাট্‌দেহের অধিষ্ঠাতা। এই প্রকাশিত বিশ্বরূপ অগ্রে ও পশ্চাতে ব্রহ্মাণ্ডকে অতিক্রম করেছেন, অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অগ্র-পশ্চাতে এই প্রকাশিত বিরাট্‌রূপের (বিশ্বরূপের) অতিরিক্ত আর কিছুই নেই।

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥

দেবতাগণ যে হরিরূপ (যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রীরূপ) পুরুষের দ্বারা যজ্ঞ বিস্তার (সম্পাদন) করেছিলেন, তাতে বসন্তঋতু আজ্য বা ঘৃত, গ্রীষ্ম ঋতু কাষ্ঠ বা সমিধ এবং শরৎ ঋতু হবিঃ বা হবনীয় দ্রব্য হয়েছিল।

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

সর্বাগ্রে জাত সেই যজ্ঞরূপী পুরুষকে যাজ্ঞিকগণ (প্রসারিত যজ্ঞীয়) কুশের উপর প্রোক্ষিত করেছেন। সেই যজ্ঞরূপী পুরুষের (যজ্ঞ-পুরুষের) দ্বারা অর্থাৎ সেই পুরুষ যজ্ঞরূপ হওয়াতে দেবগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞ করতে সমর্থ হয়েছেন।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং ।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৮ ॥

সেই পুরুষ সকলের যজনীয় দ্রব্যময় যজ্ঞস্বরূপ। সেই যজ্ঞরূপ পুরুষ থেকে (সর্বত্র) বর্ষণশীল আজ্য সমুৎপন্ন, অর্থাৎ সর্বত্র অবস্থিত ভোগ্যজাত তাঁর থেকে প্রাপ্ত। গ্রাম্য আরণ্য ও আন্তরীক্ষ (বায়ব্য) জীবসকল তিনি সৃষ্টি করেছেন।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে ।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৯ ॥

সর্বজনোপাস্য যজ্ঞরূপ পুরুষ থেকে ঋক্, সাম, যজু প্রভৃতি বেদসমূহ উৎপন্ন হয়েছে।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদতঃ ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥ ১০ ॥

তাঁর থেকে অশ্বসকল, উভয় দন্তপংক্তিবিশিষ্ট প্রাণী-সকল, গো সকল, অজা ও পক্ষি সকল সমুৎপন্ন হয়েছে।

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ ।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরু পাদা উচ্যেতে ॥ ১১ ॥

(তত্ত্বদর্শী যোগিরা) পুরুষের স্থূলরূপে (বিরাট্‌রূপে) যে মনোধারণা করলেন, তাতে পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কত প্রকারে (কি প্রকারে) কল্পনা করেছিলেন? অর্থাৎ পুরুষের বিরাট্‌রূপের কল্পনা কি রকম? ঐ পুরুষের মুখ ও বাহুদ্বয় কিভাবে কল্পিত হয়েছিল এবং উরুদ্বয় ও পদদ্বয়ই বা কিভাবে উক্ত হয়েছিল?

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২ ॥

(যোগিগণ) ব্রাহ্মণকে তাঁর মুখ এবং ক্ষত্রিয়কে বাহুরূপে কল্পনা করেছিলেন। যারা বৈশ্য, তারা তাঁর উরু এবং তাঁর পদদ্বয়কে শূদ্র বলে কল্পনা করেছিলেন।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্‌বায়ুরজায়ত ॥ ১৩ ॥

তাঁর মন থেকে চন্দ্র, চক্ষু থেকে সূর্য, মুখ থেকে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ থেকে বায়ু উৎপন্ন হল।

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥ ১৪ ॥

তাঁর নাভি থেকে অন্তরীক্ষ (ভুবর্লোক), মস্তক থেকে স্বর্গ (স্বর্গলোক) প্রকাশিত হল, পদদ্বয় থেকে ভূমি (ভূলোক) এবং শ্রোত্র অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে দিক্ সকল উৎপন্ন হল। এইভাবে তাঁরা সকল লোকের চতুর্দশ ভুবনের কল্পনা করেছিলেন।

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥

দেবগণ যে যজ্ঞ বিস্তার (অনুষ্ঠান) করে পুরুষকে রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা আবদ্ধ কোন পশুর মতো আবদ্ধ করেছিলেন, সেই যজ্ঞের সাতটি পরিধি (গায়ত্রী প্রভৃতি সাতটি ছন্দ) এবং একবিংশতি সমিধ ভাবিত হয়েছিল।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি
ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র
পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥

দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের যজন (উপাসনা) করেছিলেন। সেই সমস্ত অনুষ্ঠান (লোকের) প্রাথমিক (বা মুখ্য) ধর্ম। পুরুষের (নারায়ণের) মহিমা-স্বরূপ সেই সমস্ত দেবগণ যেখানে পূর্বতন সাধ্যগণ বিরাজ করেন, সেই স্বর্গে সমবেত আছেন (অর্থাৎ বাস করেন) অথবা সেই স্বর্গের সেবা করেন।

মধুরাষ্টকম্

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং ।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ১ ॥
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং ।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ২ ॥
বেণুর্মধুরো রেণুর্মধুরঃ
পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৩ ॥
গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং ।

রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৪ ॥
করণং মধুরং তরণং মধুরং
হরণং মধুরং রমণং মধুরং ।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৫ ॥
গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
যমুনা মধুরা বীচী মধুরা ।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৬ ॥
গোপী মধুরা লীলা মধুরা
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং ।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৭ ॥
গোপা মধুরা গাবো মধুরা
যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা ।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৮ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

(শ্রীমৎ সত্যব্রত মুনি)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্ ।
যশোদাভিয়োলূখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥ ১ ॥

যিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, যাঁর কর্ণযুগলে কুণ্ডল আন্দোলিত হচ্ছে, যিনি গোকুলে পরম শোভা বিকাশ করছেন এবং যিনি শিক্য অর্থাৎ শিকায় রাখা নবনীত (মাখন) অপহরণ করায় মা যশোদার ভয়ে উদূখলের উপর থেকে লম্ফ প্রদান করে অতিশয় বেগে ধাবমান হয়েছিলেন এবং মা যশোদাও যাঁর পশ্চাতে ধাবিত হয়ে পৃষ্ঠদেশ ধরে ফেলেছিলেন, সেই পরমেশ্বর শ্রীদামোদরকে প্রণাম করি।

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্ ।
মুহুঃশ্বাসকম্প ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥ ২ ॥

যিনি জননীর হস্তে যষ্ঠি দেখে রোদন করতে করতে দু'খানি পদ্মহস্ত দ্বারা বারবার নেত্রদ্বয় মার্জন করছেন, যিনি ভীতনয়ন হয়েছেন ও সেইজন্য মুহূর্মুহুঃ শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত কম্প-নিবন্ধন যাঁর কণ্ঠস্থ মুক্তাহার দোদুল্যমান হচ্ছে এবং যাঁর উদরে রজ্জুর বন্ধন রয়েছে, সেই ভক্তিবদ্ধ শ্রীদামোদরকে বন্দনা করি।

ইতিদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্ ।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥ ৩ ॥

যিনি এইরকম বাল্যলীলা দ্বারা সমস্ত গোকুলবাসীকে আনন্দ-সরোবরে নিমজ্জিত করেন এবং যিনি ভগবদৈশ্বর্য-জ্ঞান-পরায়ণ ভক্তসমূহে 'আমি ভক্ত কর্তৃক পরাজিত অর্থাৎ ভক্তের বশীভূত'— এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন, সেই ঈশ্বররূপী দামোদরকে আমি প্রেম-সহকারে শত শতবার বন্দনা করি।

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ ।

ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥ ৪ ॥

হে দেব! তুমি সবরকম বরদানে সমর্থ হলেও আমি তোমার কাছে মোক্ষ বা মোক্ষের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বা অন্য কোন বরণীয় বস্তু প্রার্থনা করি না, তবে আমি কেবল এই প্রার্থনা করি যে, এই বৃন্দাবনস্থ তোমার ঐ পূর্ববর্ণিত বালগোপালরূপ শ্রীবিগ্রহ আমার মানসপটে সর্বদা আবির্ভূত হোক। হে প্রভো! যদিও তুমি অন্তর্যামিরূপে সর্বদা হৃদয়ে অবস্থান করছ, তবুও তোমার ঐ শৈশব লীলাময় বালগোপাল মূর্তি সর্বদা সুন্দর-রূপে আমার হৃদয়ে প্রকটিত হোক।

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্তনীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্ব-রক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥ ৫ ॥

হে দেব! তোমার যে বদন-কমল অতীব শ্যামল, স্নিগ্ধ ও রক্তবর্ণ কেশসমূহে সমাবৃত এবং তোমার যে বদনকমলস্থ বিম্বফলসদৃশ রক্তবর্ণ অধর মা যশোদা বারবার চুম্বন করছেন, সেই বদনকমলের মধুরিমা আমি আর কি বর্ণন করব? আমার মনোমধ্যে সেই বদনকমল আবির্ভূত হোক। ঐশ্বর্যাদি অন্যবিধ লক্ষ লক্ষ লাভেও আমার কোনও প্রয়োজন নেই—আমি অন্য আর কিছুই চাই না।

নমো দেব দামোদরানন্তবিষ্ণো
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধিমগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহানেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥ ৬ ॥

হে দেব! হে দামোদর! হে অনন্ত! হে বিষ্ণো! আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে প্রভো! হে ঈশ্বর! আমি দুঃখপরাম্পরারূপ সমুদ্রে

নিমগ্ন হয়ে একেবারে মরণাপন্ন হয়েছি, তুমি কৃপাদৃষ্টিরূপ অমৃত দ্বারা আমার প্রাণ রক্ষা কর।

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহোমেঽস্তি দামোদরেহ ॥ ৭ ॥

হে দামোদর! তুমি যেরকম গো অর্থাৎ গাভী-বন্ধন-রজ্জুদ্বারা উদূখলে বদ্ধ হয়ে শাপগ্রস্ত নলকুবের ও মণিগ্রীব নামক কুবেরপুত্রদ্বয়কে মুক্ত করতঃ তাদের ভক্তিমান্ করেছ, আমাকেও সেইরকম প্রেমভক্তি প্রদান কর। এই প্রেমভক্তিতেই আমার আগ্রহ, মোক্ষের প্রতি আমার আগ্রহ নেই।

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥ ৮ ॥

হে দেব! তোমার তেজোময় উদরবন্ধন-রজ্জুতে এবং বিশ্বের আধার-স্বরূপ তোমার উদরে আমার প্রণাম থাকুক। তোমার প্রিয়তমা শ্রীরাধিকাকে আমি প্রণাম করি এবং অনন্তলীলাময় দেব তোমাকে নমস্কার করি।

(১)

জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে
জয়দেবের প্রাণধন হে

(২)

জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে
সীতানাথের প্রাণধন হে

(৩)

জয় রাধা-গোবিন্দ রাধা-গোবিন্দ রাধে

রূপ গোস্বামীর প্রাণধন হে

(৪)

জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে

সনাতনের প্রাণধন হে

(৫)

জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপীনাথ রাধে

মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে

(৬)

জয় রাধা-দামোদর রাধা-দামোদর রাধে

জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে

(৭)

জয় রাধা-রমণ রাধা-রমণ রাধে

গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে

(৮)

জয় রাধা-বিনোদ রাধা-বিনোদ রাধে

লোকনাথের প্রাণধন হে

(৯)

জয় রাধা-গোকুলানন্দ রাধা-গোকুলান্দ রাধে

বিশ্বনাথের প্রাণধন হে

(১০)

জয় রাধা-গিরিধারী রাধা-গিরিধারী রাধে

দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে

(১১)

জয় রাধা-শ্যামসুন্দর রাধা-শ্যামসুন্দর রাধে

শ্যামানন্দের প্রাণধন হে

(১২)

জয় রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধা-বঙ্কুবিহারী রাধে

হরিদাসের প্রাণধন হে

(১৩)

জয় রাধা-কান্ত রাধা-কান্ত রাধে

বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে

(১৪)

জয় গান্ধার্বিকা-গিরিধারী গান্ধার্বিকা-গিরিধারী রাধে

সরস্বতীর প্রাণধন হে

(১৫)

জয় রাধা-মাধব রাধা-মাধব রাধে

শ্রীল প্রভুপাদের প্রাণধন হে

শ্রীশ্রীদশাবতার-স্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃত-মীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১ ॥

হে কেশব! হে জগদীশ! হে হরে! প্রলয়কালে যখন বেদরাশি সমুদ্রজলে ভাসমান হতে লাগল, তখন আপনি মীনশরীর ধারণ ক'রে অক্লেশে নৌকার ন্যায় সেই বেদরাশি ধারণ ক'রে রেখেছিলেন। মীনশরীরধারী আপনার জয় হোক।

ক্ষিতিরিহ-বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধরণকিণচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃত-কূর্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ২ ॥

হে কেশব। আপনার অতি বিপুলতর পৃষ্ঠদেশে পৃথিবী ধারণ জনিত ব্রণচিহ্ন জাত হয়েছে। আপনি কূর্ম (কচ্ছপ) রূপ ধারণ করলে আপনার সেই পৃষ্ঠদেশে এই পৃথিবী অবস্থিতা ছিল। হে কূর্মশরীরধারী জগদীশ! হে হরে! আপনি জয়যুক্ত হোন।

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৩ ॥

হে কেশব! আপনি যখন শূকরমূর্তি ধারণ করেছিলেন, তখন চন্দ্রের কলঙ্ক-রেখার ন্যায় আপনার দন্তাগ্রে এই পৃথিবী সংলগ্না ছিল। হে শূকররূপী জগদীশ! হে হরে! আপনার জয় হোক।

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনু-ভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃত-নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৪ ॥

হে কেশব! যখন আপনি নৃসিংহরূপ ধারণ করেছিলেন, তখন আপনার করকমলের নখাবলী অতীব আশ্চর্যাবহ অগ্রভাগযুক্ত হয়েছিল। আপনি ঐ নখদ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর তনুভৃঙ্গটিকে বিদলিত করেছিলেন। হে নৃসিংহরূপী জগদীশ! হে হরে! আপনার জয় হোক।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন-
পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৫ ॥

হে জগদীশ! আপনার পদনখচ্যুত সলিলে নিখিল লোকের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। আপনি অদ্ভুত বামনরূপ ধারণ করে পদক্ষেপে

(ত্রিপাদভূমি প্রার্থনায়) বলিরাজাকে ছলনা করেছিলেন। হে বামনরূপী কেশব! হে হরে! আপনার জয় হোক।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিত-ভবতাপং ।
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৬ ॥

হে জগদীশ! আপনি পরশুরাম মূর্তি পরিগ্রহ করে ক্ষত্রিয়রুধিরময় সলিলে জগৎ আপ্লুত করতঃ জগতের পাপ হরণ করেছিলেন। হে ভৃগুপতিরূপী কেশব! হে হরে! আপনার জয় হোক।

বিতরসি দিক্ষুরণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্ ।
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৭ ॥

হে কেশব! আপনি রাম আকৃতি পরিগ্রহ করে রাবণের দশমুণ্ড ছেদনপূর্বক রমণীয় বলিস্বরূপ দিক্‌পতিগণকে উপহার প্রদান করেছিলেন। হে জগদীশ! হে হরে! রামশরীরধারী আপনার জয় হোক।

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্ ।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ৮ ॥

হে কেশব! আপনি হলধরমূর্তি ধারণ করে স্বীয় শুভ্র কলেবরে জলদ-শ্যামল বর্ণ বস্ত্র ধারণ করেছিলেন এবং তা আপনার হলাকর্ষণ-ভয়ে ভীতা যমুনার নীলকান্তিই প্রকাশ করেছিল। হে জগদীশ! হে হরে! হলধররূপী আপনি জয়যুক্ত হোন।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাত
সদয়-হৃদয়দর্শিত-পশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ৯ ॥

হে কেশব! হে জগদীশ! পশুবধদর্শনে আপনার সকরুণ হৃদয় আর্দ্রীভূত হলে আপনি হিংসার দোষ প্রদর্শনপূর্বক (পশুবধাত্মক) যজ্ঞবিধান-প্রবর্তক বেদের অপবাদ দিয়েছিলেন। হে হরে! বুদ্ধশরীরধারী আপনি জয়যুক্ত হোন।

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবাল
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥ ১০ ॥

হে কেশব। আপনি যুগাবসানে ম্লেচ্ছকুলের সংহারার্থ ধূমকেতুর ন্যায় আবির্ভূত হয়ে করকমলে ভীষণ-দর্শন অসি ধারণ করেন। হে জগদীশ! হে হরে! কল্কিশরীরধারী আপনি জয়যুক্ত হোন।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।
কেশব ধৃত-দশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥ ১১ ॥

কবি শ্রীজয়দেবের এই বর্ণনা পরম মহৎ, জগন্মঙ্গলপ্রদ, পরম সুখকর ও সংসারের সারভূত; হে জীবগণ। তোমরা তা শ্রবণ কর। হে কেশব! হে দশাবতারদেহধারী! হে জগদীশ! আপনি জয়যুক্ত হোন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-স্তব

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে ।
দারুব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম ॥
প্রফুল্ল-পুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত ।
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ-পুরন্দর ॥

নিজাধর-সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্ন-প্রসাদিত ।
সুভদ্রা-লালন-ব্যগ্র রামানুজ মমোঽস্তু তে ॥
গুণ্ডিচা-রথযাত্রাদি-মহোৎসব-বিবর্ধন ।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথ-মণ্ডনম্ ॥
দীনহীন-মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃত-মানস ।
নিত্য-নূতন-মাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিন-সঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মামরপতি-গণেশার্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ১ ॥

যিনি কখনও কখনও যমুনা-তীরস্থ বনমধ্যে সঙ্গীত করতে করতে ভ্রমরের মতো আনন্দে ব্রজগোপীদের মুখারবিন্দের মধু পান করেন এবং লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও গণেশ প্রমুখ দেবদেবীগণ যাঁর চরণ-যুগল অর্চনা করে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটীতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবন-বসতি লীলা-পরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ২ ॥

যিনি বাম হস্তে বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ, কটিতটে পীতাম্বর ও নয়ন-প্রান্তে সহচরগণের প্রতি কটাক্ষ ধারণ করে সর্বদা শ্রীবৃন্দাবনে বাস ও লীলা করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

মহাম্ভোধেস্তীরে কনক-রুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তঃ সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রা-মধ্যস্থঃ সকল-সুর-সেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৩ ॥

যিনি মহাসমুদ্রের তীরে কনকোজ্জ্বল-নীলাচল-শিখরে প্রাসাদাভ্যন্তরে বলিষ্ঠ সহোদর শ্রীবলদেব সহ সুভদ্রাকে মধ্যে স্থাপনপূর্বক অবস্থান করছেন এবং সমস্ত দেবগণকে যিনি স্বীয় সেবা করবার সুযোগ প্রদান করেছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরো
রমা-বাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহ-মুখঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৪ ॥

যিনি দয়ার সাগর, সজল জলধরের মতো যাঁর অঙ্গকান্তি, যিনি লক্ষ্মী-সরস্বতীর সঙ্গে বিহার করছেন, যাঁর বদনমণ্ডল অমল কমলের ন্যায় শোভা পাচ্ছে, যিনি সমস্ত দেবগণের আরাধ্য-ধন এবং বেদ, পুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রসমূহ যাঁর চরিত্র গান করছেন, সেই জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ
স্তুতি-প্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকল-জগতাং সিন্ধু-সদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৫ ॥

রথে আরোহণ করে গমন করতে থাকলে পথিমধ্যে ব্রাহ্মণগণ যাঁর স্তব করতে থাকেন এবং সেই স্তব শ্রবণ করে যিনি পদে পদে প্রসন্ন হন, যিনি দয়ার সাগর, যিনি নিখিল জগতের বন্ধু এবং যিনি সমুদ্রের প্রতি সদয় হয়ে তদুপকূলে বিরাজ করছেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিত-চরণোঽনন্ত-শিরসি ।
রসানন্দী রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৬ ॥

যিনি পরমার্চনীয় পরব্রহ্ম, যাঁর নেত্রযুগল নীল-কমলদলের ন্যায় উৎফুল্ল, যিনি নীলাচলে অবস্থান করছেন, যিনি অনন্তের শিরে পদার্পণ করে রয়েছেন, যিনি প্রেমানন্দময় এবং যিনি শ্রীরাধিকার রসময়-দেহালিঙ্গনসুখে সুখী, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকল-জন-কাম্যাং বরবধূম্ ।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীত-চরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৭ ॥

আমি রাজ্য চাই না, স্বর্ণ-মাণিক্যাদি বৈভব চাই না, সর্বজনের স্পৃহণীয় সুন্দরী নারীও চাই না, কেবল এই চাই যে, প্রমথনাথ মহাদেব সর্বক্ষণ যাঁর চরিত্র গান করেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে!
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ ৮ ॥

হে সুরপতে! অতি শীঘ্র আমাকে এ অসার সংসার থেকে উদ্ধার কর; হে যদুপতে! আমার দুঃসহ পাপভার বিমোচন কর। অহো! দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকে যিনি নিশ্চিতরূপে নিজ শ্রীচরণ সমর্পণ করে থাকেন, সেই প্রভু জগন্নাথদেব আমার নয়ন-পথের পথিক হোন।

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতং শুচিঃ ।
সর্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

যিনি সংযত ও শুদ্ধ-চিত্তে এই পরম পবিত্র জগন্নাথাষ্টক পাঠ করেন, তাঁর আত্মা সবরকম পাপ থেকে বিমুক্ত হয়ে থাকে এবং তিনি বিষ্ণুলোক অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করেন।

শ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসিত-নিরবধি-ভাব-বিদেহম্ ।
ত্রিভুবন-পাবন-কৃপায়াঃ লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ১ ॥

যাঁর উজ্জ্বল বরণ, গৌরবর্ণ সুন্দর দেহখানি নিরবধি অসীম ভাবসমূহে বিশেষরূপে উপচিত হয়ে শোভা পাচ্ছে, যাঁর কৃপা ত্রিলোক পবিত্র করে, সেই (কলিযুগ-পাবনাবতারী রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু ভগবান) শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

গদ-গদ-অন্তর-ভাববিকারং
দুর্জন-তর্জন-নাদ-বিলাসম্ ।
ভব-ভয়-ভঞ্জন-কারণ-করুণং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ২ ॥

যাঁর বাক্য গদগদ, অন্তর ভাববিকারে দ্রবীভূত, যাঁর হুঙ্কারে (সিংহনাদে) দুর্জনগণ ভীত হয়, যাঁর করুণা সংসারভীতি খণ্ডন করে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

অরুণাম্বর-ধর-চারু-কপোলং
ইন্দু-বিনিন্দিত-নখচয়-রুচিরম্ ।

জল্পিত-নিজগণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৩ ॥

যাঁর পরিধানে অরুণবসন, যাঁর সুন্দর গণ্ডদেশ ও নখকান্তি চন্দ্রকে নিন্দা করে, যিনি নিজের (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) নাম, গুণ ও লীলা কীর্তন করেন অথবা নিজ নাম গুণকীর্তনে উল্লসিত হন, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

বিগলিত-নয়ন-কমল-জলধারং
ভূষণ-নবরস-ভাববিকারম্ ।
গতি-অতি-মন্থর-নৃত্য-বিলাসং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৪ ॥

যাঁর নয়নপদ্ম থেকে জলধারা বিগলিত হচ্ছে, নব নব অপ্রাকৃত রসাস্বাদজনিত ভাববিকারসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর গমন অতি ধীর, যাঁর নৃত্য বিচিত্র, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

চঞ্চল-চারু-চরণ-গতি-রুচিরং
মঞ্জীর-রঞ্জিত পদযুগ-মধুরম্ ।
চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৫ ॥

যাঁর চঞ্চলপদের গমনভঙ্গি মনোহর, (মঞ্জীর) নূপুর যাঁর পদদ্বয়ের (মাধুর্য) শোভা সম্পাদন করছে, যাঁর বদন চন্দ্র অপেক্ষা শীতল, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

ধৃত-কটি-ডোর-কমণ্ডলু দণ্ডং
দিব্য-কলেবর মুণ্ডিত-মুণ্ডং ।
দুর্জন কল্মষ-খণ্ডন-দণ্ডং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৬ ॥

কটিদেশে ডোর (কৌপিন-বর্হির্বাস), হস্তে দণ্ড, কমণ্ডলু প্রভৃতি ভূষণে বিভূষিত যাঁর দিব্য কলেবর, মস্তক মুণ্ডিত, যাঁর দণ্ড (ধারণ) দুর্জনগণের পাপ খণ্ডনের জন্য, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

ভূষণ ভূরজ-অলকাবলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরম্ ।
মলয়জ-বিরচিত-উজ্জ্বল-তিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৭ ॥

ধরণীর ধূলি নির্মিত অলকাসমূহ যাঁর ভূষণ, যাঁর বিম্বফলের মতো অধর কম্পিত হচ্ছে, যাঁর ললাটে উজ্জ্বল মলয়জ-চন্দনের তিলক শোভা পাচ্ছে, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-লোচনং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলম্ ।
কলেবর কৈশোর নর্তকবেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥ ৮ ॥

যাঁর নেত্র-যুগল রক্তপদ্মের পত্রতুল্য, বাহুযুগল জানুদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত, কিশোর শরীর, নর্তকবেশ, সেই শ্রীশচীতনয়কে প্রণাম করি।

শ্রীশ্রীরাধিকা-স্তুতিঃ

রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে ।
গোকুলতরুণীমণ্ডলমহিতে ॥ ধ্রু ॥ ১ ॥
দামোদর-রতিবর্ধনবেশে ।
হরিনিষ্কুটবৃন্দাবিপিনেশে ॥ ২ ॥
বৃষভানুদধি নবশশিলেখে ।
ললিতাসখি গুণরমিতবিশাখে ॥ ৩ ॥

করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে ।
সনক-সনাতনবর্ণিতচরিতে ॥ ৪ ॥

হে রাধে, হে মাধবপ্রিয়ে, হে গোকুলতরুণী-মণ্ডল-পূজিতে, তোমার জয় হোক। হে দামোদররতিবর্ধন-বেশধারিণি, নন্দনন্দনের গৃহারামস্বরূপ বৃন্দাবনের অধীশ্বরি, তুমি বৃষভানুরাজরূপ বারিধির নবোদিত-চন্দ্রলেখাস্বরূপা, তুমি ললিতার প্রিয়সখী এবং সৌহার্দ্য, কারুণ্য, কৃষ্ণানুকূল্যাদি গুণে বিশাখাকেও বশীভূত করিয়াছ, কারুণ্যরসে তুমি সর্বদা পরিপূর্ণ, সনক-সনাতনও তোমার গুণবর্ণনা করেন, সম্প্রতি আমাকে করুণা কর।

শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্

কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাজ্ঞ-গর্বহারি-গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাজ্ঞগন্ধ-কীর্তি-নিন্দি-সৌরভা ।
বল্লবেশ-সূনু-সর্ব-বাঞ্ছিতার্থ-সাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ১ ॥

যাঁর অঙ্গের গৌরকান্তি কুঙ্কুমপরিব্যাপ্ত স্বর্ণপদ্মের গৌরকান্তির গর্ব নাশ করে, যাঁর শ্রীঅঙ্গসৌরভ কুঙ্কুমযুক্ত পদ্মগন্ধের কীর্তিকে নিন্দা করে এবং যিনি গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সর্বপ্রকার বাঞ্ছিত প্রয়োজন সাধন করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

কৌরবিন্দকান্তি-নিন্দি-চিত্রপট্ট-শাটিকা
কৃষ্ণ-মত্তভৃঙ্গকেলি-ফুল্লপুষ্প-বাটিকা ।
কৃষ্ণ-নিত্যসঙ্গমার্থ-পদ্মবন্ধু-রাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ২ ॥

যাঁর চিত্রযুক্ত পাটের শাড়ীর কান্তি প্রবালের কান্তিকেও নিন্দা করে, যিনি শ্রীকৃষ্ণরূপ মত্ত ভ্রমরের বিলাসের নিমিত্ত প্রফুল্ল পুষ্পবনস্বরূপা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য সঙ্গমের নিমিত্ত সূর্যের আরাধনা করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

সৌকুমার্য-সৃষ্ট-পল্লবালি-কীর্তি-নিগ্রহা
চন্দ্রচন্দনোৎপলেন্দু-সেব্য-শীত-বিগ্রহা।
স্বাভিমর্ষ-বল্লবীশ-কাম-তাপ-বাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৩ ॥

যাঁর সুকুমারতা (নব) পল্লবশ্রেণীর সুকুমারতার কীর্তিকেও অপমানিত করে, যিনি চন্দ্র (কর্পূর) সহ চন্দন, পদ্ম ও চন্দনের আরাধ্য শৈত্য-গুণের মূর্তবিগ্রহ এবং যিনি নিজাঙ্গ স্পর্শ দ্বারা গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের কামজনিত তাপ নাশ করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

বিশ্ববন্দ্য-যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপ-নব্য-যৌবনাদি-সম্পদা ন যৎসমা।
শীলহার্দ্দ-লীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৪ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিশ্বের বন্দনীয় যুবতীগণ দ্বারা পূজিতা হলেও রূপ, নব যৌবনাদি সম্পত্তি, সৎ-স্বভাব ও মনোজ্ঞ লীলা বিষয়ে যে শ্রীরাধিকার সমান নন, এবং যে শ্রীরাধিকা অপেক্ষা (জগতে) অধিক (গুণসম্পন্না) কেউ নেই, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

রাসলাস্য-গীত-নর্ম-সৎকলালিপণ্ডিতা
প্রেমরম্য-রূপবেশ-সদ্‌গুণালি-মণ্ডিতা।
বিশ্বনব্য-গোপযোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৫ ॥

যিনি রাসে নৃত্য, গীত ও ক্রীড়াদি সদ্বিদ্যাসমূহে পারদর্শিনী, যিনি রমণীয় রূপ, বেশ এবং সদ্‌গুণশ্রেণী দ্বারা শোভিতা এবং যিনি সর্বনবীন গোপরমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর পাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

নিত্য-নব্য-রূপ-কেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগবন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা।
কৃষ্ণরূপ-বেশ-কেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৬ ॥

যিনি নিত্য-নতুন রূপ, কেলি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ ভাব রূপ (অথবা নিজের প্রতি কৃষ্ণের ভাব রূপ) সম্পত্তি দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা গোপ-যুবতীগণের মধ্যে স্বপক্ষীয়গণের হর্ষজনিত ও বিপক্ষীয়গণের কাতরতা জন্য কম্প উৎপাদন করেন এবং যাঁর চিত্ত কৃষ্ণের রূপ, বেশ ও কেলিতে একাগ্রভাবে সমাহিত, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর পাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

স্বেদ-কম্প-কন্টকাশ্রু-গদ্‌গদাদি-সঞ্চিতা-
মর্ষ-হর্ষ-বামতাদি-ভাব-ভূষণাঞ্চিতা।
কৃষ্ণনেত্র-তোষিরত্ন-মণ্ডনালি-দাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৭ ॥

যিনি ঘর্ম, কম্প, পুলক, অশ্রু, গদ্‌গদ বাক্যাদি সাত্ত্বিক ভাববিশিষ্টা, যিনি ক্রোধ, হর্ষ, বাম্যাদি ভাবভূষায় শোভিতা এবং যিনি শ্রীকৃষ্ণ-নয়নানন্দদায়ক রত্নভূষণাদি ধারণ করেন, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

যা ক্ষণার্ধ-কৃষ্ণ-বিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেকদৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দ-মোদিতা।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥ ৮ ॥

যিনি ক্ষণার্ধকালও শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে তজ্জনিত বিপুলভাবে উদিত বহু দৈন্য-চাপল্যাদি ভাববৃন্দ দ্বারা মোদিতা হন এবং দূতী প্রেরণাদি রূপ শ্রীকৃষ্ণের বা নিজের চেষ্টা দ্বারা প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসঙ্গবশত যাঁর সমস্ত মনঃপীড়া বিনষ্ট হয়, সেই শ্রীরাধিকা আমাকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দাস্য দান করুন।

অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণ-বল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি দুর্লভাং।
কৃষ্ণসঙ্গ-নন্দিতাত্ম-দাস্য-সীধু-ভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্ ॥ ৯ ॥

পার্বতী প্রভৃতি নারীগণের পক্ষেও যাঁর দর্শন সুদুর্লভ, সেই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাকে যে ব্যক্তি উপরিউক্ত অষ্টক দ্বারা স্তব করেন, শ্রীরাধিকা সখীগণের সঙ্গে আনন্দিত হয়ে সেই ব্যক্তিকে শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ দ্বারা আনন্দিত নিজের দাস্যামৃত প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীনৃসিংহ-কবচম্

শ্রীনারদ উবাচ—

ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ। তাতেশ্বর। জগৎপতে!
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো!
যস্য প্রপঠনাদ্ বিদ্বান্ ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ। তপোধন।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্য-বিজয়াভিধম্ ॥ ২ ॥
যস্য প্রপঠনাদ্‌বাগ্মী ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস! পঠনাদ্ধারণাদ্ যতঃ ॥ ৩ ॥

লক্ষ্মীর্জগত্ত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদি-বিনিবারকম্ ।
যস্য প্রসাদাদ্দুর্ব্বাসাস্ত্রৈলোক্য-বিজয়ী মুনিঃ ।
পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ॥ ৫ ॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়স্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতুঃ চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্ ॥ ৭ ॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যু-মৃত্যুং নমাম্যহম্ ।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ ॥ ৮ ॥
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম ।
নরসিংহায় চ জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্ ॥ ৯ ॥
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাম্ ।
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূত-বিনাশনায় চ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বজ্বর-বিনাশায় দহ দহ পচ দ্বয়ম্ ।
রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্র স্বাহা পাতু মুখং মম ॥ ১১ ॥
তারাদি-রামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্গুদং মম ।
ক্লীং পায়াৎ পাণিযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ ।
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীং ক্রৌং ক্ষ্রৌং চ হুং ফট্ ॥ ১২ ॥
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্ ।
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীং কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ ।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্ ॥ ১৪ ॥
ক্ষ্রৌং নরসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু ॥ ১৫ ॥

ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্ ।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ১৬ ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ ।
সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ১৭ ॥
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ ।
হবনাদীন্ দশাংশেন কৃত্বা সাধক-সত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্বাণী বসেৎ ততঃ ॥ ১৯ ॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ ।
অপি বর্ষ-সহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্ যদি ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ২১ ॥
যোষিদ্ বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে ।
বিভৃয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ ॥ ২২ ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্য-বিজয়ী ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
ভূত-প্রেত-পিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে ।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্ ॥ ২৫ ॥
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি ।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রযান্তি চাতিদূরতঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্য-বিজয়ং নাম শ্রীশ্রীনৃসিংহকবচং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীসঙ্কটনাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তোত্রম্

(শ্রীপাদ-শঙ্করাচার্য-বিরচিতম্)

শ্রীমৎপয়োনিধিনিকেতনচক্রপাণে
ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্ত্তে।
যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১ ॥

হে ক্ষীরসমুদ্রনিবাসিন! হে শ্রীমৎ-চক্রপাণে হে নাগগণাগ্রগণ্য-অনন্তের ফণাস্থিত মনিসমূহে সুরঞ্জিত পুণ্যমূর্ত্তে! হে যোগীশ্বর! হে সনাতন! হে সকলের শরণ্য! হে সংসারসমুদ্র-পারের পোত (নৌকা)! হে লক্ষ্মীনৃসিংহ! তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর অর্থাৎ হস্তপ্রসারণদ্বারা আমাকে অনুগৃহীত কর।

ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-
সঙ্ঘট্টিতাঙ্ঘ্রিকমলামলকান্তিকান্ত।
লক্ষ্মীলসৎকুচসরোরুহরাজহংস
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ২ ॥

হে ইন্দ্র, মরুদ্গণ ও আদিত্যগণের কোটি কোটি কিরীট্ দ্বারা প্রণমিত-পাদপদ্ম! হে অমলকান্তিবিশিষ্ট! হে কমলার সরোজের রাজহংস! হে সলক্ষ্মীক শ্রীনৃসিংহদেব! তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে
আরোগভীকরমৃগপ্রসরার্দ্দিতস্য।
আর্ত্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৩ ॥

হে মুরারে! আমি সংসাররূপ ঘোর-গহন বনে পরিভ্রমণ করিতেছি। রোগরূপ ভীষণ হিংস্র জন্তুসকল আমাকে পীড়ন করিতেছে। আমি

মাৎসর্য্যরূপ গ্রীষ্মের পীড়নে পীড়িত হইয়া অতীব আর্ত্ত হইয়াছি। হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহদেব! তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং
সংপ্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৪ ॥

হে দেব! আমি অতি ঘোর অতলস্পর্শ ভবকূপে নিমগ্ন হইয়া শত শত দুঃখরূপ সর্পসমূহে সমাকুল হইয়াছি। হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! দীন এবং নিতান্ত ক্লেশকর অবস্থায় পতিত আমাকে তুমি স্বীয় করাবলম্বন প্রদান কর।

সংসারসাগরবিশালকরালকাল-
নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্য।
ব্যগ্রস্য রাগরসনোর্ম্মিনিপীড়িতস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৫ ॥

হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! সংসার-সাগরে বিশাল করাল কালরূপ কুম্ভীর মুখব্যাদন করিয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে, আমি নিয়ত নানাক্লেশে অভিভূত হইয়াছি এবং রাগরসনা অর্থাৎ লোভরূপ তরঙ্গে পতিত হইয়া নিপীড়িত হইতেছি, তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

সংসারবৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্ম
শাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।
আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৬ ॥

হে দয়ালু শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! পাপসমূহ যাহার বীজ, অনন্ত কর্ম যাহার শত শত শাখা, ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার পত্র এবং মদন যাহার পুষ্প ও দুঃখ যাহার ফল, আমি সেই সংসার-বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এখন পতিত হইতেছি। হস্তাবলম্বন প্রদান পূর্বক তুমি আমাকে রক্ষা কর।

সংসারসর্পঘনবক্ত্রভয়োগ্রতীব্র-
দংষ্ট্রাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমূর্ত্তেঃ ।
নাগারিবাহন সুধাব্ধিনিবাস শৌরে
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৭ ॥

হে গরুড়বাহন! হে সুধাসমুদ্রনিবাসিন! হে শৌরে। সংসাররূপ সর্প মুখব্যাদন করিয়া আমাকে দংশন করিয়াছে। তাহার করাল দন্তের উগ্রতর বিষে আমার সর্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়ায় আমি বিনষ্ট হইতেছি। আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

সংসারদাবদহনাতুরভীরোরুরু
জ্বালাবলীভিরতিদগ্ধতনরুহস্য ।
ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৮ ॥

হে শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ। আমি সংসাররূপ দাবানলের দহনে অতিশয় আতুর হইয়াছি। সে দাবানলের ভয়ঙ্কর শিখাসমূহ মদীয় গাত্র-রোমাবলী দগ্ধ করিতেছে। আমি তোমার পাদপদ্মরূপ সরোবরে আশ্রয় লইলাম। তুমি আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

সংসারজালপতিতস্য জগন্নিবাস
সর্বেন্দ্রিয়ার্থবড়িশার্থঝযোপমস্য ।
প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ৯ ॥

হে জগন্নিবাস শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! আমি সংসারজালে পতিত হইয়াছি। ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল বড়িশরূপে আমার তালুপ্রদেশ ও মস্তক খণ্ড খণ্ড করিতেছে। আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

সংসারভীকরকরীন্দ্রকরাভিঘাত-
নিষ্পিষ্টমর্ম্মবপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ ।

প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১০ ॥

হে সকল-আর্তি-নাশন্ শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ! সংসাররূপ ভীষণ হস্তী স্বীয় শুণ্ডবিঘাতে আমারে দেহের মর্ম্মস্থল নিষ্পেষণ করিতেছে। আমি মৃত্যুভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি, আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য
চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ।
মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য
লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥ ১১ ॥

হে প্রভো! আমি অজ্ঞান-অন্ধ। ইন্দ্রিয়নামক প্রবল তস্করগণ আমার বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মহা অন্ধকূপের গভীর বিবরে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে সলক্ষ্মীক শ্রীনৃসিংহদেব! আমাকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো
বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ।
ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব
দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥ ১২ ॥

হে লক্ষ্মীপতে! হে কমলনাভ! হে সুরেশ! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে পদ্মলোচন! হে ব্রহ্মণ্যদেব! হে কেশব! হে জনার্দন! হে বাসুদেব! হে দেবেশ! এই দীনকে হস্তাবলম্বন প্রদান কর।

যন্মায়য়োর্জ্জিতবপুঃ প্রচুরপ্রবাহ-
মগ্নার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলম্বম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাব্জমধুব্রতেন
স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ ॥ ১৩ ॥

যাহার মায়াতে আক্রান্ত হইয়া পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়, সেই শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহের পাদপদ্মের মধুব্রত শঙ্কর প্রচুরপ্রবাহ মধু অর্থ সম্বলিত সুখকর 'করাবলম্বন'-নামক স্তব রচনা করিয়াছেন।

ইতি সঙ্কটনাশন-লক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা

শ্লোক ১

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর। তিনি অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ।

শ্লোক ২৯

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

লক্ষ-লক্ষ কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিকর-গঠিত গৃহ-সমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র লক্ষ্মীগণ কর্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩০

বেণুং ক্বণন্তমরবিন্দদলায়তাক্ষং
বর্হাবতংসমসিতাম্বুদসুন্দরাঙ্গম্ ।
কন্দর্পকোটিকমনীয়বিশেষশোভং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর কোটি-কন্দর্পমোহন বিশেষ-শোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩১

আলোলচন্দ্রক লসদ্‌বনমাল্যবংশী-
রত্নাঙ্গদং প্রণয়কেলিকলাবিলাসম্ ।
শ্যামং ত্রিভঙ্গললিতং নিয়তপ্রকাশং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিতা বনমালা যাঁহার গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁহার করদ্বয়ে, সর্বদা প্রণয়কেলি-বিলাসযুক্ত যিনি ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর রূপই যাঁহার নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩২

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
আনন্দচিন্ময়সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি; তাঁহার বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন।

শ্লোক ৩৩

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। তিনি—অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হইয়াও নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ।

শ্লোক ৩৪

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাম্ ।
সোঽপ্যস্তি যৎপ্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সেই প্রাকৃত চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়মনপথ অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠদিগের জ্ঞানচর্চারূপ পন্থা শত-কোটি বৎসর চলিয়াও যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩৫

একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং
যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ ।
অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত তিনি এক-তত্ত্ব। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা-কার্যে তাঁহার শক্তি অপৃথগ্রূপে আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁহার মধ্যে বর্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এবস্তুতে আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩৬

যদ্ভাবভাবিতধিয়ো মনুজাস্তথৈব
সংপ্রাপ্য রূপমহিমাসনযানভূষাঃ ।

সূক্তৈর্যমেব নিগমপ্রথিতৈঃ স্তুবন্তি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাহার ভাবরূপ ভক্তিদ্বারা বিভাবিত-চিত্ত মনুষ্যগণ রূপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করতঃ নিগমোক্ত মন্ত্রসূক্ত দ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩৭

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

আনন্দ চিন্ময়রস কর্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩৮

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

প্রেমাঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৩৯

রামাদিমূর্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।

কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যে পরমপুরুষ স্বাংশ কলাদি নিয়মে রামাদি মূর্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪০

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্বিশেষব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি বিভূতি হইতে পৃথক হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪১

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা ।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রৈগুণ্যময়ী এবং জড় ব্রহ্মাণ্ড-সম্বন্ধি বেদজ্ঞান-বিস্তারিণী মায়া—যাঁহার অপরাশক্তি, সেই সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরসত্ত্বনিবন্ধন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪২

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য ।

লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

যিনি আনন্দচিন্ময়রস-স্বরূপে স্মরণকারি-প্রাণীদিগের মনে প্রতিফলিত হইয়া নিজলীলাচেষ্টিত দ্বারা নিরন্তর ভুবন-বিজয়ী হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪৩

গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য
দেবী-মহেশ হরি-ধামসু তেষু তেষু ।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্বোপরি গোলোক-নামা নিজ ধাম। সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪৪

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্তি দুর্গা ।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা', তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪৫

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।

যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪৬

দীপার্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্মা ।
যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্তি বা বাতি-গত হইয়া বিবৃত (বিস্তার) হেতু সমান ধর্মের সহিত পৃথক প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ (বিষ্ণুর) চরিষ্ণু-ভাবে যিনি প্রকাশ পান, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪৭

যঃ কারণার্ণবজলে ভজতি স্ম যোগ-
নিদ্রামনন্তজগদণ্ডসরোমকূপঃ ।
আধারশক্তিমবলম্ব্য পরাং স্বমূর্তিং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

আধার-শক্তিময়ী শেষাখ্যা শ্রেষ্ঠ স্বমূর্তি অবলম্বন-পূর্বক যিনি স্বীয় রোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪৮

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

মহাবিষ্ণুর একটি নিঃশ্বাস বাহির হইয়া যে কাল পর্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁহার লোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেই কালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু—যাঁহার কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৪৯

ভাস্বান যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি যদ্বদত্র ।
ব্রহ্মা য এষ জগদণ্ডবিধানকর্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

সূর্য যেরূপ সূর্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজঃ কিয়ৎ-পরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যাঁহা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৫০

যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুম্ভ-
দ্বন্দ্বে প্রণামসময়ে স গণাধিরাজঃ ।
বিঘ্নান্ বিহন্তুমলমস্য জগত্ত্রয়স্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৫১

অগ্নির্মহী গগনমম্বু মরুদ্দিশশ্চ
কালস্তথাত্মমনসীতি জগত্ত্রয়াণি ।

যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অগ্নি, ক্ষিতি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক, কাল, আত্মা ও মন-এই নয়টি পদার্থে ত্রিজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহা হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৫২

যচ্চক্ষুরেষ সবিতা সকলগ্রহাণাং
রাজা সমস্তসুরমূর্তিরশেষতেজাঃ।
যস্যাজ্ঞয়া ভ্রমতি সংভৃতকালচক্রো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

গ্রহসকলের রাজা, অশেষ তেজোবিশিষ্ট, সুরমূর্তি সবিতা বা সূর্য—জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৫৩

ধর্মোঽথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি
ব্রহ্মাদিকীটপতগাবধয়শ্চ জীবাঃ।
যদ্দত্তমাত্রবিভবপ্রকটপ্রভাবা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ধর্ম, অধর্ম অর্থাৎ পাপসকল, শ্রুতিগণ, তপঃসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত জীবসকল যাঁহার প্রদত্তমাত্র বিভবকর্তৃক প্রকটিত-প্রভাব হইয়া বর্তমান আছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৫৪

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।

কর্ম্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

'ইন্দ্রগোপ'-নামক ক্ষুদ্রকীটই হউন, বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্ম্মমার্গি-জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমানদিগের কর্ম্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৫৫

যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-
বাৎসল্যমোহগুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ।
সঞ্চিন্ত্য তস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ক্রোধ, কাম, সখ্যরূপ সহজ প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মোহ, গুরুগৌরব ও সেব্যভাবদ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করিয়া তদনুশীলনকারিগণ তত্তদ্ভাবনা-যোগ্য রূপ-গুণ-লাভ তারতম্যের সহিত তুল্য-তনু প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি।

শ্লোক ৫৬

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ স্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্
নিমেষার্ধাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ।
ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতিবিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥

যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্‌গত-কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমন-মাত্রই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী, জ্যোতি—চিদানন্দময়, পরম চিৎপদার্থ মাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য; যে-স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, তথা ভূত ও ভবিষ্যদ্‌রূপ খণ্ডত্ব-রহিত চিন্ময়কাল—নিত্য-বর্তমান, সুতরাং নিমেষার্ধ ও ভূতধর্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে এই জড় জগতে বিরলচর অতি স্বল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলিয়া জানেন।

শ্রীঈশোপনিষদ

আবাহন

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

পরমেশ্বর ভগবান সর্বতোভাবে পূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ বলে এই দৃশ্যমান জগৎ-এর মতো তাঁর থেকে উদ্ভূত সব কিছুই সর্বতোভাবে পূর্ণ। যা কিছু পরম পূর্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা সবই পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই তাঁর থেকে অসংখ্য অখণ্ড ও পূর্ণ সত্তা বিনির্গত হলেও তিনি পূর্ণরূপেই অবশিষ্ট থাকেন।

শ্লোক ১

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্ ॥

এই বিশ্ব চরাচরে যা কিছু আছে, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানের সম্পদ এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাই জীবন ধারণের জন্য তিনি যেটুকু বরাদ্দ করে দিয়েছেন সেটুকুই গ্রহণ করা উচিত এবং সব কিছুই যে তাঁর সম্পত্তি তা ভালভাবে জেনে, কখনও তার অতিরিক্ত কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥

কেউ যদি এইভাবে কর্ম করে চলে, তাহলে সে শতবছর বেঁচে থাকার বাসনা পোষণ করতে পারে, কেননা এই ধরনের কর্ম তাকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ করে না। মানুষের এছাড়া অন্য কোন গতি নেই।

শ্লোক ৩

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

যারা জগৎকে ভোগ করে, তারা আত্মঘাতী। তারা দেহ পরিত্যাগ করে, তমসাবৃত অসুরলোকে প্রবেশ করে।

শ্লোক ৪

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো
নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠ-
ত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥

এক ও অটল পরমেশ্বর মন অপেক্ষা দ্রুতগামী। বায়ু ও বারি প্রদানকারী দেবতাগণের নিয়ামক পরমেশ্বর ভগবান একস্থানে স্থিত থাকা সত্ত্বেও অন্য সকলকেই অতিক্রম করে যান। কোন দেবতাই অগ্রবর্তী পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন না।

শ্লোক ৫

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে ।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥

পরমেশ্বর ভগবান সঞ্চরণশীল এবং অচল। তিনি বহুদূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাহিরে অবস্থান করেন।

শ্লোক ৬

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি ।
সর্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

যিনি সর্বভূতে শ্রীভগবানের সম্পর্কিত সকলকে তাঁর অখণ্ড অংশ বলে বিবেচনা করেন এবং সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করেন, তিনি কখনও কোন কিছুর প্রতি বা কারও প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন না।

শ্লোক ৭

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

যিনি সর্বদা সমস্ত জীবকুলকে গুণগতভাবে শ্রীভগবানের সঙ্গে অভিন্ন, চিৎকণা স্বরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী; তাঁর শোকই বা কি? মোহই বা কি? তাঁর মোহ বা শোক থাকে না।

শ্লোক ৮

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥

এইরূপ ব্যক্তি তত্ত্বতঃ তাঁর স্বাধ্যায় জ্ঞানের মাধ্যমে সেই পরম বিগ্রহ, অদেহী, সর্বজ্ঞ, অক্ষত, শিরাহীন, শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ, পরিভূ ও

সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণকারী পরম প্রজ্ঞাবিদ্ শ্রীভগবানকে জানতে পারেন।

শ্লোক ৯

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥

অবিদ্যানুশীলনকারীগণ অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারময় লোকে প্রবেশ করে; যারা তথাকথিত বিদ্যানুশীলনে রত, তারা আরও ঘোরতর অন্ধকারময় স্থানে গতি লাভ করে।

শ্লোক ১০

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়ান্যদাহুরবিদ্যয়া ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্ বিচচক্ষিরে ॥

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, বিদ্যানুশীলন থেকেই এক ফল লাভ হয়, এবং অবিদ্যা অনুশীলন থেকে ভিন্ন ফল লাভ হয়।

শ্লোক ১১

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

যিনি পরা এবং অপরা উভয় বিদ্যাই যুগবৎ শিক্ষা করেন, তিনিই একমাত্র জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করেন।

শ্লোক ১২

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥

দেবতার উপাসকগণ অবিদ্যার অন্ধকারতম প্রদেশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপাসকগণ আরও অন্ধকারময় লোকে পতিত হয়।

শ্লোক ১৩

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥

'সম্ভবাৎ' অর্থাৎ সর্বকারণের কারণ পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় আর 'অসম্ভবাৎ' অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বর নন, তাঁর উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। ধীর অধিকারী আচার্যগণ থেকে এই শিক্ষা লাভ করা যায়।

শ্লোক ১৪

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে ॥

পরম পুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম, অনিত্য জগৎ, অনিত্য দেবতাকুল, মানুষ ও পশুকুল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তিনি মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী প্রাকৃত জগৎ অতিক্রম করে সনাতন ভগবদ্ধাম লাভ এবং সচ্চিদানন্দময় জীবন আস্বাদন করেন।

শ্লোক ১৫

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

হে ভগবান! হে সর্বজীব পালক! আপনার জ্যোতির্ময় আলোক আপনার মুখারবিন্দকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। কৃপা করে এই আচ্ছাদন দূর করুন এবং আপনার শুদ্ধ ভক্তকে আপনার সত্য স্বরূপ প্রদর্শন করুন।

শ্লোক ১৬

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো ।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥

হে প্রভু, আপনি আদি কবি; আপনি বিশ্বপালক, আপনি যম এবং আপনি ভক্তদের পরম গতি ও প্রজাপতিদের সুহৃদ। কৃপা করে

আপনার তেজোময় দিব্যজ্যোতি সংহরণ করুন যাতে আমি আপনার আনন্দময় রূপ দর্শন করতে পারি। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান। সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্বন্ধের মতো আপনার সাথে আমি সম্বন্ধযুক্ত।

শ্লোক ১৭

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥

এই অনিত্য জড় শরীর ভস্মীভূত হয়ে পূর্ণ-প্রাণ বায়ুর সঙ্গে এই প্রাণবায়ুর মিলন হোক। হে ভগবান! আপনি আমার পরম সুহৃদ্, তাই আমার সেবা ও আপনাকে সর্বস্ব উৎসর্গের কথা এখন কৃপা করে স্মরণ রাখবেন।

শ্লোক ১৮

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম ॥

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন, যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্ম থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

ইতি—শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক মূল শ্লোকের অনুবাদ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোকাবলী

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ ১/১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন, হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্রেরা তারপর কি করল?

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ২/৭ ॥

কার্পণ্যজনিত দুর্বলতার প্রভাবে আমি এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছি। আমার কর্তব্য সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি এখন কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এখন আমি তোমার শিষ্য, সর্বতোভাবে তোমার শরণাগত। দয়া করে তুমি আমাকে শিক্ষা দাও।

শ্রীভগবানুবাচ

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ২/১১ ॥

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—তুমি প্রাজ্ঞের মতো কথা বলছ, অথচ যে বিষয়ে শোক করা উচিত নয় সেই বিষয়ে শোক করছ। যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত, তাঁরা কখনো জীবিত অথবা মৃত কারো জন্যই শোক করেন না।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ২/১২ ॥

এমন কোন সময় ছিল না যখন আমি, তুমি এবং এই সমস্ত রাজারা ছিল না; এবং ভবিষ্যতেও কখনো আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ২/১৩ ॥

দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনো এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ২/১৪ ॥

হে কৌন্তেয়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগের ফলে অনিত্য সুখ এবং দুঃখের অনুভব হয়, সেগুলি ঠিক যেন শীত এবং গ্রীষ্ম ঋতুর গমনাগমনের মতো। হে ভরতকুল প্রদীপ, সেই ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেগুলি সহ্য করার চেষ্টা কর।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২/২০ ॥

আত্মার কখনো জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না; তিনি জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনো বিনষ্ট হয় না।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২/২২ ॥

মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২/২৩ ॥

আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে ভেজানো যায় না, অথবা হাওয়াতে শুকানোও যায় না।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২/২৭ ॥

যার জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; এবং যার মৃত্যু হয়েছে তার জন্মও অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার কর্তব্য সম্পাদন করার সময় শোক করা উচিত নয়।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২/৩০ ॥

হে ভারত, প্রাণীদের দেহে অবস্থিত আত্মা সর্বদাই অবধ্য। সেজন্য কোন প্রাণীর দেহত্যাগে তোমার শোক করা উচিত নয়।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ২/৪০ ॥

ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনও ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ২/৪১ ॥

যারা এই পথ অবলম্বন করেছে তাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠ। হে কুরুনন্দন, অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিদের বুদ্ধি বহুশাখাবিশিষ্ট ও বহুমুখী।

ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ২/৪৪ ॥

যারা ভোগ ও ঐশ্বর্য সুখে একান্ত আসক্ত, সেই সমস্ত বিবেকবর্জিত মূঢ় ব্যক্তিদের বুদ্ধি সমাধি অর্থাৎ ভগবানে একনিষ্ঠতা লাভ হয় না।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ২/৪৫ ॥

বেদে প্রধানত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়েছে। হে অর্জুন, তুমি সেই গুণগুলিকে অতিক্রম করে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হও। সমস্ত দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হও এবং লাভ-ক্ষতি ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে অধ্যাত্ম চেতনায় অধিষ্ঠিত হও।

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ২/৪৬ ॥

ক্ষুদ্র জলাশয়ে যে সমস্ত প্রয়োজন সাধিত হয়, সেগুলি যেমন বৃহৎ জলাশয় থেকে আপনা হতেই সাধিত হয়ে যায়, তেমনই ভগবানের উপাসনার মাধ্যমে যিনি পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করে সব কিছুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করেছেন, তাঁর কাছে সমস্ত বেদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে।

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ২/৫৯ ॥

দেহবিশিষ্ট জীব ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে, কিন্তু তবুও ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের আসক্তি থেকে যায়। কিন্তু উচ্চতর স্বাদ আস্বাদন করার ফলে সেই বিষয়-তৃষ্ণা থেকে তিনি চিরতরে নিবৃত্ত হন।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে ।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ২/৬২ ॥
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ২/৬৩ ॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে কামনার উদয় হয়, এবং কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হওয়ার ফলে সর্বনাশ হয়। এবং মানুষ পুনরায় জড় জগতের অন্ধকূপে অধঃপতিত হয়।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্ ।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২/৬৪ ॥

সংযত চিত্ত মানুষ প্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক আসক্তি ও অপ্রিয় বস্তুতে স্বাভাবিক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করে ভগবানের কৃপা লাভ করেন।

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী ।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ২/৬৯ ॥

সমস্ত জীবের পক্ষে যা রাত্রি স্বরূপ, স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থেকে আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। আর যখন সমস্ত জীবেরা জেগে থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির কাছে তা রাত্রি স্বরূপ।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩/৯ ॥

বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করার জন্য কর্ম করা উচিত; তা না হলে কর্ম জীবকে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে। তাই, হে কৌন্তেয়, ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই কেবল তোমার কর্তব্যকর্ম অনুষ্ঠান করো, এবং তার ফলে তুমি সদাসর্বদা জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৩/১৪ ॥

অন্ন খেয়ে প্রাণীগণ জীবন ধারণ করে; বৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বৃষ্টি উৎপন্ন হয়; শাস্ত্রোক্ত কর্ম থেকে যজ্ঞ উৎপন্ন হয়।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৩/২১ ॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেভাবে আচরণ করেন, সাধারণ মানুষেরাও তার অনুকরণ করেন। তিনি যা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন, অন্য লোকে তারই অনুসরণ করে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩/২৭ ॥

মোহাচ্ছন্ন জীব প্রাকৃত অহঙ্কারবশত জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা ক্রিয়মান সমস্ত কার্যকে স্বীয় কার্য বলে মনে করে 'আমি কর্তা'—এই রকম অভিমান করে।

শ্রীভগবানুবাচ

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩/৩৭ ॥

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে অর্জুন, রজোগুণ থেকে সমুদ্ভূত কামই মানুষকে এই পাপে প্রবৃত্ত করে এবং এই কামই ক্রোধে পরিণত হয়। কাম সর্বগ্রাসী এবং পাপাত্মক; কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলে জানবে।

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ৪/১ ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ৪/২ ॥

এইভাবে পরম্পরা মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে।

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৪/৩ ॥

সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৪/৬ ॥

যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি স্বীয় মায়ার দ্বারা আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৪/৭ ॥

হে ভারত, যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪/৮ ॥

সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৪/৯ ॥

হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ৪/১০ ॥

আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে, সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে, একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে—এবং সেইভাবে সকলেই আমার চিন্ময় প্রীতিলাভ করেছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ৪/১১ ॥

যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেইভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করে।

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ৪/১৩ ॥

প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে চারিটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪/৩৪ ॥

সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫/১৮ ॥

যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ৫/২২ ॥

বিবেকবান পুরুষ ইন্দ্রিয়জাত দুঃখজনক বিষয় ভোগে আসক্ত হন না। হে কৌন্তেয়, এই ধরনের সুখ-ভোগ উৎপত্তি হয় এবং বিনাশশীল। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তাতে প্রীতি লাভ করেন না।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫/২৯ ॥

আমাকে সমস্ত যজ্ঞ এবং তপস্যার পরম উদ্দেশ্যরূপে জেনে, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সকলের উপকারী সুহৃদরূপে আমাকে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করেন।

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ৬/১৭ ॥

যিনি পরিমিত আরাহ্ ও বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যাঁর নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড়জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৬/৪১ ॥

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যবানদের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক সকলে বহুকাল বাস করে সদাচারী ব্রাহ্মণদের গৃহে অথবা শ্রীমান্ ধনী বণিকদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৬/৪৭ ॥

যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৭/৩ ॥

হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কোন একজন সিদ্ধি লাভের জন্য যত্ন করেন, আর হাজার হাজার সিদ্ধদের মধ্যে কদাচিৎ একজন আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎ-স্বরূপকে তত্ত্বত অবগত হন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৭/৪ ॥

ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৭/৫ ॥

হে মহাবাহো, এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি রয়েছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা ও জীবভূতা; সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড় জগৎকে ধারণ করে আছে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭/৭ ॥

হে ধনঞ্জয় (অর্জুন), আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করে।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৭/১৪ ॥

আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ৭/১৫ ॥

মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এবং যারা আসুরিক ভাবসম্পন্ন, সেই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা কখনো আমার শরণাগত হয় না।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ৭/১৬ ॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জুন, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী, এই চার প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণ আমার ভজনা করেন।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ৭/১৯ ॥

বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব কারণের পরম কারণ রূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ৭/২৫ ॥

আমি মূঢ় ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে কখনও প্রকাশিত হই না। তাদের কাছে আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা আবৃত থাকি। তাই, তাঁরা আমার অজ ও অব্যয় স্বরূপকে জানতে পারে না।

বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ৭/২৬ ॥

হে অর্জুন! পরমেশ্বর ভগবানরূপে আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত। আমি সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ৭/২৭ ॥

হে ভারত! হে পরন্তপ! ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৭/২৮ ॥

যে সমস্ত পুণ্যবান ব্যক্তির পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে এবং যাঁরা দ্বন্দ্ব এবং মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে আমার ভজনা করেন।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্ ।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৮/৫ ॥

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৮/৬ ॥

মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৮/৭ ॥

অতএব, হে অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তা হলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮/১৪ ॥

যিনি একাগ্রচিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীদের কাছে সুলভ হই।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ৮/১৫ ॥

মহাত্মাগণ, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ, আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কেননা তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮/১৬ ॥

হে অর্জুন, এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ৮/২৮ ॥

ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হবে না; বেদ পাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যত প্রকার 'জ্ঞান' ও 'কর্ম' আছে, সে সমুদয়ের যে ফল, তুমি তা ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হও।

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্ ॥ ৯/২ ॥

এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব থেকেও গুহ্যতর, অতি পবিত্র, এবং প্রত্যক্ষরূপে আত্ম উপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় এবং সুখসাধ্য।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৯/৪ ॥

অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ৯/১০ ॥

হে কৌন্তেয়, আমার অধ্যক্ষতার দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে। প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ৯/১১ ॥

আমি যখন মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হই তখন মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার পরম ভাব সম্বন্ধে অবগত নয় এবং তারা আমাকে সর্বভূতের মহেশ্বর বলে জানে না।

মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ৯/১২ ॥

এইভাবে যারা মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তারা রাক্ষসী এবং আসুরী ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেই মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়, তাদের মুক্তি লাভের আশা, তাদের সকাম কর্ম এবং জ্ঞানের প্রয়াস সমস্তই ব্যর্থ হয়।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ৯/১৩ ॥

হে পার্থ, মোহমুক্ত মহাত্মাগণ আমার দৈবী-প্রকৃতি আশ্রয় করেন। তাঁরা আমাকে সর্বভূতের কারণ ও অবিনাশী জেনে অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করেন।

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ৯/১৪ ॥

ব্রহ্মচর্যাদি ব্রতে দৃঢ়নিষ্ঠ ও যত্নশীল হয়ে সেই ভক্তরা সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করে এবং সর্বদা ভক্তিপূর্বক আমার উপাসনা করে।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে ।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ৯/২২ ॥

অনন্য চিত্তে আমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাঁরা আমার উপাসনা করেন, আমি তাঁদের সমস্ত অভাব পূরণ করি এবং তাঁদের প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ করি।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ৯/২৫ ॥

দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; যারা ভূত-প্রেত আদির উপাসক তারা ভূতলোকই লাভ করে; যারা পিতৃপুরুষদের উপাসক, তারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে; এবং যাঁরা আমার উপাসনা করেন, তাঁরা আমাকেই লাভ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ৯/২৬ ॥

যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ৯/২৭ ॥

হে কৌন্তেয়, তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ৯/২৯ ॥

আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউই আমার প্রিয় নয় এবং অপ্রিয়ও নয়। কিন্তু যাঁরা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁরা স্বভাবতই আমাতে অবস্থান করেন এবং আমিও স্বভাবতই তাঁদের হৃদয়ে বাস করি।

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৯/৩০ ॥

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করেন, তাঁকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯/৩২ ॥

হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচ বর্ণস্থ মানুষেরা আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করলে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯/৩৪ ॥

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর, আমাকে প্রণাম কর এবং আমার পূজা কর। সম্পূর্ণরূপে আমাকে আশ্রয় করে তুমি অবশ্যই আমাকে লাভ করবে।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ১০/৮ ॥

আমি জড় এবং চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছুই আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে যাঁরা শুদ্ধভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন, তাঁরাই যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী।

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ১০/৯ ॥

যাঁরা আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করেছেন, তাঁরা পরস্পরের মধ্যে আমার কথা আলোচনা করে এবং আমার সম্বন্ধে পরস্পরকে বুঝিয়ে পরম সন্তোষ ও অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০/১০ ॥

যাঁরা নিত্য ভক্তিযোগ দ্বারা প্রীতিপূর্বক আমার ভজনা করেন, আমি তাঁদের শুদ্ধ জ্ঞানজনিত বুদ্ধিযোগ দান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১০/১১ ॥

তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে, আমি তাঁদের হৃদয়ে অবস্থিত হয়ে উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত মোহান্ধকার নাশ করি।

অর্জুন উবাচ

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১০/১২ ॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১০/১৩ ॥

অর্জুন বললেন—তুমি পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র, পরম পুরুষ, নিত্য আদি দেব, অজ ও বিভু। দেবর্ষি নারদ, অসিত,

দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা সেইভাবে তোমাকে বর্ণনা করেছেন, এবং তুমি নিজেও এখন আমাকে তা বলছ।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ১০/৪১ ॥

ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রী-সম্পদ বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার শক্তির অংশ সম্ভূত বলে জানবে।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥ ১১/৫৪ ॥

হে অর্জুন, অনন্য ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানতে ও স্বরূপত প্রত্যক্ষ করতে এবং আমার চিন্ময় ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১/৫৫ ॥

হে অর্জুন, যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, আমার প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ, আমার ভক্ত, জড় বিষয়ে সম্পূর্ণ আসক্তি রহিত এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি শত্রুভাব রহিত, তিনিই অবশ্যই আমার কাছে ফিরে আসেন।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ১২/৫ ॥

যাদের মন ভগবানের অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপের প্রতি আসক্ত, তাদের পক্ষে পারমার্থিক লাভ করা অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ অব্যক্তের উপাসনার ফলে কেবল দুঃখই লাভ হয়।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ ॥ ১২/৮ ॥

অতএব আমাতেই তুমি মন সমাহিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। তার ফলে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্‌ ।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ১২/৯ ॥

হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি স্থিরভাবে আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তা হলে অভ্যাস যোগের দ্বারা আমাকে লাভ করতে চেষ্টা কর।

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব ।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১২/১০ ॥

যদি তুমি এইভাবে অভ্যাস করতেও সমর্থ না হও, তা হলে আমার জন্য কর্ম করতে চেষ্টা কর, কারণ আমার কর্ম করতে করতেই তুমি ক্রমে সিদ্ধি লাভ করবে।

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ১৪/৪ ॥

হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যত মূর্তি প্রকাশিত হয় ব্রহ্মরূপ যোনিই তাদের জননী স্বরূপা এবং আমি তাদের বীজ প্রদানকারী পিতা।

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৪/২৬ ॥

যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ১৪/২৭ ॥

আমিই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়ত্ব, নিত্যত্ব, নিত্য ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের আশ্রয় আমিই।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ১৫/৫ ॥

যিনি অভিমান এবং মোহশূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্য-অনিত্য বিচারপরায়ণ, নিবৃত্ত কাম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মুক্ত, এবং পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার পন্থা অবগত, তিনিই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন।

ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ১৫/৬ ॥

আমার সেই পরম ধাম সূর্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুৎ আলোকিত করতে পারে না। সেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫/৭ ॥

এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্ন অংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতি রূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫/১৫ ॥

আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত আছি, এবং আমার থেকেই সমস্ত জীবের স্মৃতি এবং জ্ঞান উৎপন্ন ও বিলোপ হয়। আমিই সমস্ত বেদের জ্ঞাতব্য, সমস্ত বেদান্ত কর্তা এবং বেদবেত্তা।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তম্ ।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত ॥ ১৫/১৯ ॥

হে ভারত, যিনি নিঃসন্দেহে আমাকে পুরুষোত্তম বলে জানেন, তিনিই সর্বজ্ঞ এবং তিনিই সর্বতোভাবে আমাকে ভজনা করেন।

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥ ১৮/৪২ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য— এই কয়েকটি ব্রাহ্মণদের স্বভাবজ কর্ম।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৮/৫৪ ॥

যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮/৫৫ ॥

ভক্তির দ্বারা কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।

মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি ।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ১৮/৫৮ ॥

এইভাবে মদগতচিত্ত হলে, আমার কৃপায় তুমি জড় জীবনের সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু তুমি যদি তা না করে, আমার কথা না শুনে, অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে কর্ম কর, তা হলে তুমি বিনষ্ট হবে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৮/৬১ ॥

হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ১৮/৬৫ ॥

তুমি আমাতে চিত্ত স্থির কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্য আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করছি যে, এইভাবে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে।

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৮/৬৬ ॥

সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সে বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।

য ইদং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি ।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ১৮/৬৮ ॥

যিনি আমার ভক্তদের এই পরম গোপনীয় জ্ঞান উপদেশ করেন, তিনি অবশ্যই পরা ভক্তি লাভ করবেন এবং অবশেষে আমার কাছে ফিরে আসবেন।

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ১৮/৬৯ ॥

এই পৃথিবীতে মানুষদের মধ্যে তার থেকে অধিক প্রিয়কারী এবং আমার প্রিয় আর কেউ নেই এবং কখনও হবে না।

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ১৮/৭৮ ॥

যেখানে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় বর্তমান—এইটিই আমার অভিমত।

তিলক ধারণ

সকল ভক্তের জন্য তিলক ধারণ অতি প্রয়োজনীয় একটি বিধি। নিজের সুরক্ষা এবং নিজেকে শুদ্ধ রাখা—উভয়ের জন্যই তিলকের আবশ্যকতা রয়েছে। আর কপালে শোভিত সুন্দর ও শুভ তিলকচিহ্ন জগতের কাছে একটি স্পষ্ট ঘোষণা রাখে ঃ তিলক ধারণকারী একজন বিষ্ণুভক্ত—বৈষ্ণব। আর তিলক পরিহিত ভক্তকে দর্শন করে সাধারণ মানুষের কৃষ্ণস্মরণ হয় এবং এভাবে তারাও পবিত্র হয়।

কখনো কখনো, কিছু ভক্ত পরিহাসের ভয়ে তিলক ধারণে লজ্জাবোধ করেন। কিন্তু যারা সাহস করে তিলক গ্রহণ করেন—এমনকি তাদের কর্মক্ষেত্রেও—তাঁরা অনুভব করেন তাদের প্রতি প্রযুক্ত চটুল পরিহাস ক্রমশঃ কিভাবে শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হচ্ছে। যেসব ভক্ত মনে করছেন যে কোনভাবেই তাঁরা প্রকাশ্যে তিলক গ্রহণ করতে পারবেন না, তাঁরা অন্ততঃপক্ষে জল-তিলক ধারণ করবেন। গোপীচন্দনের তিলক ধারণের পরিবর্তে একইরকমভাবে জল দিয়ে অদৃশ্য তিলক অঙ্কন করুন, আর সেই সাথে যথাযথ মন্ত্রগুলো উচ্চারণ করুন। এর ফলে অন্ততঃ মন্ত্রের রক্ষাকারী গুণগুলির উপকার লাভ করা যাবে।

তিলক ধারণের জন্য বিভিন্ন তিলকমাটি শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। অধিকাংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ঈষৎ হলুদ রং বিশিষ্ট

মৃত্তিকা—গোপীচন্দন তিলক ব্যবহার করেন। এই তিলকমাটি বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে এবং ইসকন কেন্দ্রসমূহে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ স্নানের পর তিলকধারণ করতে হয়। একজন বৈষ্ণব সর্বক্ষণ তিলক পরিহিত থাকেন। তিলক পরতে হয় এভাবে ঃ বাঁ হাতের তালুতে একটু জল নিন। এবার ডানহাতে একটুকরো গোপীচন্দন নিয়ে বা হাতে ঘষতে থাকুন যতক্ষণ না তা ধারণের উপযুক্ত হয়। তিলক ধারণ করার সময় শ্রীবিষ্ণুর বারটি নাম-সমন্বিত নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে হয় ঃ

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে ।
বক্ষঃস্থলে মাধবং তু গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ, বাহৌ চ মধুসূদনম্ ।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু, বামনং বামপার্শ্বকে ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে ।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ, কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥

"ললাটে তিলক ধারণ করার সময় কেশবের ধ্যান করা কর্তব্য। উদরে তিলক ধারণ করার সময় নারায়ণের ধ্যান করা কর্তব্য। বক্ষে তিলক ধারণ করার সময় মাধবের ধ্যান কর্তব্য এবং কণ্ঠে তিলক ধারণ করার সময় গোবিন্দের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময় বিষ্ণুর ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ বাহুতে তিলক ধারণ করার সময় মধুসূদনের ধ্যান করা কর্তব্য। দক্ষিণ স্কন্ধে তিলক ধারণ করার সময় ত্রিবিক্রমের ধ্যান করা কর্তব্য এবং বাম কুক্ষে তিলক ধারণ করার সময় বামনের ধ্যান করা কর্তব্য। বাম বাহুতে তিলক ধারণ করার সময় শ্রীধরের ধ্যান করা কর্তব্য, বাম স্কন্ধে তিলক ধারণ করার সময় হৃষীকেশের ধ্যান করা কর্তব্য; পৃষ্ঠের উপরিভাগে তিলক ধারণ করার সময় পদ্মনাভের ধ্যান করা কর্তব্য

এবং পৃষ্ঠের নিম্নদেশে তিলক ধারণ করার সময় দামোদরের ধ্যান করা কর্তব্য।" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা : ২০-২০২ তাৎপর্য হতে উদ্ধৃত)

তিলক ধারণ পদ্ধতি

প্রথমে ডানহাতের অনামিকা (৪র্থ আঙুল) দিয়ে একটু গোপীচন্দনের মিশ্রণ নিন। এবার প্রথমে ললাটে (কপালে) তিলক অঙ্কন করুন (ছবি দেখুন)। চাপ প্রয়োগ করে লম্বভাবে দুটি রেখা ললাটে অঙ্কন করুন। রেখা টানতে হবে নাসিকা-মূল থেকে উপর দিকে কপালে (উপর থেকে নীচের দিকে নয়)। রেখাদুটিকে বেশ স্পষ্ট করার জন্য একইভাবে কয়েকবার টানতে হবে। রেখাদুটি হবে সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন এবং সমান্তরাল। এবার গোপীচন্দন নাসা-মূল থেকে শুরু করে নাসিকায় দিন (এবার উপর থেকে নীচের দিকে)। অবশ্য পুরোপুরি নাসাগ্র পর্যন্ত তিলক লেপন করবেন না, আবার খুব ছোটও যেন না হয়—সঠিক দৈর্ঘ্য হল নাসিকার চার ভাগের তিন ভাগ। ললাটের রেখাদুটি এবং নাসিকার তিলক ঠিক ললাটে ও নাসিকার সংযোগস্থানে মিলিত হবে। আয়না দেখে এটা ঠিক করে নিন। তিলক খুব সযত্নে পরিচ্ছন্নভাবে ধারণ করতে হয়।

তিলক ধারণের সময় নীচের মন্ত্রগুলো জপ করতে হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে তিলকাঙ্কনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুনির্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। নীচের ক্রম অনুসারে বিভিন্ন অঙ্গে তিলক ধারণ করতে হয় :

১। ললাটে—ওঁ কেশবায় নমঃ

২। উদরে—ওঁ নারায়ণায় নমঃ

৩। বক্ষস্থলে—ওঁ মাধবায় নমঃ

৪। কণ্ঠে—ওঁ গোবিন্দায় নমঃ
৫। দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ বিষ্ণবে নমঃ
৬। দক্ষিণ বাহুতে—ওঁ মধুসূদনায় নমঃ
৭। দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ
৮। বাম পার্শ্বে—ওঁ বামনায় নমঃ
৯। বাম বাহুতে—ওঁ শ্রীধরায় নমঃ
১০। বাম স্কন্ধে—ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ
১১। পৃষ্ঠে—ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ
১২। কটিতে—ওঁ দামোদরায় নমঃ

ডানহাতের অনামিকা (চতুর্থ আঙুল) দিয়ে তিলক ধারণ করতে হয়। ডানহাতের বাহুতে তিলক দেওয়ার জন্য বাম হাতের অনামিকা ব্যবহার করতে হবে। সর্বাঙ্গে তিলকাঙ্কনের পর বাম হাতের তালুর অবশিষ্ট তিলক-মিশ্রণ সামান্য জলে ধুয়ে ঐ জল "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" উচ্চারণপূর্বক মস্তকে দিতে হবে।

বৈষ্ণব বেশ

যদিও বৈষ্ণবের মত পোশাক পরিধান অপরিহার্য-কিছু নয়, কেননা বাহ্য বেশের চেয়ে আন্তর-চেতনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ, তবু এর গুরুত্ব রয়েছে। ঠিক যেমন একজন পুলিসকে তার ইউনিফর্ম দেখে চেনা যায় (এবং সবাই তার সাথে সেইভাবে আচরণ করে), তেমনি বৈষ্ণব বেশ ধারণের মাধ্যমে একজন ভক্ত একজন দায়িত্বশীল কৃষ্ণভক্ত হিসাবে নিজেকে সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করেন। যে-সমস্ত ভক্ত এরকম বেশ গ্রহণ করেন, তারা প্রতিদিনই কৌতূহলী জনগণের কাছে কেন তারা ভক্ত হয়েছেন তা ব্যাখ্যা করার আনন্দময়

অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাই বৈষ্ণব বেশ ধারণ করলে প্রচার করার একটি বাড়তি সুযোগ পাওয়া যায়।

তাছাড়া কেউ বৈষ্ণব বেশ ধারণ করলে তার উপর যথার্থ বৈষ্ণবের মত আচার-আচরণের দায়িত্বও বর্তায়। সাধুর বেশধারণকারীকে অবশ্যই সাধুর মত মর্যাদাপূর্ণ ভাবে চলাফেরা করতে হয়—এটাই প্রত্যাশিত। সেজন্য কৃষ্ণভক্তের নির্দিষ্ট বেশ আমাদের ভক্তোচিতভাবে চলতে সাহায্য করে। আর এটা বাস্তব যে বাহ্যিকভাবে যদি আমাদের বৈষ্ণবের মত দেখায়, তাহলে নিজেকে বৈষ্ণব হিসাবে অনুভব করতেও তা আমাদের সাহায্য করে।

অন্যদিকে অধুনা জনপ্রিয় পশ্চিমী পোশাক আপনা থেকেই এক ভোগী অভক্তের ভাব মনে সঞ্চারিত করে। পশ্চিমী পোশাক পশ্চিমী ধ্যান-ধারণার সাথে সম্পৃক্ত; পাশ্চাত্য জগতের জীবনধারা প্রধানতঃ যৌনবাসনা এবং ভোগতৃষ্ণাকেন্দ্রিক—আর সেজন্য সবচেয়ে ভাল হচ্ছে তা বর্জন করা। যদি কেউ প্রকাশ্যে বৈষ্ণব বেশধারণে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, তবে তিনি স্বগৃহে তা করতে পারেন; অথবা অন্ততঃ গৃহে ভজনের সময় এবং মন্দির দর্শনের সময়ে তিনি বৈষ্ণব বেশ পরিধান করতে পারেন।

আদর্শ বৈষ্ণব বেশ এরকম ঃ পুরুষদের জন্য তিলক, তুলসীমালা, মুণ্ডিত মস্তক এবং গ্রন্থিযুক্ত শিখা (শিখা দেড় ইঞ্চির বেশী চওড়া হওয়া উচিত নয়)। মন্দিরের বাইরে বসবাসরত যে-সমস্ত গৃহীভক্ত মস্তক মুণ্ডিত রাখতে অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ বোধ করেন, তাঁরা খুব ছোট করে ছাঁটা চুল রাখতে পারেন—লম্বা চুল নয়, কেননা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীগণ লম্বা চুলকে আপত্তিজনক বলে মনে করেন। মুখমণ্ডল থাকবে পরিষ্কার করে কামানো—দাড়ি, গোঁফ বা জুলফি কিছু রাখা চলবে না। পোশাক—ধুতি এবং পাঞ্জাবী।

ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরা গেরুয়া বস্ত্র পরেন। অন্যান্য বিবাহিত এবং অবিবাহিত পুরুষেরা সাদা পোশাক ব্যবহার করেন। ভক্তিমূলক নয় এমন ছবি বা কথার ছাপ দেওয়া টি-শার্ট বৈষ্ণবদের পরিধানের উপযোগী নয়।

চর্ম-নির্মিত জুতো, পোশাক, ব্যাগ, বেল্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়।

সুশোভন পোশাক পরিহিত একজন বৈষ্ণব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত একজন অভিজাত ভদ্রলোকের ন্যায় প্রতিভাত হন।

স্ত্রীলোকদের জন্য ঃ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পোশাক (শাড়ী), তিলক এবং মালা। কোন পশ্চিমী ফ্যাশন নয় বা খোলা চুল নয়; বাঙালীদের মত মাথার দু'ভাগে বিভক্ত চুল, দেহের অবশিষ্টাংশ স্বামী-পুত্ররা ছাড়া অন্যদের উপস্থিতিতে সর্বদাই আবৃত রাখতে হবে।

চারটি বিধিনিয়ম

ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের চারটি বিধিনিয়ম হল ঃ

১) মাছ-মাংস-ডিম সহ সবরকম আমিষ আহার বর্জন।

২) সর্ববিধ মাদকদ্রব্য বর্জন।

৩) তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি সর্ববিধ দ্যূতক্রীড়া পরিত্যাগ।

৪) অবৈধ যৌনকর্ম বর্জন।

এই চারধরনের পাপকর্ম হল পাপময় জীবনের চারটি স্তম্ভের মত, তাই এসব অবশ্য বর্জনীয়। এইসব পাপাচার সরাসরি ধর্মের চারটি স্তম্ভকে ধ্বংস করে—সেগুলি হল ঃ দয়া, সংযম, সত্যবাদিতা এবং শুচিতা।

যদি কেউ পাপকর্মে আসক্ত থাকে এবং তার যদি দয়া, সংযম সত্যবাদিতা এবং শুচিতা ইত্যাদি না থাকে, তাহলে কেমন করে সে পারমার্থিক জীবনে উন্নতি করবে? সেই জন্য এই চারটি বিধিনিয়ম পালন প্রত্যেক ভক্তের জন্য—বস্তুতঃ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জন্যই আবশ্যিক।

মাছ-মাংস-ডিম ছাড়াও পেঁয়াজ রসুন আহার করাও ভক্তদের জন্য নিষিদ্ধ, যেমন নিষিদ্ধ কারখানায় তৈরী রুটি বা বিস্কুট বা অন্যান্য খাবার, যা অভক্তদের দ্বারা তৈরী হয়েছে। ভক্তরা আহারের জন্য কেবল কৃষ্ণপ্রসাদই পছন্দ করেন। ভগবানকে আনন্দদানের জন্য প্রস্তুত এবং প্রীতিসহকারে তাঁকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্যই হল কৃষ্ণপ্রসাদ।

মাদক দ্রব্য বলতে কেবল অ্যালকোহল, গাঁজা এবং আরও সব অতি উত্তেজক মাদকই নয়, তামাক, পান-সুপারী, নস্যি, সিগারেট, চা, কফি এবং ক্যাফিন রয়েছে এমন ঠাণ্ডা পানীয় (সফ্‌ট্ ড্রিংকস-যেমন কোলা)—ইত্যাদিও সমভাবে বর্জনীয়।

তাস-পাবা-জুয়া খেলা সহ সমস্ত ধরনের চপলতাপূর্ণ আমোদ-প্রমোদ—যেমন টিভি দেখা, সিনেমায় যাওয়া, জড়জাগতিক খেলা-ধূলা, গানবাজনা—এসব ভক্তদের জন্য নয়। স্মরণ রাখতে হবে যে লটারী খেলাও জুয়াখেলা বিশেষ।

বিবাহিত জীবনে কৃষ্ণভাবনাময় সন্তান লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া অপর সমস্ত রকম যৌন সম্বন্ধই অবৈধ। বৈবাহিক সম্পর্কের বাইরে কোনরূপ যৌন ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত পাপজনক, আর তা পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট করে—কাজেই তা এমনকি চিন্তা করাও উচিত নয়। ভ্রূণহত্যা, কৃত্রিম গর্ভনিরোধ এবং বন্ধ্যাকরণ শুধু প্রকৃতি বিরুদ্ধ, অস্বাভাবিক নয়, তা মহাপাপ। স্বমেহনকেও অবৈধ

যৌনক্রিড়া বলে গণ্য করা হয়, কেননা তার ফলে বীর্যক্ষয় হয় এবং তা আমাদের চেতনাকে কলুষিত করে।

আধুনিক কালের তথাকথিত প্রগতিশীল সভ্যতা এমনভাবে যৌনতাকে অবাধ করে তুলেছে যে, এমনকি যারা পারমার্থিক প্রগতিতে নিষ্ঠাপরায়ণ তাদের পক্ষেও যৌনবেগ দমন করা অনেকসময় দুরূহ হয়ে পড়ে। এমন সমস্যা থাকলে আপনি গভীর বিশ্বাস রাখেন এমন কোন ভক্তের সাথে এই নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে পারেন। এছাড়াও "Brahmacharya In Krishna Consciousness" (কৃষ্ণভাবনাময় ব্রহ্মচর্য) বইটি পড়তে পারেন।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যাসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথা ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

(ভাঃ ৩/২৫/২৫)

শুচিতা

ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুচিতাকে এক দিব্যগুণ এবং ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণরূপে বর্ণনা করেছেন। আর অশুচিতাকে তিনি অসুরত্বের লক্ষণ বলে ঘোষণা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুচিতাকে ভক্তের ছাব্বিশটি গুণের অন্যতম রূপে বর্ণনা করেছেন। আর শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন এ-বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর—শুচিতার নিয়ম আচারাদি তাঁর শিষ্যদের কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। এতে কেউ শৈথিল্য দেখালে শ্রীল প্রভুপাদ তার কঠোর সমালোচনা করতেন।

শুচিতার নিয়মনীতি বৈদিক সংস্কৃতিতে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। এ বইয়ে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা পরিসর নেই। এটাই বিশেষভাবে জানতে হবে যে সকল স্তরের ভক্তদের শুচিতা একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বিষয়। চিত্ত-মল বিশোধিত হয়ে অন্তরের পূর্ণ নির্মলতা ও পবিত্রীকরণ ঘটে এই মহামন্ত্র কীর্তনে ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

বাহ্যিকভাবে, ভক্ত সর্বদাই তাঁর শরীর, পোশাকাদি বস্ত্র, তাঁর জিনিসপত্র বাসস্থান এবং ব্যবহার্য অন্যান্য সব কিছু সুন্দরভাবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবেন। ভক্তরা প্রতিদিন ভালভাবে ধোয়া পরিচ্ছন্ন কাপড় পরবেন এবং অন্ততঃ দিনে একবার স্নান করবেন।

প্রণাম নিবেদন

প্রণাম নিবেদন ভক্তিময় সেবা-চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ; প্রণাম নিবেদনের মাধ্যমে ভক্ত তার আত্মসমর্পণের মনোভাবকে দৃঢ়তর করেন। বস্তুতঃ প্রণামের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা পাত্র হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তগণ।

প্রণামের অনেক পদ্ধতি রয়েছে ঃ ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম নিবেদন করা যায়, আবার মাথা, হাত ও পায়ের নিম্নাংশ ভূমি স্পর্শ করেও প্রণাম করা যায়। প্রণাম-কালে নির্দিষ্ট কিছু প্রার্থনামন্ত্র শ্রবণযোগ্য করে উচ্চারণ করা উচিত। সবসময় প্রণম্য বিগ্রহকে বাঁদিকে রেখে প্রণাম নিবেদন করতে হয়।

মন্দিরে প্রবেশের সময় এবং মন্দির হতে বের হবার সময় বিগ্রহসমূহকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়। প্রণাম-সহ সমস্ত কিছুই

পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যম হচ্ছেন গুরুদেব। সেজন্য বিগ্রহগণকে প্রণাম নিবেদন করার সময় গুরুপ্রণাম মন্ত্র আবৃত্তি করতে হয়। (আরও তথ্যের জন্য 'গুরুদেব এবং দীক্ষা' অধ্যায় দেখুন)।

সকল ইসকন মন্দিরে একটি ব্যাসাসন রয়েছে, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আলেখ্যরূপ বা বিগ্রহরূপে অধিষ্ঠিত রয়েছে। যথার্থ প্রণাম বিধি হল ঃ মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম নিবেদন এবং তারপর অন্যান্য বিগ্রহগণকে এবং পরে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণাম নিবেদন। তুলসীদেবীকে প্রণামের সময় তুলসী প্রণাম মন্ত্র 'বৃন্দায়ৈ তুলসী দেব্যৈ'- উচ্চারণ করতে হয়। সাধারণতঃ তুলসী আরতীর সময় তুলসীদেবীকে প্রণাম নিবেদন করতে হয়, তবে অন্য সময়েও তা করা যেতে পারে।

বৈষ্ণব শিষ্টাচার অনুসারে ভক্তদেরকেও প্রণাম করতে হয়। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কেননা এটা আমাদের দ্রুত পারমার্থিক উন্নতিবিধানে এবং ভক্তদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক তৈরীতে সাহায্য করে।

নিজ গুরুদেবের আগমন ও প্রস্থানের সময় তাঁকে প্রণতি নিবেদন করা একটি অবশ্য পালনীয় বিধি। সন্ন্যাসীদেরকে অন্ততঃ দিনের প্রথম বার দর্শনের সময় প্রণাম করা কর্তব্য। সকল ভক্তগণকে, বিশেষতঃ প্রবীণ ভক্তদেরকে দিনের প্রথমবার দেখার পর প্রণাম করা খুব সুশোভন একটি অভ্যাস।

শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম নিবেদন করতে হয় তাঁর নামোল্লেখ-সমন্বিত বিশেষ প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করে। অন্যান্য সকল বৈষ্ণবগণকে নিম্নে প্রদত্ত প্রণাম মন্ত্রের দ্বারা প্রণাম করতে হয় ঃ

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

সকল ইসকন কেন্দ্রে প্রভাতে তুলসী আরতির পর সমবেত ভক্তগণ প্রণত হয়ে উক্ত প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক পরস্পরকে প্রণাম নিবেদন করেন।

সাধারণতঃ যখন কোন ভক্তকে প্রণাম করা হয়, তখন ভক্তটি প্রতিপ্রণাম করেন। অবশ্য ভক্তসমাজে প্রবীণেরা খুব নবীন কোন ভক্তকে প্রতি-প্রণাম নাও করতে পারেন। বরং তারা সেই ভক্তের পারমার্থিক উন্নতি কামনা করে তাঁকে আশীর্বাদ করতে পারেন। সন্ন্যাসীগণ এবং দীক্ষাদানকারী গুরুবর্গ এই রীতি অনুসরণ করে থাকেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ

প্রসাদ প্রস্তুতি, ভগবানকে তা নিবেদন এবং অবশেষে সেই কৃষ্ণপ্রসাদ ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ—পুরো বিষয়টি বৈষ্ণব সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে ভোজন করেন তা অবশ্য অভক্তদের বোধগম্য নয়, কেননা খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদনের পরও আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যেন তা স্পর্শ করা হয় নি। কিন্তু সত্যিই তিনি ভোজন করেন, আর ভক্তরা কেবল কৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পরমানন্দে ভোজন করে থাকেন।

প্রস্তুতকরণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাই ভোজন করেন, যা তাঁকে ভক্তি ও প্রীতি সহকারে নিবেদন করা হয়েছে। সেজন্য ভক্তেরা উত্তম ফলমূল, শাকসব্জী, শর্করা, শস্যাদি এবং দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ইত্যাদি সংগ্রহ করেন এবং গভীর যত্নে ও অভিনিবেশে তা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য সুন্দর সুস্বাদু আহার্য প্রস্তুত করেন।

মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুন, মাশরুম বা ছত্রাক, ভিনিগার এবং মুসুর ডাল শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা যায় না। অতিরিক্ত মশলা দেওয়া খাবারও নিবেদনযোগ্য নয়।

প্রসাদ প্রস্তুতিতে কেবল গরুর দুধ ব্যবহার করা যায়। কৃষ্ণের জন্য রান্নায় ঘি (কেবল গোদুগ্ধ-জাত) সর্বোত্তম। যারা ঘি সংগ্রহে সক্ষম নন, তারা তেল ব্যবহার করতে পারেন। নিয়মানুসারে তিল এবং সরিষার তেল ব্যবহার করা যায়। তবে সাধ্যে না কুলালে গৃহীভক্তরা বাদাম ইত্যাদিও ব্যবহার করতে পারেন। উচ্চমানের জিনিসের দাম অত্যন্ত বেশি, সেজন্য নিজ সামর্থ্য অনুসারে গৃহীভক্ত কৃষ্ণসেবায় যত্নপর হবেন।

ভোগসামগ্রী রন্ধনের সময়, কৃষ্ণ কেমন করে তা আস্বাদন করে আনন্দ উপভোগ করবেন—রন্ধনরত ভক্ত এই চিন্তায় নিরত থাকেন। সে-সময় ভক্ত নিজের, পরিবারের বা অন্য কোন ভক্তের কথা চিন্তা করেন না। ভোগসামগ্রী যাতে খুব পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার সাথে প্রস্তুত করা হয়, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। রাঁধুনী ভক্তসহ অন্য কেউ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনের পূর্বে কিছুই 'চেখে' দেখতে পারবেন না।

ভোগ নিবেদন

শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদনের জন্য একটি থালা ও গ্লাস নির্দিষ্ট রাখতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তৈরী খাদ্যসামগ্রী এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানীয় জলসহ ওই থালায় রাখতে হবে। দু'এক টুকরো লেবু (বীজ বেছে নিয়ে) একটু লবন সহ থালায় দিতে হবে। তরল খাদ্যদ্রব্য (যেমন দই) ও ব্যঞ্জনাদি কেবল ভোগ নিবেদনের উদ্দেশ্যে রাখা ছোট ছোট বাটিতে নিবেদন করা যেতে পারে। প্রতিটি পাত্রে একটি করে তুলসী পত্র দিতে হয়।

এবার বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যাদির পাত্র ও জলের গ্লাস-সহ থালাটি (পারশ) বেদীর সামনে রাখা চৌকির উপরে রাখতে হবে, আর বেদী না থাকলে কৃষ্ণের আলেখ্যের (চিত্রের) সামনে রাখতে হবে। আসন, ধূপ-দীপাদির ব্যবস্থা আগেই করে নিতে হবে। পূজাবেদীর সামনে বসে, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে এসব খাদ্যদ্রব্য উপভোগ করবেন তা স্মরণ করতে করতে ভক্ত ঘণ্টা বাজাবেন। সেই সাথে তিনি নিম্নলিখিত প্রার্থনামন্ত্র প্রতিটি তিনবার করে আবৃত্তি করবেন ঃ

১। নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

২। নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

৩। নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ্য হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

ভক্ত যদি ইতিমধ্যে ইসকনের কোন গুরুদেবের নিকট আনুষ্ঠানিক ভাবে আশ্রয় বা দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তিনি শ্রীল প্রভুপাদ প্রণাম মন্ত্র জপের পূর্বে নিজ গুরুদেবের প্রণাম মন্ত্র তিনবার জপ করে নেবেন।

ভক্ত ধ্যানের মাধ্যমে খাদ্যসামগ্রী গুরুদেবকে অর্পণ করেন, যিনি তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন। ভক্ত নিজেকে সরাসরি ভগবানকে কিছু নিবেদন করার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

এবার প্রণাম-পূর্বক বাইরে এসে দ্বার বন্ধ করে ১০-১৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়। এসময় দ্বারদেশে শ্রীগুরুদেব, মহাপ্রভু ও কৃষ্ণের স্তব বা প্রার্থনাদি করতে হয়; অসমর্থ হলে কেবল হরেকৃষ্ণ

মহামন্ত্র কীর্তন করুন। তারপর হাত-তালি দিয়ে দরজা খুলুন এবং দণ্ডবৎ প্রণামাদি-পূর্বক ভোগ তুলে নিন।

পারশটি (ভোগের থালা) নিয়ে এসে পাত্রের মহাপ্রসাদটুকু অন্যান্য অন্নব্যঞ্জনাদির সঙ্গে মিশিয়ে সব প্রসাদ করে নিতে পারেন, অথবা তা মহাপ্রসাদ বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট অন্য একটি পাত্রে নিয়ে সরাসরি বিতরণ করতে পারেন।

ভোগ নিবেদনের এই পন্থাটি অত্যন্ত সরল; কিন্তু প্রীতি সহকারে যদি নিবেদিত হয়, তাহলে কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক সবকিছুই গ্রহণ করে থাকেন।

ভোগ-সম্পর্কিত সংস্কৃত পরিভাষা

যে খাদ্যবস্তু ভগবানকে নিবেদনের জন্য প্রস্তুত, তাকে বলা হয় 'ভোগ', বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে—'নৈবেদ্য'। কৃষ্ণকে নিবেদিত খাবারকে বলা হয় 'প্রসাদ'। সরাসরি কৃষ্ণকে নিবেদন করার পর সেই নিবেদিত পাত্রের প্রসাদকে বলা হয় 'মহাপ্রসাদ'। আর একজন শুদ্ধভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদকে বলা হয় 'মহা-মহা-প্রসাদ'।

রান্না ও আহারের বাসনপত্র

আধুনিক ভারতে রান্নায় অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু এগুলি আসলে বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী; পাশ্চাত্য দেশসমূহে এগুলির ব্যবহার ক্রমশঃ নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভগবানের জন্য ভোগ রন্ধনে তাই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্র ব্যবহার করা যায় না।

বৈদিক সংস্কৃতিতে চীনামাটি, কাচ, অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিক নির্মিত বাসন-কোসন অত্যন্ত নিম্ন-মান বিশিষ্ট বলে গণ্য করা হয়। রূপা, পাথর এবং পিতলের তৈরী পাত্রাদিই ব্যবহারের উপযোগী।

স্টীলকে অশুদ্ধ বলে মনে করা হয়, কিন্তু এখন তা উচ্চবিত্তদের গৃহেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবচেয়ে ভাল বাসন হচ্ছে পাতার তৈরী থালা—একবার ব্যবহার করুন, তারপর ফেলে দিন।

প্রসাদ সেবন

প্রসাদ গ্রহণ কোন সাধারণ খাবার খাওয়া মাত্র নয়। সেজন্য আমরা বলি প্রসাদ 'সেবন', 'আহার' নয়। কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ একটি সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রসাদ মানেই হল কৃষ্ণকৃপা; কৃষ্ণ এতই কৃপালু যে এমনকি আহার্যের মাধ্যমেও তিনি আমাদের পারমার্থিক প্রগতিলাভে সাহায্য করেন। কৃষ্ণপ্রসাদ এবং স্বয়ং কৃষ্ণ অভিন্ন; সেজন্য যথোচিত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সাথে কৃষ্ণপ্রসাদ পরিবেশন ও সেবা করা উচিত।

প্রসাদ গ্রহণের পূর্বে ভক্তগণ "শরীর অবিদ্যাজাল....." পদটি গেয়ে থাকেন।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে, নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥

হে রাজন্, যারা স্বল্প পুণ্যবান তাদের মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে এবং বৈষ্ণবে বিশ্বাস জন্মায় না।

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তা'র মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে ॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ-অন্ন দিলা ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই ॥

ভক্তরা বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন—দাঁড়িয়ে নয়, কেননা দাঁড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণ কেবল সংস্কৃতি-বিরুদ্ধ নয়, তা অস্বাস্থ্যকরও বটে। পাতে দেওয়া সমস্ত প্রসাদটুকুই গ্রহণ করা উচিত। সাধারণ খাবারও ছুঁড়ে ফেলা পাপ, তাহলে কৃষ্ণপ্রসাদের কি কথা? সেজন্য পরিবেশকদের উচিত বারে বারে অল্প অল্প করে প্রসাদ পরিবেশন করা। বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে কখনও বাম হাতে প্রসাদ গ্রহণ করতে নেই। প্রসাদ সেবা করতে হয় পরম সন্তোষ ও পরিতৃপ্তি সহকারে, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে।

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্তশেষ হৈলে মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়।
পুনঃ সবশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন।

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩/৫৯-৬২)

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ন কৃষ্ণ নাহি পায়॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬/২২৭)

খাদ্য-খাবার এবং আহার-অভ্যাস

বেদে বলা হয়েছে ঃ "আহার শুদ্ধৌ সত্ত্ব-শুদ্ধি"। যদি কারও আহার শুদ্ধ হয়, তাহলে তার সমগ্র চেতনা শুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ঐতিহ্যগতভাবে যাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী ছিলেন, তাঁরা তাঁদের আহারের বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। কারণ, আহার্য যিনি রন্ধন বা প্রস্তুত করেন, তার চেতনা খাদ্যে সঞ্চারিত হয়। তাই ভক্তরা যদি এমন সব ব্যক্তির রান্না করা খাবার আহার করেন যাদের চিত্ত ও ব্যবহার দূষিত, তাহলে তাদের চেতনাও কলুষিত হয়ে পড়বে—অজান্তে রাঁধুনীর মানসিকতা আহারকারীদের চেতনায় সঞ্চারিত হবে। এই সঙ্গে রন্ধনকারীর পাপকর্মফলও ভোগ করতে হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন,

বিষয়ী অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ৬-২৭৮

সেজন্য ভক্তরা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণের অভ্যাস করেন।

প্রসাদ শুধু যে কর্ম ফলের বন্ধনমুক্ত করে তাই নয়, কৃষ্ণপ্রসাদ চেতনাকে কলুষমুক্ত ও বিশোধিত করে। কেননা, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তদের দ্বারা প্রেম ও ভক্তির সাথে সেই খাবার রান্না করা হয়েছে ও শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত হয়েছে। কৃষ্ণভক্তিতে দ্রুত উন্নতি সাধন করতে হলে আহারের ক্ষেত্রে কঠোরতার আবশ্যকতা রয়েছে। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে জীবনধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে সর্বদা কেবল কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

অবশ্য সব ভক্তের পক্ষে এমনটা করা সবসময় সম্ভব নাও হতে পারে। কোন কর্মব্যস্ত অবিবাহিত মানুষ, কিংবা যাকে প্রায়ই বাইরে ঘুরতে হয়, তারা অনেক সময় বাইরের খাবার কিনে খেতে বাধ্য হন। যদি খাবার কিনতেই হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল হচ্ছে ফল কেনা। দুধ ও দুধের তৈরী খাবারও (দই, মিষ্টি, পনির, ছানা ইত্যাদি) কেনা যেতে পারে; কারণ অভক্তদের দ্বারা তৈরী হলেও দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য সবসময় শুদ্ধ থাকে।

বাইরের রেস্তোঁরায় কোনরূপ আহার গ্রহণ ভক্তদের পক্ষে অনুচিত। বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি ভক্ত নিতান্তই কিছু খেতে বাধ্য হন, তাহলে তাঁর উচিত কোন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নিরামিষ রেস্তোঁরা (বা মিষ্টির দোকান) বেছে নেওয়া। খাবারে পেঁয়াজ রসুন যেন না থাকে সেটা দেখে নিতে হবে। মাংস আছে এমন রেস্তোঁরায় নিরামিষ খাদ্য গ্রহণও অনুচিত।

সম্প্রতি ভারতজুড়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে যে ডিম হল একটি নিরামিষ খাদ্য। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নিষিক্ত (fertilized) ডিম হল ভ্রূণ (যা আসলে তরল মাংস); আর অনিষিক্ত (unfertilized) ডিম হল মুরগীর রজঃস্রাব (mensturation)। শাস্ত্রে স্পষ্টতঃ-ই ডিমকে আমিষ খাদ্য বলা হয়েছে। সেজন্য তথাকথিত সব বিজ্ঞানী, রাজনীতিক বা ডিম বিক্রেতাগণের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

কর্মফলের নিয়ম অনুসারে অভক্তদের রান্না করা খাদ্যবস্তু বিশেষভাবে কলুষিত, কেননা, ভগবানে অর্পিত না হওয়ার জন্য তা আমাদের কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেজন্য তাদের তৈরী ভাত-রুটি মাঝে মধ্যে আহার করলে তা ভক্তিলাভের প্রতিবন্ধক হবে। তবে তা দোকানের অর্থকামী কর্মীদের তৈরী খাবারের মত অতটা ক্ষতিকর নয়। এরকম কর্মীদের তৈরী রুটি, বিস্কুট ইত্যাদি একেবারেই বর্জন করা উচিত, কেননা সে খাবার প্রগাঢ় কর্মের প্রভাব-আশ্লিষ্ট।

পেঁয়াজ ও রসুন আহার করা ভক্তদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এগুলো শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদনযোগ্য নয়। এগুলো আহার করলে জড়া প্রকৃতির নিকৃষ্টতমগুণ তমোগুণে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এমনকি চা কফির মত হাল্কা নেশাও বর্জনীয়, কেননা, এগুলি স্বাস্থ্যের প্রতিকূল, অপরিচ্ছন্নতাযুক্ত এবং অনাবশ্যক। এগুলো বদভ্যাস গড়ে তোলে। আর চা-কফি কখনো ভগবানকে নিবেদনও করা যায় না।

চক্‌লেটে ক্যাফিন থাকে, তাই এটিও এক ধরনের লঘু মাদকদ্রব্য। চক্‌লেট অস্বাস্থ্যকর, কারণ এতে রক্ত দূষিত হয় ও শরীরে কালো ছোপ পড়তে পারে; আর চক্‌লেট নিবেদনযোগ্যও নয়। কিছু ভক্ত অবশ্য চক্‌লেট খাওয়া যেতে পারে বলে মনে করেন, তবু এ-ব্যাপারে রক্ষণশীল হওয়াই ভাল। চক্‌লেট ছাড়াই আমরা বেঁচে থাকতে ও কৃষ্ণভাবনা অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে পারি। আর চক্‌লেটকে খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা তো কৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য নয়, কেবল আমাদেরই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য—তাই না!

অভক্তদের তৈরী বাজারে নিরামিষ খাদ্য-দ্রব্যাদি সম্পর্কে ভক্তদের খুব সতর্ক হওয়া উচিত। যেমন বাজারের রুটি, বিস্কুট, আইসক্রীম, টিনের খাবার ইত্যাদিতে প্রায়ই ডিম থেকে তৈরী একরকম উপাদান থাকে, কখনও বা গ্লিসারিন (যা জীবজন্তুর হাড় থেকে সংগৃহীত হয়) থাকে। কখনও কখনও খাবারের প্যাকেটের উপর লেখা উপাদানের তালিকা বিভিন্ন সব রাসায়নিক দ্রব্যের নাম লেখা থাকে। এসব খাবার নিরামিষ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে এগুলো এড়িয়ে চলাই ভাল।

আসল কথা হল, যেভাবেই হোক কেবলমাত্র কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করার নীতিতে অবিচলিত থাকতে হবে—সেটাই সর্বোত্তম। বর্তমান যুগের মানুষ রান্নার কাজে খুব অলস হয়ে পড়েছে; কিন্তু বাড়ীতে রান্না খাবার সর্বতোভাবে দৈহিক সুস্বাস্থ্যের সহায়ক, পারমার্থিক স্বাস্থ্যের তো কথাই নেই।

পবিত্র দ্রব্যাদির যত্ন গ্রহণ

পবিত্র দ্রব্যাদি, যেমন পারমার্থিক গ্রন্থাবলী, পূজার উপকরণসমূহ, জপমালা, মৃদঙ্গ, করতাল এবং ভগবান ও তাঁর শুদ্ধভক্তদের ছবি— সবই খুব সযত্নে ও সশ্রদ্ধভাবে রাখা কর্তব্য। এগুলো সবসময় পরিচ্ছন্নভাবে ভাল জায়গায় রাখতে হবে—কখনো কোন অপবিত্র স্থানে বা কোন অশুচি জিনিসের সংস্পর্শে এসব রাখতে নেই। ব্যবহারের পর এগুলি সুন্দর করে গুছিয়ে রাখতে হয়—এলোমেলো করে যেখানে সেখানে ফেলে রাখা উচিত নয়। আর কখনই এসব পবিত্র জিনিস মেঝের উপর রাখা ঠিক নয়, কেননা যে কেউ সেগুলো মাড়িয়ে ফেলতে পারে।

বৈষ্ণবোচিত মনোভাব

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীতে উক্ত তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যগুলির একটি রয়েছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর মুখবন্ধে ঃ "কৃষ্ণভক্তিতে প্রগতি নির্ভর করে ভক্তের ভক্তোচিত মনোভাবের উপর"।

কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব একটি অত্যন্ত বিস্তৃত বিষয়; তবে নবীন কৃষ্ণভক্তদের (এবং বস্তুতঃ সমস্ত ভক্তের) জন্য দুটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ ঃ দৈন্যতা এবং সেবার মনোভাব।

শ্রীল প্রভুপাদ লিখেছেন, "ক্রমশঃ বিনীত এবং আত্মসমর্পিত হয়ে ওঠার ভিত্তিতে ভক্তিযোগের সমগ্র পন্থাটি রচিত" (চৈঃ চঃ আদি ৭/১৪)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসিদ্ধ শিক্ষাসমূহের একটি হল, একজন বৈষ্ণব নিজেকে একটি তৃণের থেকেও সুনীচ বলে মনে

করবেন। এরকম উচ্চ-স্তরের বিনয় লাভ করা খুব দুরূহ, তবু প্রকৃত ভক্ত হবার অভিলাষে আমাদের তা লাভের জন্য চেষ্টাশীল থাকতে হবে।

কিন্তু প্রায়ই নবীন ভক্তরা তাদের পারমার্থিক প্রগতির মিথ্যা গর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়ে পড়ে। হয়ত ভাল ভজন গাইতে বা সুন্দর মৃদঙ্গ বাজাতে পারার জন্য, বা অনেক শ্লোক মুখস্ত থাকার জন্য, জাতিতে ব্রাহ্মণ হওয়া জন্য কিংবা উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য—অথবা অন্যান্য অনেক বোকামিপূর্ণ কারণে অনেক সময় নবীন ভক্তরা গর্বের মনোভাব পোষণ করতে থাকেন—তা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এরকম অহঙ্কার ভক্তের প্রকৃত পারমার্থিক উন্নতির অভাবেরই পরিচায়ক। প্রকৃতই যিনি কৃষ্ণভক্ত হতে অভিলাষী, তাঁকে তাঁর অন্তর হতে এসব অহংকার অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।

নূতন কৃষ্ণভাবনা গ্রহণকারীদের আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হল যথার্থ সেবার মনোভাবের অভাব। জড়জগতে অধঃপতিত জীবাত্মা হিসাবে আমরা সুদীর্ঘকাল জড়মায়ায় বদ্ধ হয়ে আছি, ফলে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কৃষ্ণভক্তির পন্থা গ্রহণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল আমাদের হৃদন্তঃস্থ সুপ্ত ভগবৎ সেবার প্রবণতা পুনর্জাগরিত করা। কৃষ্ণভক্তির অর্থই হল সেবা—অপ্রাকৃত প্রেমপূর্ণ সেবা—গুরুদেবের সেবা, বৈষ্ণবগণের সেবা, দিব্য ধামসমূহের সেবা এবং দিব্য নাম সমূহের সেবা। বস্তুতঃ স্বয়ং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের অর্থই হল ভগবান এবং তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির নিকট তাদের সেবায় নিযুক্ত হবার জন্য প্রার্থনা নিবেদন।

ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রত্যক্ষভাবে সেবা করার জন্য আমাদের সর্বদা তৎপর থাকা উচিত। মন্দির পরিস্কার করা হোক,

রান্নার জন্য শাকসব্জী বানানো হোক অথবা তাঁর মহিমা প্রচারই হোক—কৃষ্ণের জন্য সম্পাদিত সমস্ত সেবা কাজই অপ্রাকৃত এবং জড়কলুষ-নাশক। যে-ধরনের সেবাই আমাদের করতে বলা হোক, আমাদের তা অত্যন্ত সুচারুরূপে বিবেকবুদ্ধির সাথে সম্পন্ন করতে হবে। তাহলে আমরা দ্রুত কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতিসাধনে সক্ষম হব। অলসভাবে শৈথিল্যের সংগে কাজ করলে প্রত্যাশিত ফল লাভ করা অসম্ভব।

অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, ব্যক্তিগত যশ-প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি, বা আমাদেরকে একটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দানের জন্য এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নি। কোনরকম বাহ্যিক অভিলাষ-শূন্য হয়ে ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত একজন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আর এ-লক্ষ্যে দ্রুত উন্নতি লাভের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত তত্ত্বকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। যিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী নিয়মিত পাঠ করবেন এবং যথার্থ বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও সেবার মনোভাব নিয়ে ভক্তিযুক্ত সেবাচর্চায় নিয়োজিত হবেন, সেই ভক্তের মধ্যে এই তত্ত্ববোধ আপনাথেকেই উদিত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণনাম জপ

"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত' স্বভাব।
যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥"

"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই হচ্ছে স্বভাব—যেই তা জপ করে, তারই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাবের উদয় হয়।" (চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা ৭-৮৩)

প্রত্যেক নিষ্ঠাবান কৃষ্ণভক্তের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা একান্ত আবশ্যিক। এমনকি আমরা যদি অন্যান্য কর্তব্যকর্মে খুব ব্যস্তও থাকি, তাহলেও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের জন্য প্রতিদিন কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখতেই হবে।

জপমালাতে জপ করা সবচেয়ে ভাল, কেননা তাতে সংখ্যা রাখা খুব সহজ। বর্তমান যুগের শক্তিধর দিব্যনাম প্রচারক, ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ দীক্ষিত ভক্তদের অন্ততঃ ১৬ মালা জপ করার বিধান দিয়ে গিয়েছেন।

নবীন কৃষ্ণ ভক্তদের প্রতিদিন ১৬ মালা জপ প্রথমে হয়ত কঠিন মনে হতে পারে। তাঁরা প্রতিদিন আরো কমসংখ্যায় জপ শুরু করতে পারেন : আট, চার, দুই—অন্ততপক্ষে ১ মালা—সাধ্যানুসারে, তারপর ভালোভাবে অভ্যস্থ হবার সাথে সাথে জপ সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয়—যতদিন না প্রতিদিন ১৬ মালা সংখ্যায় না পৌঁছানো যায়।

প্রতিদিন জপের জন্য আপনি যে সংখ্যা স্থির করবেন, সেই সংখ্যাটি কখনো কমাবেন না। এবং দীক্ষা লাভের পর প্রতিদিন ১৬ মালার কম কখনো জপ করবেন না।

অবশ্য জপ করার অর্থ কেবল নির্দিষ্ট একটি সংখ্যা-পূরণমাত্র নয়। সঠিক নিয়মে জপ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। জপ করতে হয় স্পষ্টভাবে, অনুরাগ সহকারে, আর কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করতে করতে। সেইসাথে জপের সময় উচ্চারিত ভগবানের দিব্যনামসমূহ শ্রবণে মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হয়।

তুলসী কাঠ দিয়ে তৈরী জপমালাই সবচেয়ে ভাল। নিমকাঠ বেলকাঠ বা পদ্মফুলের বীজ দিয়ে তৈরী মালাও খুব জনপ্রিয়।

জপের সংখ্যা রাখার জন্য মালা ব্যবহার করা হয়। জপমালায় ১০৮টি গুটিকা রয়েছে, আরেকটি বড় গুটিকা রয়েছে, যাকে বলা হয় 'সুমেরু'।

জপমালাটি ডান হাতে নিয়ে তা বৃদ্ধাঙ্গুলি এবং মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যে ধরুন। তর্জনী ব্যবহার করতে নেই, এটি যথেষ্ট পবিত্র নয় বলে মনে করা হয়। সুমেরু গুটিকার পর যে মোটা দিকের গুটিকাগুলি রয়েছে, তার প্রথমটি ধরে জপ শুরু করুন। জপ শুরু করার আগে পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র জপ করে নিন ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনে অপরাধ হতে পারে—সেই অপরাধগুলি দশপ্রকার। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অষ্টম অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্ত-পার্ষদদের নামোচ্চারণ আমাদের নামাপরাধ থেকে মুক্ত করে।

এইবার প্রথম গুটিকা ধরে মহামন্ত্র জপ করুন ঃ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ তারপর দ্বিতীয় গুটিকা ধরুন। অনুরূপভাবে সম্পূর্ণ মহামন্ত্রটি আবার জপ করুন—তারপর পরের গুটিতে যান। এইভাবে প্রতিটি গুটিকায় পূর্ণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন। ১০৮ বার জপ করার পর আপনি 'সুমেরু গুটিকা'-য় পৌঁছবেন এবং তখন এক মালা (এক 'রাউণ্ড') জপ সম্পূর্ণ হবে। এইবার, 'সুমেরু গুটিকা'টি ডিঙিয়ে না গিয়ে মালাটি থলির মধ্যেই ঘুরিয়ে নিন এবং বিপরীত দিক (এবার সরু দিক) থেকে আবার একবার পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র উচ্চারণ করে তারপর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করুন।

জপ করা খুবই সহজ, কিন্তু সর্বোত্তম ফল পেতে হলে যথাযথভাবে জপ করা প্রয়োজন। মন্ত্রগুলি এমনভাবে উচ্চারণ করে জপ করবেন, যেন অন্ততঃ আপনার পাশের লোকটির পক্ষে তা শোনার মত হয়। জপ করার সময় মহামন্ত্র শ্রবণে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। এই মনঃসংযোগই হল মন্ত্রের মাধ্যমে ধ্যান, আর তা আমাদের হৃদয়কে কলুষমুক্ত করতে অত্যন্ত শক্তি সম্পন্ন। সদাচঞ্চল মনকে শান্ত করা খুব কঠিন, কিন্তু অন্য কিছুর চেয়ে অভ্যাসই সবচেয়ে ফলদায়ক, লক্ষ্য রাখবেন, দিব্যনামসমূহ যেন স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, যেন প্রতিটি নাম স্বতন্ত্র ও স্পষ্টভাবে শোনা যায়।

কিছু ভক্ত অসতর্কতাবশতঃ খারাপভাবে জপ করা অভ্যাস করে ফেলে—যেমন ঃ অস্পষ্টভাবে বা ফিস্‌ফিস্ করে মন্ত্রোচ্চারণ, শব্দ বা শব্দাংশ বাদ দেওয়া, জপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়া, জপ করতে করতে অন্য কাজ করা, জপের সময় কারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করা, বা জপ করতে করতে বই পড়া। আরেকটি খুব সাধারণ ভুল হল কিছু কিছু গুটিকায় পুরো মহামন্ত্র জপ না করে ডিঙিয়ে যাওয়া এবং এইভাবে ১০৮ বার জপ সম্পূর্ণ না করেই এক মালা পূর্ণ করা। জপের সময় অনুক্ষণ এসব বিষয়ে সতর্ক থাকলে দ্রুত উন্নতি লাভ সম্ভব।

নবীন কৃষ্ণভক্তদের প্রথম প্রথম মালাজপে বেশ দীর্ঘ সময় লাগে, অভ্যস্ত ভক্তদের ১৬ মালা জপ করতে সাধারণত দেড় থেকে দু'ঘণ্টা সময় লাগে (অর্থাৎ প্রতিমালা গড়ে পাঁচ থেকে আট মিনিট)। দ্রুত জপের চেয়ে সঠিক নিয়মে জপ দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক। সেজন্য প্রথমে স্পষ্টভাবে জপ করুন এবং সুন্দরভাবে নিজ-নিজ শ্রবণের প্রতি মনোনিবেশ করুন। যত জপ অভ্যাস

করতে থাকবেন, আপনা থেকেই জপের দ্রুততা বেড়ে যাবে। যদি কেউ পাঁচ মিনিটেই এক মালার বেশী জপ করে, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে এরকম ঃ (ক) ভক্তটি জপে যথাযথরূপে মনোনিবেশ করছে না, (খ) সে মন্ত্রের শব্দ বা শব্দাংশ অসতর্কতাবশতঃ বাদ দিয়ে যাচ্ছে, অথবা (গ) সে কিছু গুটিকা জপ না করে এড়িয়ে যাচ্ছে।

জপের জন্য সর্বোত্তম সময়টি হল ভোরবেলায় ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পুর্বের পবিত্র সময়ে। সর্বাবস্থায় জপ করা যেতে পারে—কর্মস্থলে যাবার সময় ট্রেনে বা রাস্তায় হাঁটার সময়েও। কিন্তু সবচেয়ে ভাল হবে পূর্ণ মনোযোগে আমাদের দৈনন্দিন বাঁধাধরা কাজকর্ম শুরু করার আগে ভোরবেলাতেই সম্পূর্ণ ১৬ মালা জপ করা।

জপমালাটি বিশেষভাবে তৈরী জপমালার থলির মধ্যে রাখলেই সবচেয়ে ভাল হয়। তর্জনী বাইরে রাখার জন্য থলির মধ্যে একটি বিশেষ ছিদ্র রয়েছে। নিয়ে বেড়ানোর সুবিধার জন্য এতে একটি ফিতে থাকে। ভক্তরা সর্বত্র মালা সঙ্গে নিয়ে চলেন—যাতে যেখানে হোক সময় পেলেই তারা জপ করতে পারেন। জপ মালা পরিচ্ছন্ন এবং শুদ্ধ রাখার জন্য সর্বদা যত্ন নিতে হবে। মালার থলি এবং মালা কখনো ছিঁড়তে নেই বা শৌচাগারে নিতে নেই।

হরিনাম সংকীর্তন

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"কলহ প্রবঞ্চনার যুগ এই কলিযুগে ভগবানের দিব্যনাম সমূহ কীর্তন করাই হল মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা। এছাড়া আর কোন পথ নেই, আর কোন পথ নেই, আর কোন পথ নেই" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
ইতি ষোড়শকম্ নাম্নাম্ কলি কল্মষনাশনম্।
নাতঃ পরতোরোপায় সর্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥

"এই বত্রিশ অক্ষর বিশিষ্ট ষোলটি নাম কলিযুগে কল্মষ নাশ করার একমাত্র উপায়। সমস্ত বেদেই ঘোষিত হয়েছে যে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন ব্যতীত অজ্ঞানতা-রূপ মহাসাগর অতিক্রম করার আর কোন উপায় নেই।" (কলিসন্তরণ উপনিষদ)

কলিযুগের যুগধর্ম হল হরির দিব্য নামসমূহ কীর্তন করা। এই কীর্তনের গুরুত্ব বর্ণনা কখনো অতিরঞ্জিত হয় না। —কীর্তনের ফল অসীম। প্রত্যেকেরই উচিত যত বেশী সম্ভব ভগবান শ্রীহরির দিব্যনামসমূহ কীর্তন করা।

কীর্তন করার দুটি পন্থা রয়েছে ঃ সরবে—সচরাচর মৃদঙ্গ এবং করতাল সহযোগে (একে বলা হয় কীর্তন) এবং "জপ", অর্থাৎ মৃদুস্বরে, প্রধানতঃ নিজে শোনার মত করে নামোচ্চারণ।

কীর্তন করা খুব সহজ। একদল ভক্তের মধ্যে একজন কীর্তন পরিচালনা করে। অর্থাৎ ভক্তটি প্রথমে গায়, পরে অন্যেরা একই সুরে তার অনুসরণ করে। কীর্তনের গানগুলি সাধারণতঃ খুবই সহজ-সরল হয়—যাতে সহজে সবাই গাইতে পারে।

মন্ত্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মহামন্ত্র ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সরলার্থ হল ঃ "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণের শক্তি (রাধিকা), কৃপাপূর্বক আমায় তোমাদের সেবায় নিয়োজিত কর।" 'হরে' হল কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি হরা (শ্রীমতী রাধারাণী)। 'কৃষ্ণ' এবং 'রাম' হল সর্বাকর্ষক, সর্ব আনন্দের আধার পরমেশ্বর ভগবানের মুখ্য নাম।

কীর্তনের সময় প্রধানতঃ এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে—সেটাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ। অবশ্য এই মহামন্ত্রটি কীর্তনের পূর্বে আমাদের উচিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র এবং পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র কীর্তন করে নেওয়া। পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র হল ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পূর্বে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁর পার্ষদগণের কৃপালাভ করার জন্য এই পঞ্চতত্ত্ব মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়, আর তাঁদের কৃপা নিরপরাধে হরেকৃষ্ণ কীর্তনে আমাদের সাহায্য করে।

মহান ভক্তদের দ্বারা রচিত আরও অনেক প্রামাণিক ভজনগীতি রয়েছে, যেগুলি গাওয়া যেতে পারে। এইসব ভজন গীতিগুলি ভগবদ্ভক্তি বিকাশে সাহায্য করে। অন্ততঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈষ্ণব ভজন শিখে নেওয়া ভক্তের পক্ষে ভাল—বিশেষতঃ যে সব গীতিগুলি "ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন" গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

শুদ্ধ ভক্তদের নিকট থেকে শ্রবণ

নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় ।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥

"সকল জীবসত্তার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম নিত্যকাল ধরে বিদ্যমান রয়েছে। এমন নয় যে এটি অন্য কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করতে হবে। শ্রবণ কীর্তনের প্রভাবে হৃদয় যখন বিশোধিত হয়, তখন সেই সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়"। (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২-১০৭)

শাস্ত্রে এরকম বহু শ্লোকে উন্নত ভক্তদের নিকট থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

যারা ইসকন কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি বাস করেন, তারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় মন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত এবং ভগবদ্‌গীতার ক্লাস গুলিতে যোগ দেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

এছাড়া, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কয়েকশো রেকর্ড করা ভাষণও ভক্তরা শ্রবণ করতে পারেন। কৃষ্ণের একজন শুদ্ধ ভক্তের কণ্ঠ থেকে অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ শ্রবণ করার মত কল্যাণকর আর কিছুই থাকতে পারে না (এই সমস্ত ভাষণ-সহ শ্রীল প্রভুপাদের আরও অনেক ভজন কীর্তনের ক্যাসেট BBT, Hare Krishna Land, Bombay 400049 থেকে পাওয়া যাবে। অথবা আপনি আপনার নিকটতম ইসকন কেন্দ্রেও যোগাযোগ করতে পারেন)।

নবীন কৃষ্ণভক্তগণ ব্যক্তিগত পরামর্শের জন্য ইসকনের অভিজ্ঞ ভক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বিশেষতঃ প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন হয়। বৈষ্ণব ভাবধারা ও আচরণে অভ্যস্ত হতে কিছু ভক্তের পক্ষে প্রথমে একটু কঠিন মনে হতে পারে। প্রত্যেকের আবার নিজস্ব কিছু সংশয় সন্দেহ, সমস্যা ইত্যাদি থাকে। সেজন্য, লজ্জা না করে উন্নত ভক্তদের সাহায্য নিতে হয়। তাদের কাজই হল এই ঃ কনিষ্ঠ ভক্তদের সাহায্য করা।

যথার্থ শুদ্ধ ভক্তদের নিকট থেকে শ্রবণ করলে যেমন হৃদয় নির্মল হয়, তেমনি মায়াবাদী, কপটভক্ত, জড়জাগতিক পণ্ডিত, পেশাদার ভাগবত পাঠক এবং অন্যান্য শ্রেণীর অভক্তদের কাছ থেকে শ্রবণ করলে চিত্ত কলুষিত হয়। হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে তাদের

কথাকে 'সর্পের জিহ্বা-স্পৃষ্ট দুধের' সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দুধ খুব সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর, কিন্তু একটি সাপ যদি সেই দুধ পান করে, তবে তা বিষে পরিণত হয়। এটি দেখতে একরকম মনে হতে পরে, কিন্তু ওই দুধ এখন বিষ। ঠিক তেমনি কৃষ্ণসম্বন্ধীয় ভাষণ, নাটক, সংগীতাদিও যদি যথার্থ শুদ্ধ ভক্তদের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়, তাহলে তা আমাদের পারমার্থিক জীবনে চরম সর্বনাশের সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে ভক্তদেরকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

সর্বদেশ কাল দশায় জনের কর্তব্য ।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫/১২২)

দিব্য কৃষ্ণগ্রন্থাবলী পাঠ

পাঠ হল শ্রবণের একটি অঙ্গবিশেষ; এই পন্থায় একজন অপরজনের নিকট হতে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। বৈষ্ণব সাহিত্যের এক অত্যন্ত মূল্যবান সমৃদ্ধ ভাণ্ডার রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। যদিও শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত উপস্থিতি হতে আমরা এখন বঞ্চিত, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই তাঁর অপ্রাকৃত গ্রন্থগুলি পাঠের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গলাভ করতে পারি। বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব-সমূহকে আধুনিক মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে প্রাঞ্জলভাবে ইংরাজী ভাষায় তিনি উপস্থাপন করেছেন। এজন্য শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন বিশেষভাবে কৃষ্ণকৃপাশক্তিপ্রাপ্ত।

কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণালাভ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি পাঠ করা। পূর্ণরূপে

কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার পন্থা অবগত হবার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই শ্রীল প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থাবলীতে রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে, যে-সমস্ত গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সবই বাংলায় পুনরনুদিত হয়েছে)। এগুলি গভীর দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ গ্রন্থ।

কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রাথমিক শিক্ষার্থী এই সমস্ত প্রারম্ভিক গ্রন্থগুলি দিয়ে অপ্রাকৃত সাহিত্যপাঠ শুরু করতে পারেন ঃ কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার, হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ, আদর্শ প্রশ্ন এবং আদর্শ উত্তর, লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, এবং আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা। সর্বস্তরের ভক্তের জন্য আরেকটি চমৎকার গ্রন্থ হল সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী রচিত শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত (শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী)। পূর্ণ ছয় খণ্ডের জীবনী (ইংরাজী) বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (বাংলা)—দুটিতেই খুব সহজ-সরলভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত তত্ত্বকে একজন শুদ্ধ ভক্তের অত্যন্ত সুপাঠ্য জীবনকাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভক্ত যখন আরেকটু গভীর গ্রন্থ পাঠের জন্য প্রস্তুত হন, তখন প্রথমে তাঁর এই গ্রন্থগুলি পাঠ করা উচিত ঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, ঈশোপনিষদ, কপিল শিক্ষামৃত এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অন্ততঃ দুবার পুরোপুরি পাঠ করলে সবচেয়ে ভাল হবে। এরপর তাঁকে পাঠ করতে হবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। শ্রীল প্রভুপাদ এ-গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "মানব সমাজে আমাদের সর্বোত্তম অবদান"।

এরপর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করুন। দ্বাদশ স্কন্ধ-বিশিষ্ট ভাগবত ১৮টি খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। গ্রন্থটি ভক্তি, অপ্রাকৃত জ্ঞান এবং বৈদিক সংস্কৃতির এক অমূল্য ভাণ্ডার-স্বরূপ—যেন এক অপূর্ব পারমার্থিক বিশ্বকোষ। গ্রন্থটি প্রথম থেকে পাঠ করতে হয়, এবং প্রতিদিন অল্প করে নিয়মিত পাঠের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমগ্র গ্রন্থটি সমাপন করা উচিত। এরপর পাঠ করুন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত—এটিও একটি বহুখণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ যাতে বিশদে ও আনন্দদায়কভাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের অনবদ্য লীলা ও দর্শনতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে।

এমনকি শ্রীমদ্ভাগবত বা অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাঠের সময়েও প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ অন্ততঃ অল্প করেও পাঠ করা খুব ভাল। আরও অনেক বিশুদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী রয়েছে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত চিন্ময় গ্রন্থাবলীই আজকের যুগে সবচেয়ে উপযোগী।

প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এই সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্য সমূহ পাঠ করা সকল ভক্তবৃন্দের জন্যই একান্ত প্রয়োজন। দু'ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অথবা অন্ততঃ আধঘণ্টা প্রতিদিন পাঠ করুন। অন্যসব ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলনের মতই গ্রন্থপাঠও করা উচিত গভীর মনোযোগে এবং শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে। পাঠের সময় গুরুদেব এবং কৃষ্ণের কাছে শাস্ত্রে সুমহান বিষয়গুলি উপলব্ধি করার জন্য কৃপা প্রার্থনা করতে হয়। যেসব সৌভাগ্যবান মানুষের এইসব অমৃতময় চিন্ময় সাহিত্যসম্ভার পাঠের প্রতি আসক্তি জন্মে, তারা কখনো জড়বিষয়াসক্ত লেখকদের পুঁতিগন্ধময় আবর্জনাস্বরূপ জড়ীয় সাহিত্যে আকৃষ্ট হয় না। তাদের জ্ঞান এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমল প্রেম-সঞ্জাত আনন্দ-স্বাদ দিন দিন বর্ধিত হতে থাকে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)
গীতার গান
গীতার রহস্য
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
দেবহূতি নন্দন কপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার
ঈশোপনিষদ
যোগসিদ্ধি
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
বৈদিক সাম্যবাদ
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
ঈশ্বরের সন্ধানে
জ্ঞানকথা
ভক্তিরত্নাবলী
ভক্তিবেদান্ত রত্নাবলী
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
বৈষ্ণব কে?
বৈষ্ণব শ্লোকাবলী
ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন
প্রভুপাদ
পাশ্চাত্যে কৃষ্ণভক্তির প্রচার
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি
পরম সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ
কৃষ্ণভক্তি প্রচারই প্রকৃত পরোপকার
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা মাহাত্ম্য
একাদশী মাহাত্ম্য
পঞ্চরাত্র প্রদীপ
হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ
শ্রীমায়াপুর দর্শন
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ

শাস্ত্রসমূহে পুনঃপুন সাধুসঙ্গ করার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। শুদ্ধভক্ত সঙ্গ-প্রভাবেই ভক্তি পুষ্টিলাভ করে ও বিকশিত হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন ঃ

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

"কৃষ্ণভক্তির মূল কারণ সাধুসঙ্গ। এমনকি যখন সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়, তখন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজন।" (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২২-৮৩)

শুদ্ধ ভক্তগণের সঙ্গ করার দুটি প্রাথমিক পন্থা হল : তাদের নিকট থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা এবং তাদের সেবা করা। যেসব ভক্ত ইসকনে থাকেন, বা কোন ইসকন কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকেন, তারা সহজেই এই সুযোগ লাভ করতে পারেন। সর্বদা সেইসব ভক্তদের সঙ্গ করার চেষ্টা করুন, কৃষ্ণভক্তিতে সদা-তৎপর ও গভীরভাবে নিষ্ঠাপরায়ণ।

যাঁরা ইসকন কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে থাকেন, তাঁরা যত ঘন ঘন সম্ভব সেসব কেন্দ্রে গিয়ে ভক্তসঙ্গ করতে পারেন। তাঁরা ভক্তদের সঙ্গে পত্রবিনিময়ও করতে পারেন। এ-ব্যাপারটি সর্বদা হৃদয়ে জানাতে হবে যে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে এবং তাঁর সেবা করে (বিশেষতঃ তাঁর গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে) শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভ করা যায়। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদা তাঁর ভক্ত অনুগামীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন; শ্রীল প্রভুপাদের সাহচর্য লাভে ধন্য তাঁর সেইসব শিষ্য-প্রশিষ্যগণের সঙ্গলাভে আমাদের কখনই অবহেলা করা উচিত নয়।

এমন হতেই পারে যে, কৃষ্ণভক্তিতে আকৃষ্ট এমন অনেকে আপনার কাছাকাছিই রয়েছে, কিন্তু আপনি তাদের কথা জানেন না। যদি তেমন হয়; সম্ভবতঃ আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রের ভক্তরা তা জানেন, এবং তারা আপনার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন। তাহলে আপনি তাদের নিয়ে কীর্তন, আলোচনা

উৎসবাদি-সহ অন্যান্য অনুষ্ঠান করতে পারেন। আপনি যদি আপনার এলাকায় শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করেন, তাহলে এটা প্রায় নিশ্চিত যে ঘটনাক্রমে আপনি এমন কারও দেখা পাবেন যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী। সেজন্য, যদি আপনি কোন সঙ্গ না পান, তাহলে অবিলম্বে গ্রন্থবিতরণে বেরিয়ে পড়ুন নিশ্চয় কাউকে পেয়ে যাবেন।

বৈদিক ঐতিহ্য অনুসারে গৃহীরা সন্ন্যাসী এবং সাধু-ভক্ত-ব্রাহ্মণদের স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে থাকেন। তারা গৃহে আগত সাধু বৈষ্ণবকে উত্তম প্রসাদ ভোজন করান, তাঁদের নিকট থেকে ভগবৎ কথা শ্রবণ করেন ও সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তাঁদের সঙ্গে হরেকৃষ্ণ কীর্তন করেন এবং সর্বোপায়ে তাদের সেবা করেন। এই ধরনের সাধুসঙ্গ আনন্দদায়ক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্যই তা অত্যন্ত কল্যাণকর।

সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য

"শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর উপদেশ দিয়েছেন—'সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য'। অর্থাৎ পারমার্থিক জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য সাধু, শাস্ত্র এবং সদ্‌গুরুর শিক্ষানির্দেশ একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা কর্তব্য। সাধু বা সদ্‌গুরু—কেউই শাস্ত্র সমূহের অনুমোদন ব্যতীত কিছু বলেন না। সদ্‌গুরু এবং সাধুর বাণী তাই সর্বদা শাস্ত্রানুগ হয়ে থাকে। তত্ত্বোপলব্ধির এইসব উৎসগুলির সঙ্গে তাই সঙ্গতি রক্ষা করে ভগবদ্ভক্তি লাভে ব্রতী হওয়া উচিত।" —প্রভুপাদ সম্পাদিত চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪-৮, তাৎপর্য।

কৃষ্ণভক্তির দর্শন এবং অনুশীলন পদ্ধতি গুরু, সাধু এবং শাস্ত্র দ্বারা প্রদর্শিত হয়েছে। শাস্ত্র হচ্ছে ভগবানের বাণী বা ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন এমন শুদ্ধ ভক্তদের বাণী (সমভাবে প্রামাণিক)। সাধুরা কঠোরভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করেন, কিন্তু কেবল সেই সমস্ত শাস্ত্রকেই যথার্থ প্রামাণিক বলে জানতে হবে যেগুলি মহান বৈষ্ণব আচার্যগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

যা প্রকৃত, খাঁটি, তা নিয়ে খেয়ালখুশিমত কিছু করা চলে না। পরম সত্য আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ভাসিয়ে তোলা কিছু জল্পনা-কল্পনার বিষয় নয়। কৃষ্ণভাবনামৃত হল পরমতত্ত্ব; তা নিত্য শাশ্বত ভগবদ্ভক্তির পন্থার মাধ্যমে পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মা, নারদ, শিব-সহ সকল মহান সাধকগণ এবং মহাজনগণ দ্বারা এই পন্থা স্বীকৃত হয়েছে। এমনকি আজও অবিচ্ছিন্ন গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে সেই পন্থা বিদ্যমান রয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায় যে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে অনেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং ভক্তদের দেখে নিজেরা ভক্তিচর্চার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভক্তসঙ্গ ও যথাযথ পরামর্শের অভাবে প্রায়ই তাঁরা খুব বেশি উন্নতিলাভ করতে পারেন না। তাঁদের কৃষ্ণভাবনামৃত উপলব্ধি ও অনুশীলন প্রায়ই ভুল পথে ধাবিত হয়। অজ্ঞতা এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির সংগে নিজের কল্পিত ধারনা মিশিয়ে ফেলার প্রবণতাই এর কারণ।

এক অর্থে, যেভাবেই হোক কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন শুরু করে দেওয়া খুব ভাল। কিন্তু ভক্তিযুক্ত সেবায় যদি সত্যিকার সাফল্য লাভ করতে হয়, তাহলে অবশ্যই প্রামাণিক পন্থা-পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। এজন্য বিনীতভাবে একজন সদ্‌গুরুর পরামর্শ গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। কেবল বাহ্যিকভাবে কিছু ভক্তিচর্চা করে নিজেকে ধার্মিক মনে করাটাই যথেষ্ট নয়।

যাঁরা ভক্তি চর্চা করতে ইচ্ছুক অথচ কারও ব্যক্তিগত সাহায্য নিতে পারছেন না, এই বইটি যথাযথভাবে আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনে তাদের সাহায্য করবে। নবীন ভক্তরা যাতে অযথা ভক্তিপথে বিভ্রান্ত না হয়ে পড়েন সে ব্যাপারে বইটি তাদের সাহায্য করতে পারে। কারণ বইটি গুরু-সাধু-শাস্ত্র-নির্দেশের অভ্রান্ত ভিত্তির উপর রচিত। অন্ততঃ কিভাবে তিলক ধারণ, বা সংকীর্তন করতে হবে—সে সবের যথাযথ নির্দেশ এখানে রয়েছে। কিন্তু একজন সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা লাভ করা, প্রয়োজনীয় সবকিছু শিখে নেওয়া এবং বিনম্রচিত্তে তাঁর সেবা করা একান্তই প্রয়োজন।

গুরু ক�ৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

(চৈঃ চঃ আদিঃ ১/৪৫)

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতিজ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কৈল বেদ-পুরাণ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০/১২২)

শ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ অবদান

"প্রভুপাদ"—এই অত্যন্ত সম্মানসূচক অভিধাটি কেবল সেই সব সুমহান বৈষ্ণব গুরুবর্গের প্রতি প্রযোজ্য, যাঁরা পারমার্থিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বা বিশ্বে প্রচারের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ প্রমুখ মহান আচার্যের নাম উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য। যখন ইসকনের সদস্যগণ "শ্রীল প্রভুপাদ" কথাটি বলেন তখন তাঁরা কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ

ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-কে বোঝান, কারণ সমগ্র বিশ্বের ধর্ম-জগতের ইতিহাসে তিনি এক তুলনারহিত স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে (১-৫-১১) ব্যাসদেব উল্লেখ করেছেন যে শ্রীমদ্ভাগবত "এই জগতের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করবে।" তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছেন যে ব্যাসদেবের এই বিবৃতি অবশ্যই শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রতি প্রযোজ্য। ব্যাসদেব তাঁর শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করার পাঁচ হাজার বছর পর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য রচনা করেছেন, যা অচিরেই জড়বাদের অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত সমগ্র মানবসমাজের পারমার্থিক চেতনার বৈপ্লবিক পুনর্জাগরণ ঘটাবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁর দিব্য নাম সারা পৃথিবীর প্রতি নগরে ও গ্রামে প্রচারিত হবে। মহান বৈষ্ণব আচার্যগণও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে কলিযুগের প্রগাঢ় আঁধারের মধ্যেও কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার দশ হাজার বছর স্থায়ী উজ্জ্বল এক স্বর্ণ যুগের সূচনা করবে। চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে গ্রন্থকার লোচন দাস ঠাকুরও পূর্বাভাস দিয়েছিলেন সে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করার জন্য একজন 'সেনাপতি' ভক্তের আবির্ভাব হবে। সারা পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের সেই বিশেষ গোপনীয় কাজটির ভার কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের উপর অর্পিত হয়েছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, যদি কেউ কৃষ্ণকর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত না হন, তাহলে তিনি কখনই মানুষের অন্তরে কৃষ্ণভাবনা জাগরিত করতে পারেন না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত একজন মহান বৈষ্ণব আচার্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, "খুব শীঘ্রই একজন মহান পুরুষের আবির্ভাব হবে, যিনি বিশ্বে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করবেন।" স্পষ্টতঃই সেই ব্যক্তি হচ্ছেন কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, একজন বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতার স্তর অনুধাবন করা যেতে পারে কতসংখ্যক অভক্ত মানুষকে তিনি বৈষ্ণবে রূপান্তরিত করতে পারেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে। একজন খুব উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষকেও কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করানো খুবই দুরূহ। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণপ্রদত্ত শক্তিতে এমনই শক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে, তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভাবনাশূন্য মানুষের কাছে গিয়েছিলেন—পাশ্চাত্যদেশের ভোগবাদী যুবসম্প্রদায়—অথচ তাদেরই সহস্র সহস্রকে তিনি ভক্তে পরিণত করেছেন। কেউই শ্রীল প্রভুপাদের এই অসাধারণ কর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ নয়। একাকী তিনি গিয়েছিলেন সেই সব জনসাধারণের মধ্যে যাদের কোন বৈদিক-সংস্কৃতি-সদাচারের ধারণামাত্র ছিল না; তারা এমন একটি সমাজে বেড়ে উঠেছিল যে-সমাজ প্রবলভাবে মাংসাহার, অবাধ যৌনাচার, দ্যূতক্রীড়া এবং মাদকাসক্তিতে প্রমত্ত। এমনকি, একজন সাধুর সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হয়, সে-সম্পর্কে কোন ধারণাও তাদের ছিল না। পারমার্থিক জীবনচর্যায় প্রবেশ করার জন্য তাঁরা ছিল একেবারেই অযোগ্য।

তাদের কাছে কেবল যাওয়াই নয়, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁদের অনেককে ধীরে ধীরে শিক্ষা দিয়ে এমনভাবে গড়ে তুলেছিলেন যে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁরা প্রথম শ্রেণীর বৈষ্ণব এবং প্রচারক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন এবং তাঁরা অন্যদেরকেও কৃষ্ণভক্তি শিক্ষাদানে সমর্থ।

ভারতে বহু বৈষ্ণব ছিলেন যাঁরা তত্ত্বজ্ঞ, বৈরাগ্যবান এবং নিষ্ঠাপরায়ণ। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য কেবল শ্রীল প্রভুপাদই উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন। কৃষ্ণের দিব্যনামে, তাঁর গুরুমহারাজের আদেশে এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষায় কেবল তাঁরই পর্যাপ্ত বিশ্বাস ছিল। তাঁর সেই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই তিনি ভারতের বাইরে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য গুরুতর প্রয়াস করেছিলেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী যাঁদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সেই তাদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার মত যথেষ্ট করুণা ও দূরদৃষ্টি কেবল তাঁরই ছিল। শ্রীকৃষ্ণের সর্বোচ্চ অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে কেবলমাত্র যেকোন একজনের এইরকম এক অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসে এক অদ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত হয়েছেন।

আধুনিক বিশ্বের পক্ষে উপযোগী করে কৃষ্ণভাবনামৃতকে বাস্তবসম্মত, সরল ও অকৃত্রিমরূপে উপস্থাপন করার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত। তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের শিক্ষা-সমূহকে বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন করেননি বা এক্ষেত্রে কোনরকম আপস করেননি; কিন্তু তা না করেও, এর গূঢ় সত্যসমূহকেও তিনি এমন সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করেছেন যে একজন সাধারণ লোক এবং একজন বিদ্বান—উভয়েই তা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানেই ইসকনের উন্নতি ও প্রসার ঘটেছে। তিনি স্বয়ং কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করেছেন, যা ইসকনের অব্যাহত প্রসারের ভিত্তি। মূলতঃ সেই কার্যপ্রণালী হল ঃ অপ্রাকৃত গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও বিতরণ, বৈদিক কৃষিখামার-ভিত্তিক সমাজ, গুরুকুলসমূহ, বিজ্ঞানীদের এবং বিদ্বাৎসমাজের কাছে প্রচার ইত্যাদি।

শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণভক্তির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে নিজে বিস্তারিত নির্দেশ দান করেছেন ঃ কিভাবে বিগ্রহসেবা করতে হবে, কিভাবে ভজন করতে হবে, কেমন করে প্রচার করতে হবে, কৃষ্ণের জন্য কেমন করে রান্না করতে হবে, কিভাবে মন্ত্র জপ-কীর্তন করতে হবে—এরকম সবকিছু। সেইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। আমাদের ইসকনে সে নীতিনিয়ম, শিক্ষা-বিধি অনুসৃত হয়, তা তাঁর কাছ থেকেই লব্ধ। সেজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই ইসকনের প্রধান শিক্ষাগুরু ও আচার্য হিসাবে বিদ্যমান থাকবেন।

কৃষ্ণভক্তি লাভের বিভিন্ন পন্থা শাস্ত্র ও বৈষ্ণব ধারায় রয়েছে; কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগামীগণ তাঁর প্রদর্শিত পন্থাতেই কৃষ্ণভাবনামৃত অবলম্বন করে থাকেন—এই জেনে যে, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেব এবং পূর্বতন আচার্যদের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে কালের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী করে কৃষ্ণভাবনামৃতকে উপস্থাপন করেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অভূতপূর্ব সাফল্যই একটি প্রমাণ যে তাঁর প্রচার-প্রচেষ্টা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিত, পরিচালিত এবং তাঁর কৃপাশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ এমন কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, যা দীক্ষিত ভক্তদের মেনে চলা অত্যন্ত আবশ্যিক—যদি তাঁরা নিজেদেরকে শ্রীল প্রভুপাদের একনিষ্ঠ অনুগামী বলে পরিচয় দিতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শ্রীল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন যে দীক্ষিত ভক্তরা ভোর চারটেয় উঠবে, মঙ্গল আরতিতে যোগ দেবে, প্রতিদিন অন্ততঃ ১৬মালা মহামন্ত্র জপ করবে এবং চারটি বিধিনিয়ম দৃঢ়নিষ্ঠার সংগে পালন করবে।

শ্রীল প্রভুপাদ এইরকম সমস্ত বিধিনিয়মের স্পষ্ট ব্যাখ্যা দান করেছিলেন এবং এগুলিই ইসকনে অনুসরণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের একজন যথার্থ অনুগামী ভক্ত হতে হলে তাঁকে অবশ্যই এই সব বিধিনিয়ম এবং কার্যসূচীর ব্যাখা দিতে বা পরিবর্তন করতে চান না, বিনা প্রশ্নে তিনি সেগুলিকে গ্রহণ করেন; কেননা, তিনি জানেন যে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের যা দিয়েছেন তা সমগ্র মানব সমাজের পারমার্থিক জাগরণ ঘটানোর জন্য সম্পূর্ণ নিখুঁত, ও কোনরূপ দোষ-ত্রুটি-সীমাবদ্ধতা-বিহীন পন্থা—শুধু বর্তমানের জন্যই নয়, আগামী দশ হাজার বছরের জন্য।

ইসকন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ বা ইসকন (ISKCON-International Society for Krishna Consciousness) ১৯৬৬-তে নিউইয়র্কে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দ্রুত সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করে ঃ প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই ইসকন কয়েকশত মন্দির, আশ্রম বৈদিক কৃষিখামার-ভিত্তিক সমাজ এবং গুরুকুল আশ্রম সমন্বিত এক বিশ্বব্যাপী সংঘে পরিণত হয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হতে গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতমের শাশ্বত জ্ঞান ও শিক্ষাসমূহের ভিত্তিতে ইসকন গঠিত। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জগদ্বাসীকে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পৃথিবীর সমস্ত নগরাদি গ্রামে দিব্যনাম পরিব্যাপ্ত হবে—শ্রীচৈতন্যদেবের এই অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে ইসকন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসকন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি অংশ বিশেষ। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ব্রহ্মা, তারপর পরম্পরাক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব এবং তৎপরবর্তী গুরু পরম্পরাক্রমে শ্রীল প্রভুপাদ—এই অধ্যাত্ম পরম্পরায় ইসকনের উদ্ভব। এই পরম্পরা ধারা ইসকনের প্রামাণিকতার এক অন্যতম নিদর্শন।

শ্রীল প্রভুপাদ ইসকন স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যাতে সংঘে যোগদানকারী প্রত্যেকেই পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পেতে পারে। ইসকনের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট ঐকান্তিক আশ্রয় গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তিই পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হবার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা সংঘ থেকে প্রাপ্ত হবেন।

কাজের সুবিধার জন্য ইসকন সারা পৃথিবীকে বিভিন্ন অঞ্চলে (বর্তমানে প্রায় ৩০টি অঞ্চল) ভাগ করে নিয়েছে। প্রতিটি অঞ্চল একজন অভিজ্ঞ ভক্তের তত্ত্বাবধানে থাকে। এই পদটিকে বলা হয় গভর্নিং বডি কমিশনার বা জি.বি.সি.। কিছু কিছু অঞ্চলে দুই বা ততোধিক সহকারী জি.বি.সি. সদস্য রয়েছে। সমস্ত অঞ্চলের সকল জি.বি.সি. সদস্যদের নিয়ে গঠিত জি.বি.সি. বডি-ই হল ইসকনের সর্বোচ্চ পরিচালন কর্তৃপক্ষ। প্রতিবছর একবার বিশ্ব মুখ্যকেন্দ্র শ্রীমায়াপুরে জি.বি.সি. বডি-র সকল সদস্যবর্গ সংঘের কার্যাবলীর পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য মিলিত হন। ভোটের ভিত্তিতে জি.বি.সি. বডিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রত্যেক জি.বি.সি. অঞ্চলে কিছু-সংখ্যক মন্দির থাকে। প্রতিটি মন্দির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভর। তাই বস্তুতঃ ইসকনের কোন প্রধান কার্যালয় নেই, যদিও শ্রীমায়াপুরকে বিশ্বের প্রধান পারমার্থিক কেন্দ্র রূপে গণ্য করা হয়।

প্রত্যেক মন্দিরে একজন অধ্যক্ষ (টেম্পল্ প্রেসিডেণ্ট থাকেন। মন্দিরের অধ্যক্ষ হলেন মন্দিরের প্রধান কর্মকর্তা। জি.বি.সি. কর্মাধ্যক্ষ নিয়মিত তাঁর নিজ অঞ্চলের মন্দির-সমূহ পরিদর্শন করেন এবং মন্দিরে নির্দিষ্ট পারমার্থিক মান রক্ষিত এবং বিধি-বিধান সমূহ পালিত হচ্ছে কিনা, মন্দির পরিচালনা ও উন্নয়ন-কাজ সুন্দরভাবে চলছে কিনা ইত্যাদি তিনি পর্যবেক্ষণ করেন ও প্রয়োজনে সহায়তা করেন। এছাড়া তিনি প্রচার কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে জি.বি.সি. কার্য্যাধ্যক্ষদের হতে হবে "পাহারাদার কুকুর" (Watch dogs)-এর মত। অর্থাৎ ইসকনের কল্যাণ বিধানের জন্য এবং অপ্রামাণিক কোন দার্শনিক মতবাদের অনুপ্রবেশ-জাত দূষণ থেকে সংঘকে রক্ষার জন্য তাদের সদাসতর্ক থাকতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেছিলেন যে "নেতা মানেই হল শ্রবণ-কীর্তনের নেতা।" সেইজন্য ইসকনে নেতৃবৃন্দ কেবল পরিচালন এবং সংগঠন কার্যই নয়, এটাও প্রত্যাশিত যে তারা পরমার্থ অনুশীলন এবং আচার অভ্যাসাদির আদর্শ মানও নিজেরা প্রদর্শন করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ এ-ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে নেতৃবৃন্দ যদি নিজেরা শ্রবণ-কীর্তনে আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে পারে তাহলে ইসকনে অধ্যাত্ম-অনুশীলনের উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভবপর হবে।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোধানের পর ইসকনে কোন একক মুখ্য নেতা বা প্রধান নেই। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বলেছিলেন যে তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতির পর তাঁর অনুগামী সমস্ত শিষ্যবৃন্দই নেতায় পরিণত হবে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনকে সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত করার জন্য তিনি তাঁর সকল শিষ্যবৃন্দকে একত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আদেশ দিয়েছিলেন। আর এই আদেশই এই আন্দোলনের নিরবচ্ছিন্ন প্রসারের একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ।

ইসকন নূতনভক্ত প্রশিক্ষণ

কৃষ্ণভক্ত হয়ে আশ্রমবাসী হওয়ার জন্য আগ্রহী ব্যক্তিরা এই বিশেষ বিভাগে যোগাযোগ করলে তাদের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়। আজ সারা পৃথিবীতে যে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সূচনা হয়েছে তাতে যোগদান করে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষিত যুবকরা ভারতভূমিতে পাওয়া মনুষ্য জন্মকে সার্থক করুন।

আবশ্যকীয় যোগ্যতা—

১। অবিবাহিত, শিক্ষিত (ন্যূনতম মাধ্যমিক) কর্মঠ যুবক হতে হবে।

২। মূল প্রত্যয়ন পত্রাদি (যেমন-Character Certificate) অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।

৩। বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হওয়া আবশ্যক।

যোগাযোগ—ইসকন নূতন ভক্ত প্রশিক্ষণ
রুম নং-১২০, শ্রীমায়াপুর
নদীয়া—৭৪১৩১৩

ছাত্রছাত্রীদের জন্য

'জাগ্রত ছাত্র সমাজ'

ভারত ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যাহার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

যথার্থ পরোপকার সাধনের নিমিত্ত, বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রমান্বয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে নতুন পথ নির্দেশ করার জন্য ইসকনের পক্ষ থেকে পারমার্থিক ছাত্র-সংগঠন 'জাগ্রত ছাত্রসমাজ' গঠন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা ইসকন পরিচালিত 'জাগ্রত ছাত্র সমাজের' সদস্য বা সদস্যা হয়ে ইসকনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এই সংগঠন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

১। যে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী ব্যক্তিগতভাবে 'জাগ্রত ছাত্র সমাজের' সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেন। স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে পাঁচজন ছাত্রকে নিয়ে এই 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' গঠন করা যেতে পারে।

২। সপ্তাহের যে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে, কর্তৃপক্ষের সুবিধামতো স্কুলে, ক্লাবে, দেবালয়ে বা যে কোনো জায়গায় সাপ্তাহিক মিলন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

৩। এই সংগঠনকে ইসকন শ্রীমায়াপুরে রেজিস্ট্রিভুক্ত করতে কোনো অনুদান লাগবে না। তবে প্রত্যেক স্কুল সংগঠনকে একটি করে ইসকন প্রকাশিত 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জীবন আসে জীবন থেকে' গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে।

৪। প্রাথমিক অবস্থায়, প্রত্যেক 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' সাপ্তাহিক মিলনের দিন শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করে কার্যক্রম শুরু করবেন এবং তারপর কিছু সময় 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'জীবন আসে জীবন থেকে' গ্রন্থ পাঠ করে শ্রবণ করবেন, এইভাবে নিয়মিত দুই মাস অনুষ্ঠান করে সফল হলে পরবর্তী কার্যক্রম জানানো হবে।

৫। প্রত্যেক সাপ্তাহিক মিলনের বিবরণ শ্রীমায়াপুরে পাঠাতে হবে।

৬। 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' এর সদস্য পদ গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীরা নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

(১) 'জাগ্রত ছাত্র সমাজে'র সদস্য পরিচয়পত্র।

(২) প্রতি চারমাস অন্তর 'সমাচার পত্রিকা'।

(৩) ইসকন প্রকাশিত যে-কোনো গ্রন্থে ৫% ছাড়।

(৪) শ্রীমায়াপুরে বিভিন্ন শিক্ষাশিবিরে যোগদান।

(৫) পুরী, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থান দর্শনের জন্য ট্যুরে যোগদান।

(৬) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভক্তদের সঙ্গে পত্রবন্ধু করার সুযোগ।

(৭) আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক জীবন গঠনের জন্য যথাযথ উপদেশ বা মার্গ-দর্শন।

বিঃ দ্রঃ 'জাগ্রত ছাত্র সমাজে'র সদস্য পদের জন্য বার্ষিক অনুদান মাত্র ২১ টাকা।

যোগাযোগ—বিদ্যালয় প্রচার বিভাগ

ইসকন—শ্রীমায়াপুর

নদীয়া—৭৪১৩১৩

ইসকন যুবগোষ্ঠী

সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পথভ্রষ্ট যুবকদের জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করা এবং এক অপার্থিব শান্তি ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই গঠিত হয়েছে ইসকন যুবগোষ্ঠী। এই মহান লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য ইসকন যুবগোষ্ঠী সারাবছর বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে সততা, শৌচ, দয়া, তপঃ ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে তাদেরকে প্রকৃত বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ প্রয়াস করে চলেছে। জাতিগত ঐতিহ্যের পটভূমিতে এবং কর্মজীবনে ভারতের যুবসমাজ অন্তরে ভগবৎ-বিশ্বাসী হয়েই রয়েছে। তাই তারা যুবগোষ্ঠীর সদস্য হয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষালাভ করতে পারেন—জীবন ও ব্রহ্মাণ্ডের উৎস, পুনর্জন্ম, কর্ম, যোগ, আত্মা ইত্যাদি।

এছাড়া ইসকন মায়াপুরে যুবকদের আরও উৎসাহিত করার জন্য বাৎসরিক যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। যুবগোষ্ঠী আয়োজিত সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ছাত্র ও যুবকগণ ৫০% বিশেষ ছাড়ে যুব ছাত্রাবাসে রাত্রিবাস করতে পারেন। অধিক তথ্যের জন্য অনুগ্রহ পূর্বক এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

ইসকন যুবগোষ্ঠী

শ্রীধাম মায়াপুর,

নদীয়া—৭৪১৩১৩

ফোন—(০৩৪৭২) ২৪৫-৩০৮

ইসকনের সদস্য হোন

অনেকরকম সংঘ-সংগঠন আছে যেখানে একই উদ্দেশ্যসম্পন্ন সদস্যরা তাদের কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য একত্রে মিলে কাজ করেন। যেমন ব্যবসায়ীরা গঠন করেন চেম্বার্স অব কমার্স, আর শ্রমিকেরা গঠন করেন লেবার ইউনিয়ন-প্রভৃতি। ঠিক সেরকম ইসকন বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ হল সেই সব মানুষদের জন্য যাদের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা।

ইসকনে বিভিন্ন ধরনের সদস্যপদ রয়েছে। পূর্ণ সময়ের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন এমন ভক্তদের নিয়ে সংঘের আশ্রমগুলি গড়ে ওঠে এবং এই সমস্ত ভক্ত ভক্তজীবনের সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা অঙ্গীকার করে নেন। তারা সারা দিন ধরে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু বিনিময়ে একটি পয়সাও পারিশ্রমিক চান না। অবশ্য তাদের খাদ্য পোশাকাদি সমস্ত প্রয়োজন ইসকনই পূরণ করে থাকে। ইসকনে এরকম বহু সহস্র সেবকের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষতঃ যুববৃন্দের অবিলম্বে এগিয়ে আসা উচিত এবং নিজেরা কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা করে অন্যদের কাছে প্রচারের জন্য তাদের বেরিয়ে পড়া উচিত। ইসকন আশ্রমসমূহে মূলতঃ যে-সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলি হল পূজা, ভজন, কীর্তন, মন্ত্রসমূহ, দর্শনতত্ত্ব, রন্ধন প্রণালী, স্বনির্ভরতা এবং পারমার্থিক নেতৃত্বদান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কৃষ্ণভক্তিমূলক সেবার মনোভাব—কিভাবে কৃষ্ণশরণাগত হতে হয়—সেই শিক্ষা।

যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে চান তাঁরা তাঁদের নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রগুলিতে যোগাযোগ করুন।

এমন অনেকে রয়েছেন, যাঁরা কৃষ্ণভক্তি চর্চায় খুব উদ্যমশীল, কিন্তু সন্তানাদি থাকার জন্য তাঁরা আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও পূর্ণ সময়ের জন্য ইসকনে ভগবৎ সেবায় যোগ দিতে পারছেন না। তাঁরা নিজ গৃহেই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে পারেন। এ বইয়ে প্রদত্ত নির্দেশগুলি পালন করলে তারা গৃহে থেকেও নিঃসন্দেহে পূর্ণকৃষ্ণভক্তি অর্জনে সক্ষম হবেন।

যাঁদের পর্যাপ্ত অর্থ রয়েছে, তাঁরা একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ দান করে ইসকনের আজীবন সদস্য (Life Patron Member) হয়ে যেতে পারেন।

আর যারা উপরোক্ত কোন পন্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত নন, তাদের কাছে অনুরোধ যে দয়া করে তারা যেন অন্ততঃ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত এই মহামন্ত্র নিয়মিত কীর্তন করেন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীল প্রভুপাদের উক্তি

ভারতে জন্মলাভের মাহাত্ম্য

"ব্রহ্মলোকে কোটি কোটি বছরের পরমায়ুর চেয়ে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ক্ষণকালের জন্মও আকাঙ্খিত, কেননা এমনকি কেউ ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হলেও সঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হলে তাকে আবার বার বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হবার জন্য ফিরে আসতে হয়। অবশ্য, অপেক্ষাকৃত নিম্নতর গ্রহলোকে অবস্থিত এই ভারতবর্ষে জীবনকাল খুব দীর্ঘ নয়, নিতান্তই ক্ষণকালের, তবু যে ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের সুযোগ লাভ করেছেন, তিনি অনন্যভক্তি

সহকারে ভগবানের চরণকমলে শরণগ্রহণের মাধ্যমে এমনকি এই ক্ষণকালের জীবনেও নিজেকে পরম পূর্ণতার স্তরে উন্নীত করতে পারেন। এই ভাবে তিনি অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন—যেখানে একটি জড় দেহে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ভোগের কোন সমস্যা নেই।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই উক্তিতে এ-কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে ঃ

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

যিনি ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, ভগবদ্গীতার প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ শিক্ষা-নির্দেশ অবগত হবার পূর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করেছেন। এই ভাবে তিনি এই মানবজন্ম লাভ করে কি করা কর্তব্য সে-বিষয়ে সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তার কর্তব্য হল অন্যান্য সকল মত-পথ, ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল কৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। কৃষ্ণ অবিলম্বে তাঁর ভার গ্রহণ করবেন এবং পূর্বের পাপময় জীবনের সকল কুফল থেকে তাঁকে মুক্ত করবেন। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (ভগবদ্গীতা ১৮-৬৬)। সেজন্য কৃষ্ণভক্তি গ্রহণ করা তাঁর কর্তব্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই নির্দেশ দিয়েছেন—'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু' ঃ "সর্বদা আমাতে চিত্ত স্থির কর, আমার ভক্ত হও। তুমি আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর"। এই পন্থা খুবই সহজ—এমনকি একটি শিশুর পক্ষেও। কেন এই পন্থাটি আপনিও গ্রহণ করবেন না? প্রত্যেকের উচিত শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করা এবং এইভাবে ভগবদ্ধামে উন্নীত হবার জন্য নিজেকে পূর্ণরূপে যোগ্য করে তোলা (ত্যক্তা দেহং পুনর্জন্ম

নৈতি মামেতি সোঽর্জুন)। কৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়া—এটাই জীবনের পরম প্রয়োজন। এই সর্বোত্তম সুযোগটি ভারতের অধিবাসীদের বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে। যিনি তাঁর নিজ আলয় ভগবদ্ধামে ভগবানের কাছে ফিরে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁকে শুভ বা অশুভ—কোনরূপ কর্মের ফলভোগের জন্য কখনো জড়বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় না।

নিজ গৃহে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর 'ভগবদ্গীতা যথাযথ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥

"অতএব অর্জুন, সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার কর্তব্যকর্ম যুদ্ধ করা উচিত। তোমার মন এবং বুদ্ধি আমাকে অর্পণ করে কার্য করলে নিঃসন্দেহে তুমি আমার কাছে ফিরে আসবে।"

"তিনি অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত থেকে তাঁর ধ্যান করতে আদেশ দেননি। ভগবান কোনও অসম্ভব পরামর্শ দেন না। পক্ষান্তরে, তিনি বলেছেন, 'আমাকে স্মরণ করে তুমি তোমার কর্তব্যকর্ম করে যাও।' ভগবান কখনই কোন অযৌক্তিক উপদেশ দেন না। এই জড় জগতে দেহ ধারণ করতে হলে কাজ করতেই হবে; কর্ম অনুসারে মানব সমাজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এতে ব্রাহ্মণেরা বা সমাজের বুদ্ধিমান লোকেরা এক ধরনের কাজ করছে, ক্ষত্রিয়েরা বা পরিচালক

সম্প্রদায় এক ধরনের কাজ করছে এবং ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সম্প্রদায় তাদের বিশেষ ধরনের কাজ করছে। মানব-সমাজের প্রত্যেককেই, সে শ্রমিকই হোক, ব্যবসায়ী হোক, যোদ্ধা হোক, চাষী হোক, এমন কি সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে যে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়—সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী বা তত্ত্ববিদ্‌গণ-এদের সকলকেই জীবন ধারণ করার জন্য তাদের নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম করতেই হয়। তাই ভগবান অর্জুনকে তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন যে, সব সময় সকল কর্তব্যকর্মের মাঝে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর পাদপদ্মে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে কর্তব্যকর্ম করে যেতে। দৈনন্দিন জীবনে কর্তব্যকর্ম করার সময় যদি শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা না যায়, তবে মৃত্যুর মুহূর্তে তাঁকে স্মরণ করা সম্ভব হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই উপদেশ্‌ দিয়ে গেছেন। তাই আমাদের সর্বক্ষণ চব্বিশ ঘণ্টাই ভগবানকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করে—এবং তাঁর সেবায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত হয়ে আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকতে হবে।"

কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিময় সেবা চর্চা করা প্রত্যেকের জীবনেই নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন মন্দিরে বা আশ্রমে কৃষ্ণ ভক্তদের সান্নিধ্যে থেকে ভক্তিময় সেবা চর্চা করা অবশ্য অনেক সহজ। কিন্তু আপনি যদি দৃঢ় সং কল্প হন তাহলে আপনি আপনার স্বগৃহেই কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করতে পারেন এবং এভাবে আপনার গৃহকে একটি মন্দিরে পরিণত করতে পারেন।

কৃষ্ণভাবনামৃতের একটি সুন্দর দিক হল, যতটুকু ভক্তি অনুশীলন আপনি নিজের পক্ষে সম্ভব বলে মনে করছেন ততটুকুই আপনি

অভ্যাস করতে পারেন। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদ্‌গীতায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোন ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে মহা ভয় থেকে ত্রাণ করে।" তাই আপনার দৈনন্দিন জীবনে কৃষ্ণকে গ্রহণ করুন; শীঘ্রই আপনি তাঁর সুখময় ফল অনুভব করতে পারবেন।

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের বিভিন্ন স্তর

নীচে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা হল, যা আপনি জীবনের স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্ম বজায় রেখেও আপনার স্বগৃহে অভ্যাস করতে পারেন। আপনি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে যে স্তরটি অভ্যাস করতে পারবেন, সেটি আপনি বেছে নিন ইসকন আপনাকে ঐ স্তরের ভক্তি—অনুশীলনের নির্দেশনা ও প্রেরণা দান করবে এবং ক্রমশঃ উচ্চতর স্তরে উন্নীত হতে আপনাকে সাহায্য করবে।

শ্রদ্ধাবান ঃ যে-ভক্ত ভক্তিসেবায় নিম্নবর্ণিত বিধিশর্তাদি মেনে চলতে সক্ষম হবেন, তিনি একজন শ্রদ্ধাবান ভক্ত হিসাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের জন্য শ্রীশ্রীরাধামাধবের কৃপা আশীর্বাদ লাভ করবেন।

১। তিনি মন্দির বা নামহট্ট ভক্তগোষ্ঠীর, একজন সক্রিয় ভক্ত, অর্থাৎ তিনি যত বেশীবার সম্ভব মন্দির বা নামহট্ট সংঘে যান এবং মন্দিরে বা নামহট্টের ভক্তিমূলক কার্যক্রমগুলিতে যোগদান করেন।

২। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ এক মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন।

৩। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষাসমূহ পাঠ করেন।

সাধুসঙ্গী ঃ যে ভক্ত শ্রদ্ধাবান ভক্তের উপযোগী উপরোক্ত শর্তসমূহ পালন করা ছাড়াও ভক্তিসেবায় নিম্নবর্ণিত বিধিনিয়মগুলি মেনে চলতে সক্ষম হবেন, তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধব ও শ্রীশ্রীগৌর-নিতাইয়ের কৃপা-আশীর্বাদে ধন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী একজন সাধুসঙ্গী ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি মন্দির বা নামহট্ট সংঘে কমপক্ষে সপ্তাহে একবার মিলিত হয়ে সাধুসঙ্গ করেন।

২। তিনি প্রতিদিন কমপক্ষে ৪ মালা জপ করেন।

৩। তিনি জুয়া, পাশা খেলা ও অবৈধ স্ত্রী বা পুরুষ সঙ্গ বর্জন করে চলেন।

কৃষ্ণ সেবক ঃ যে-ভক্ত ভক্তসঙ্গী ভক্তের পালনীয় উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করা ছাড়াও ভক্তিসেবায় নিম্নবর্ণিত বিধিনিয়মগুলি মেনে চলতে সক্ষম হবেন তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের কৃপাশীর্বাদে ধন্য হয়ে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনকারী একজন কৃষ্ণ সেবক ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসমূহ তাঁর প্রতিনিধিবর্গের তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে নিজ জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত ভক্তি-চর্চায় উন্নতি সাধন এবং শুদ্ধতা অর্জনের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন।

২। তিনি স্বীকার করেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান।

৩। ইসকন মন্দিরে বা নামহট্ট সংঘে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসবের সময়—যেমন শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা প্রভৃতিতে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সক্রিয় ভক্তিসেবায় অংশগ্রহণ করেন।

৪। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ ৪ মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন।

৫। তিনি আমিষ খাবার (মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি) বর্জন করে চলেন এবং নৈতিক জীবন যাপন করেন।

কৃষ্ণ সাধক ঃ কোন ভক্ত যদি উপরের কৃষ্ণসেবক ভক্তোপযোগী শর্ত-সমূহ পূরণ করা ছাড়াও ভক্তিমূলক সেবার নিম্নোক্ত বিধি শর্তাদি পালন করতে পারেন, তাহলে তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের কৃপাশীর্বাদ-ধন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী একজন কৃষ্ণসাধক ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিনিধিবর্গের তত্ত্বাবধানে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসমূহ অনুসারে ধীরে ধীরে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ এবং তা অনুশীলনের মাধ্যমে ভক্তিমার্গ-সম্মত জীবন যাপনে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

২। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন এবং যত বেশী সম্ভব ইসকনের পাঠের ক্লাসগুলিতে অথবা নামহট্ট সংঘের পাঠে যোগ দেন (অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে একদিন ভগবদ্গীতা পাঠের ক্লাসে)।

৩। তিনি নিজ গৃহে সাধ্যমতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি পূজাবেদী স্থাপন, আরতি ও খাদ্যদ্রব্য নিবেদন, পবিত্র তুলসী বৃক্ষের সেবা-পূজা প্রভৃতি করেন এবং খুব ভোরে ওঠার মতো কিছু সাধারণ নীতিনিয়ম মেনে চলেন।

৪। তিনি প্রতিদিন ৮ থেকে ১৬ মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন।

৫। তিনি মদ্যপান, মাংসাহার ও দ্যূতক্রীড়া (তাস, জুয়া ইত্যাদি খেলা) এবং বিবাহ-বহির্ভূত অবৈধ যৌনক্রিয়া বর্জন করে শুদ্ধ পবিত্র জীবন যাপন করেন।

৬। তিনি বৈষ্ণব-পঞ্জিকায় উল্লেখিত উৎসব-পর্বদিনে এবং একাদশীর দিনগুলিতে উপবাস পালন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয় ঃ যে ভক্ত উপরোক্ত গৌর/কৃষ্ণসাধক ভক্ত হবার শর্তগুলি পূরণ করা ছাড়াও ভক্তিসেবার নিম্নবর্ণিত বিধিনিয়মগুলি পালনে সক্ষম, তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের কৃপাশীর্বাদ-ধন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী একজন শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয় ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত নীতিসূত্রগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের দিব্য আশ্রয় লাভ করার জন্য কৃতসংকল্প।

২। তিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করেন।

৩। তিনি প্রতিদিন অন্ততঃ ১৬ মালা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন।

৪। তিনি চা, কফি সহ সমস্ত রকমের মাদকদ্রব্য, পেঁয়াজ, রসুন সহ সকল প্রকার আমিষ খাবার, তাস-জুয়া খেলা, সিনেমা, খেলাধূলা এবং অবৈধ যৌনক্রিয়া কঠোরভাবে বর্জন করে চলেন।

৫। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী সুসংবদ্ধভাবে পাঠের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনের মূলতত্ত্বগুলি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং তিনি অন্যদের নিকট কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে (তার সাধ্যানুসারে) নিজেকে সক্রিয় ভাবে নিয়োজিত করেন।

৬। তিনি নিয়মভিত্তিক ভাবে মন্দিরের বা নামহট্ট সংঘের সাথে সম্পর্কিত সেবাকাজ (সেবাটি যতই সরল সাধারণ হোক না কেন) গ্রহণ করেন।

৭। তিনি ভোরে শয্যাত্যাগ, যতদূর সম্ভব মন্দিরের প্রাত্যহিক কার্যসূচীগুলি গৃহে অনুসরণ প্রভৃতির মাধ্যমে স্বগৃহেই একটি কঠোর সাধন-বিধি মেনে চলেন। এছাড়া তিনি প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একবার মন্দিরের বা নামহট্টের শ্রীমদ্ভাগবতম পাঠের ক্লাসে যোগ দেন।

শ্রীগুরু চরণাশ্রয় ঃ যে-ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয় ভক্তের পালনীয় উপরোক্ত শর্তগুলি পূরণ করা ছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিধিশর্তাদি পূরণে সক্ষম তিনি শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের কৃপাশীর্বাদ-ধন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকারী একজন শ্রীগুরু চরণাশ্রয় ভক্ত হিসাবে পরিগণিত হবেন।

১। তিনি ইসকন গুরুবর্গের মধ্যে কোন একজন গুরুদেবের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ করেছেন।

২। তিনি কমপক্ষে ৬ মাস শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয়' ভক্তোপযোগী বিধিশর্তাদি পালন করেছেন এবং মন্দির অধ্যক্ষ বা নামহট্ট পরিচালকের নিকট থেকে এর জন্য স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

৩। ইসকনের নিয়মপদ্ধতি অনুসারে এই স্তরের ভক্তের জন্য গৃহীত নির্দিষ্ট লিখিত পরীক্ষায় তিনি যোগ্য বিবেচিত হয়েছেন।

নিজ অবস্থার বিবৃতি দিয়ে যোগাযোগ করুন ঃ

গৃহে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের বিভিন্ন স্তরের যে স্তরে আপনি অধিষ্ঠিত আছেন, দয়া করে তার বিবৃতিগুলো নিজের নাম ঠিকানা সহ পত্রের মাধ্যমে জানান। তাহলে সেই অনুসারে আপনাকে একটা স্বীকৃতি পত্র প্রদান করা হবে। তারপর এর পরের স্তরে অধিষ্ঠিত হলে আবার জানালে পুনরায় আর একটা স্বীকৃতি পত্র (Certificate) প্রদান করা হবে।

অধিক তথ্যের জন্য অনুগ্রহপূর্বক এই ঠিকানায় অবিলম্বে যোগাযোগ করুন ঃ

শ্রীশ্রীহরেকৃষ্ণ নামহট্ট কার্যালয়
পোঃ শ্রীধাম মায়াপুর
জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৩
ফোন—(০৩৪৭২) ২৪৫২২৭

হরিনাম দীক্ষার পূর্বানুশীলন

১। শ্রীগুরু চরণাশ্রয়ের মানপত্র ছয় মাস বা তার আগে থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

২। এক বছর বা তার বেশী থেকে চারটি নিয়ম যথা—আমিষ আহার (মাছ, মাংস, ডিম, রসুন, পিঁয়াজ, মসুর ডাল), নেশা (বিড়ি, পান, তামাক, চা, কফি, নর্শী), দ্যূত ক্রীড়া (তাস, পাশা, লটারী, জুয়া) এবং অবৈধ পুরুষ ও স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি বর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া।

৩। একবছর নিয়মিত ভাবে ১৬ মালা করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ অভ্যাস করা।

৪। নিয়মিত ভাবে সূর্যোদয়ের পূর্বে স্নান বা শুদ্ধতা বজায় রাখা এবং পরে মঙ্গল আরতি করা বা তাতে যোগদান।

৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ সেবা করা (রান্নার ব্যক্তি যেন দীক্ষিত বা নিরামিষাশী হয়)।

৬। নিজগুরুদেবের আর শ্রীল প্রভুপাদের নাম ও প্রণাম মন্ত্র জানা।

৭। বেদিতে রাখা পরম্পরা গুরুদের চিনতে ও তাঁদের নাম জানা।

৮। বিষ্ণু তিলক ধারণের স্থান ও বিষ্ণু নাম সমূহ জেনে, নিয়মিত তিলক ধারণ করা।

৯। কম পক্ষে সপ্তাহে একদিন আপনার নিকটবর্তী ইস্‌কনের মন্দির বা ইস্‌কন অনুমোদিত হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘে যোগদান করা এবং কিছু সেবা করতে সচেষ্ট হওয়া।

১০। শ্রীল প্রভুপাদের কয়েকটি গ্রন্থ অন্ততঃ একবার পাঠ শেষ করতে হবে, যেমন (ভগবদ্‌গীতা যথাযথ, যুগাচার্য শ্রীল প্রভুপাদ, মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথম ভাগ)।

১১। বৈষ্ণব অপরাধ ও অগঠন মুলক উপহাস এড়িয়ে চলতে হবে।

১২। বৈষ্ণব মত বিরোধী কোন পেশা বা কার্যকলাপ (যেমন আমিষ ও মাদক জাতীয় দ্রব্যের বিক্রি ও মৎস্য, মাংসের রান্না, চা, কফি তৈরী আর পরিবেশন এবং ডাক্তার হৈলে ভ্রূণ হত্যা ইত্যাদি) না করা।

১৩। ইস্‌কন অনুমোদিত ভক্তদের প্রচার এবং ভাষণ শ্রবণে সংকল্প করা।

১৪। নিয়মিত ভাবে তুলসী বৃক্ষে জল দান, পরিক্রমা ও প্রণাম করা।

১৫। একাদশী ব্রত পালন করা।

১৬। নিয়মিত শ্রীগুরুদেবের চরণে পুষ্প দেওয়া।

১৭। সংসার দাবানল, শ্রীগুরুচরণ পদ্ম, তুলসী ও গৌর-আরতি কীর্ত্তনগুলি জানা।

১৮। মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণী, তুলসী ও বৈষ্ণবের প্রণাম মন্ত্র জানা।

১৯। আরতি করার পদ্ধতিগুলি শেখা।

২০। যদি গৃহস্থ হন ঃ গৃহস্থ জীবনের নিয়ম কানুন জেনে, ব্যক্তিগত ভাবে সেগুলি মেনে চলা এবং কৃষ্ণভাবনা অনুসারে সন্তানাদি পালন করা।

হরিনাম দীক্ষার শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও শিক্ষা

১। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা কি কি?

উত্তর ঃ শ্রীগুরুদেব পরম্পরা ধারায় থাকবেন, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হবেন, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে আচার ও প্রচার করেন ও হরিনাম পরায়ণ হবেন।

২। সদ্‌গুরুর নিকট থেকে হরিনাম দীক্ষার পর কার নিকট থেকে পরবর্তী মন্ত্রগুলি গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর ঃ যে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে হরিনাম দীক্ষা গ্রহণ করা হয়, সেই গুরুদেবের কাছ থেকে পরবর্তী মন্ত্রগুলি গ্রহণ করতে হবে।

৩। গুরুদেবকে ভগবানের মত পূজা করা হয় কেন? গুরুদেব কি ভগবান?

উত্তর ঃ গুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন, তাই ভগবানের মতো পূজা করা হয়, গুরুদেব ভগবান নন, তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রতিনিধি।

৪। ভগবানের সঙ্গে এবং শিষ্যদের সম্পর্ক হিসাবে গুরুদেব কি ভাবে দেখেন?

উত্তর ঃ ভগবানের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক হিসাবে গুরুদেব হচ্ছেন নিত্য সংযোজনকারী।

৫। গুরুদেব পরম সত্য কথা বলেন—আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? এটা কি করে সম্ভব যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৫০০০ বছর পূর্বে যা বলেছেন, আজকের গুরুরাও সেই একই কথা বলছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। গুরুদেব পরম্পরাধারায় আছেন এবং তিনি যা বলছেন তা গীতা ও ভাগবত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলেন।

৬। কোন্ পরিস্থিতিতে গুরুত্যাগ করা যেতে পারে?

উত্তর ঃ গুরুদেব যদি পাপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন, বৈষ্ণব নিন্দুক হন ও ভগবদ্ বিদ্বেষী হয়ে পড়েন, তাহলে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করা উচিৎ।

৭। একজন শিষ্যের যোগ্যতা ও দায়িত্ব কি কি?

উত্তর ঃ শিষ্যের যোগ্যতা ও দায়িত্ব হচ্ছে গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আদেশ ও উপদেশ অনুসারে কৃষ্ণসেবা করা।

৮। ইস্‌কনে শ্রীল প্রভুপাদের অনুপম পদ কি? বলা হয়েছে—দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা গুরুপরম্পরার সঙ্গে যুক্ত হই। শ্রীল প্রভুপাদের ধারায় সেবা করতে আপনি কি দৃঢ়নিষ্ঠ? কেন?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন ইস্‌কন-এর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ইস্‌কন দ্বারা সমস্ত পৃথিবীতে মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুযায়ী প্রচার কার্য চলছে এবং বহু মানুষ পারমার্থিক পথে এগিয়ে চলেছে, তাই আমি সেবা করতে অত্যন্ত দৃঢ়নিষ্ঠ।

৯। শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করেছেন কেন?

উত্তর ঃ সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। যেমন-

শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

এবং ব্রহ্মসংহিতায়—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দ সর্বকারণ কারণম্ ॥

ও পূর্ববর্তী মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করে আসছেন। তাই আমিও শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলে স্বীকার করি।

১০। কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য কি কি? ,আমরা 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করি কেন?

উত্তর ঃ সমস্ত পাপ দূর করে এবং সমস্ত কামনা পূরণ করে আর কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করে। এবং চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন করতে ও 'কলিযুগের যুগধর্ম পালনের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করি।

১১। চারটি নিয়ম পালন করি কেন?

উত্তর ঃ আমিষ আহার বর্জন, নেশা বর্জন, দ্যূতক্রীড়া বর্জন ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন, এইগুলি হচ্ছে পাপকর্ম। এইসব স্থানে কলি অবস্থান করে। এই চারটি পাপকর্ম ত্যাগ না করলে পারমার্থিক উন্নতি হয় না। তাই আমাদের চারটি নিয়ম মেনে চলতে হয়।

১২। অন্যান্য পুণ্য কর্ম না করে হরিনাম করি কেন? হরিনাম আর পুণ্য কর্মের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ পুণ্য কর্ম হচ্ছে বৈদিক কর্মকাণ্ডের অধীন। দান, ধ্যান, যজ্ঞ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি করা। এই কর্মের ফলে স্বর্গ ভোগ হয়, তা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী।

হরিনামের ফল হচ্ছে নিত্য। নিত্য ভগবদ্ সেবা প্রাপ্তি হয় এবং ভগবদ্ধামে যাওয়া যায়, তা হচ্ছে স্থায়ী তাই আমাদের হরিনাম ও কৃষ্ণ সেবা করা উচিৎ।

১৩। জি. বি. সি. মণ্ডলীর পদ ও দায়িত্ব কি?

উত্তর ঃ জি, বি, সি হচ্ছে ইস্‌কন এর পরিচালক মণ্ডলী। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইসকনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা এবং প্রচার কার্য করা ও ভক্তদের পারমার্থিক উন্নতি সাধন করা।

১৪। দেহ ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ দেহ হচ্ছে জড়, আত্মা হচ্ছে চেতন। দেহ অনিত্য আর আত্মা হচ্ছে নিত্য দেহ নশ্বর আর আত্মা অবিনশ্বর।

১৫। ইসকন্ কি? কেনই বা ইসকনের আশ্রয় নেব?

উত্তর ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আচার ও প্রচার কার্য করছে। তাতে অংশ গ্রহণ করে

আমাদের পারমার্থিক উন্নতি সাধন করার জন্য ইসকন-এর আশ্রয় নেওয়া কর্তব্য।

১৬। বলা হয়েছে, দীক্ষা গ্রহণ করলে গুরুর আদেশ এ জন্মে এবং জন্ম-জন্মান্তর ধরে পালন করতে হবে। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? গুরু গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ। হ্যাঁ, ভগবানের সেবা অনুশীলন ও পারমার্থিক শিক্ষা লাভের জন্য গুরু গ্রহণের প্রয়োজন আছে।

১৭। দশবিধ নামাপরাধ কি কি?

উত্তর ঃ নিম্নে প্রদত্ত দশ নামাপরাধ দেখুন।

১৮। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন আন্দোলন প্রসারে আপনি গুরুদেবকে সহায়তা করতে রাজী হলেন কেন?

উত্তর ঃ শ্রীগুরুদেব শাস্ত্র ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আচার ও প্রচার কার্য্য করছেন। গুরুদেবের এই প্রচার কার্যে সাহায্য করলে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হবেন।

১৯। যদি প্রচুর সেবা কাজ থাকে, দীক্ষা গ্রহণের পর ১৬ মালার কম জপ করলে চলবে কি? যদি ১৬ মালা সম্পূর্ণ জপ করতে না পারেন, তবে কি করবেন?

উত্তর ঃ চলবে না। পরের দিন তা পূরণ করে দিতে হবে।

২০। আপনার জীবনের অন্তিম ইপ্সিত লক্ষ্য কি?

উত্তর ঃ আমার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা।

সদ্ গুরুদেব এবং দীক্ষাগ্রহণ

কেবল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে কখনই আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। মায়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়া সহজ কিছু নয়। এটি এমন একটি

পথ যেখানে নিশ্চিতভাবেই রয়েছে নানারকম পরীক্ষা, বাধা-বিপত্তি। কেউই একক প্রচেষ্টায় ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে সমর্থ নয়। সেইজন্য সমস্ত শাস্ত্রেই দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, যথার্থ পারমার্থিক উন্নতি লাভ করতে হলে একজন প্রকৃত সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা অবশ্য প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন "জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুদেব পথনির্দেশ দান করেন। এরকম পথনির্দেশ দানের জন্য গুরুদেবকে অবশ্যই দোষত্রুটিবিহীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ হওয়া প্রয়োজন। না হলে কেমন করে তিনি পথ দেখাবেন? গুরুদেবের আদেশ কখনই শিষ্য অমান্য করতে পারে না। সেইজন্য এমন একজন সদ্‌গুরু নির্বাচন করতে হবে, যাঁর আদেশ কখনও শিষ্যকে ভ্রান্ত পথে চালিত করবে না। মনে করুন, আপনি কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে সদ্‌গুরু হিসাবে গ্রহণ করলেন, আর তিনি আপনাকে ভুলপথে পরিচালিত করলেন। তাহলে এভাবে আপনার পুরোজীবনটাই ব্যর্থ হবে। তাই এমন একজন সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হবে যাঁর সহায়তায় জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্ভব হবে। সেটাই হল গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি। এটা কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র নয়। শিষ্য এবং গুরুদেব—উভয়ের পক্ষেই এটি একটি বিরাট দায়িত্ব" (সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী (Srila Prabhupada Lilamrita, Volume-2)

বর্তমানে ইসকনের অন্তর্গত শ্রীল প্রভুপাদের যে সমস্ত সেবারত শিষ্যবর্গ সংঘের নিয়মাদর্শ অনুসারে দীক্ষা প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে নিজ পছন্দমত কারও সান্নিধ্যলাভ করে দীক্ষা প্রদানের জন্য তাঁকে অনুরোধ করা যেতে পারে।

অবশ্য গুরুনির্বাচনের পূর্বে দেখতে হবে—বিধিনিয়মাদি পালন, মহামন্ত্র জপ, ভোরে ওঠা এবং মন্দির কার্যক্রম সমূহে যোগদান,

ভক্তিচর্চায় দৃঢ়নিষ্ঠা, কৃষ্ণতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রতি দার্শনিক আনুগত্য এবং জি.বি.সি অনুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে কার্যরত থাকা—ইত্যাদির একটি ভাল পূর্ব ইতিহাস সেই গুরুদেবের যেন থাকে।

হরিভক্তিবিলাস অনুসারে, দীক্ষাপ্রার্থীকে অন্ততঃ এক বছর কোন স্বীকৃত দীক্ষাদানক্ষম বৈষ্ণবের নিকট থেকে নিয়মিতভাবে ভগবদ্বিষয় শ্রবণ করতে হবে। এই সময় শিষ্যকর্তৃক সেবাচর্চা ও প্রশ্নজিজ্ঞাসার মাধ্যমে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বিকাশ লাভ করে। তারপর শিষ্যের অন্তরে যদি এই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে যে, "ইনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, আমি যাঁর শরণাগত হতে পারি, আর যিনি আমায় কৃষ্ণের কাছে নিয়ে যেতে পারেন," তাহলে শিষ্যটি এই বৈষ্ণবের আশ্রয়লাভ ও শেষে দীক্ষার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারে। বর্তমানে জি.বি সি-নির্ধারিত দীক্ষাদানের যে পদ্ধতি রয়েছে, তা যেমন শাস্ত্রানুগ, তেমনি একটি বিশাল সংগঠনের জন্য উপযোগী; কারণ সংগঠনের গুরুবৃন্দ প্রায়ই ভ্রমণরত থাকেন এবং তাঁদের দায়িত্বের ক্ষেত্রও অত্যন্ত বিস্তৃত। কোনরূপ ব্যস্ততা-তাড়াহুড়ো করে দীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে শাস্ত্রসমূহে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য গুরুদেব এবং শিষ্য উভয়ের সুরক্ষার জন্যই এ বিষয়ে ইসকনে নির্দিষ্ট বিধি-নিয়মের নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছে।

ভক্তদের সংস্পর্শে আসার পর কেউ যখন নিজে কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত হন, তখন তাঁকে প্রথমে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষাসমূহ অনুসরণ করার নির্দেশে দেওয়া হয়। সমস্ত ইসকন সদস্যদের কাছে শ্রীল প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন প্রধান শিক্ষাগুরু এবং আচার্য। সেজন্য গুরু হিসাবে তাঁকে পূজা করা জন্য নবীন ভক্তদের নির্দেশ দেওয়া হয়। শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম এবং ভোগ নিবেদনের সময় ভক্তরা শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

অন্ততঃ ছয়মাস সর্বনিম্ন মান অনুসারে (প্রতিদিন ১৬ মালা জপ এবং চারটি বিধিনিয়ম পালন) কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের পর নবীন ভক্ত ইসকনের কোন দীক্ষাদানকারী গুরুদেবের কাছে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর আশ্রয়লাভের জন্য তাঁকে প্রার্থনা জানাতে পারেন।

গুরুদেবের সান্নিধ্যলাভের প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয়; জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর সমীপবর্তী হতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করে এবং অভিজ্ঞ ভক্তদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একজন যথার্থ সদ্‌গুরু কেমন হওয়া উচিত— সে সম্বন্ধে পূর্বে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

যে কৃষ্ণভক্তকে গুরুরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে, শিষ্যের যেন প্রকৃতই এই অনুভূতি হয় যে সে ওই বৈষ্ণবের দ্বারা দিব্য অনুপ্রেরণা লাভ করছে। শিষ্যটি যেন দৃঢ়বিশ্বাস সম্পন্ন হয় যে, "এই বৈষ্ণব শ্রীল প্রভুপাদের একজন অত্যন্ত একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত অনুসারী এবং শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষানির্দেশ অনুসারে ইনি আমাকে পরিচালিত করবেন।"

যখন একজন দীক্ষাদানক্ষম গুরুর প্রতি এরকম আস্থা ও বিশ্বাস শিষ্যের মধ্যে প্রকৃতই গড়ে ওঠে, তখন শিষ্যটি তাঁর আশ্রয়লাভের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে পারে। যদি শিষ্য অনুভব করে যে তার একটু সময় নেওয়ার দরকার, তাহলে সে প্রয়োজনমত অপেক্ষার পর দীক্ষার জন্য গুরুর নিকট যেতে পারে। ব্যস্ততার কোন প্রয়োজন নেই। এমন হতে পারে যে একজনকে গুরুহিসাবে গ্রহণ করাটা সেই শিষ্যের বহু বহু জন্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে যাঁকেই গুরু হিসাবে গ্রহণ করা হোক না কেন, তিনি সেই একই নিয়ম নির্দেশ দান করবেন যা শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে দিয়ে গিয়েছেন (যেমন ভোরে ওঠা,

১৬ মালা জপ করা—ইত্যাদি)। গুরুদেব হচ্ছে পরম্পরা ধারার ব্যক্তিক যোগসূত্রস্বরূপ, এবং যাঁরা শিষ্যত্ব লাভ করতে চায় তাঁদেরকে গুরুগ্রহণের বিষয়ে খুব গম্ভীরভাবে বিচার-বুদ্ধিশীল হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদিও এ ব্যাপারে তারা অভিজ্ঞ ভক্তদের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারে, তবু তাদের কর্তব্য হল দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে নিজেরাই গুরুদেবকে যাচাই করে নেওয়া।

গুরু নির্বাচনের জন্য উপরোক্ত নির্দেশাবলী ছাড়াও, এটা দেখতে হবে যে ভাবী গুরুদেব কতখানি 'ষড়বেগ' দমনে সমর্থ হয়েছেন, কি পরিমাণে 'ছটি অনুকূল গুণ' বিকশিত করেছেন এবং কতটা 'ষড় দোষ' থেকে মুক্ত হয়েছেন (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য শ্রীউপদেশামৃত, শ্লোক ৩-৬ দেখুন)।

আদর্শগতভাবে, গুরুদেবকে হতে হবে শাস্ত্রজ্ঞ এবং বৈরাগ্যবান। এমনকি যদিও তিনি সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করতে সমর্থ, তবুও জাগতিক আরাম-বিলাস বা ঐশ্বর্যের প্রতি তিনি আসক্ত হবেন না।

এছাড়াও, গুরুদেব কতখানি ভক্তিমূলক সেবাচর্চায় এবং কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারে নিয়োজিত রয়েছেন সেটাও শিষ্যকে দেখতে হবে। অবশ্য প্রচুর যশ-প্রতিষ্ঠা এবং বহুসংখ্যক অনুগামীই যে সবসময় গুরুদেবের উচ্চস্তরের পারমার্থিক যোগ্যতার পরিচায়ক, তা নয়।

তত্ত্বগতভাবে, গুরু-শিষ্য সম্পর্ক খুব অন্তরঙ্গ এবং ঘনিষ্ঠ। সেইজন্য, জীবনের পূজ্য পথপ্রদর্শকস্বরূপ কাউকে যখন গুরুরূপে নির্বাচন করতে হয়, তখন ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার ভিত্তিতেই তা গ্রহণ করতে হয়। যদিও সদ্‌গুরুবৃন্দের শিক্ষা মূলতঃ অভিন্ন, তবু প্রত্যেক গুরুদেবের কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন কিছু

গুরুদেব রয়েছেন যাঁরা স্বল্পসংখ্যক শিষ্যগ্রহণ করেন এবং তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদান করেন; আবার কিছু গুরুদেব বহু শিষ্য গ্রহণ করেন এবং অভিজ্ঞ প্রবীণ ভক্তদের কাছে এসব শিষ্যদের শিক্ষার দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

কোন বিশেষ গুরুদেবের অতিআগ্রহী শিষ্যদের চাপে পড়ে তাদের গুরুদেবের কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। সেটা কোন সঠিক পদ্ধতি নয়। পারমার্থিক আশ্রয়লাভের জন্য যাঁরা ইসকনে আসেন, তাঁরা ইসকনের যেকোন শিষ্যগ্রহণের জন্য স্বীকৃত এবং উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যকে দীক্ষা প্রদানের অনুরোধ জানাতে পারেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে একজন গুরুদেবের নিকট আশ্রয়গ্রহণের পর ভক্ত পূর্বের মতই কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করতে থাকেন। অবশ্য এখন ঐ ভক্ত তাঁর আশ্রয়দাতা গুরুদেব এবং শ্রীল প্রভুপাদ—উভয়কেই গুরু হিসাবে পূজা করতে থাকে। ভক্ত গুরুপ্রণাম এবং কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদনের সময় এখন তাঁর নিজগুরুর প্রণাম মন্ত্র (যদি থাকে) কীর্তন করবেন। যদিও তিনি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষিত হন নি, তবু তিনি একজন বিশেষ গুরুর আশ্রয়গ্রহণ করেছেন এবং সেইভাবে তাঁকে সম্মান জানাতে শুরু করবেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে কোন গুরুদেবের কাছে আশ্রয়গ্রহণের অন্ততঃ ছ'মাস পরে ভক্ত তাঁর নিকট থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। ইসকনে, গুরুদেব কোন ভক্তকে দীক্ষাদানের পূর্বে, যে মন্দিরে ভক্তটি সেবা কাজ করছে সেই মন্দিরের প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অবশ্যই একটি সুপারিশ পত্র নেন। সুপারিশটি করা হয় এইসব বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ঃ (১) মন্দিরের অধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত লিখিত এবং মৌখিক—উভয় পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হওয়া (যাতে

বোঝা যায় যে ভক্তটি শিষ্য হবার অর্থ অবগত এবং এছাড়া অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বিষয়) এবং (২) মন্দিরের অধ্যক্ষ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে সত্যতা যাচাই ঃ শিষ্যটি অন্ততঃ প্রতিদিন ১৬ মালা জপ করছেন কিনা এবং চারটি বিধি নিয়ম পালন করছেন কিনা; আর সারাজীবন ধরে কঠোরভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের প্রয়োজনীয় সংকল্প-বল শিষ্যটির আছে কিনা।

দীক্ষা প্রদানকালে গুরুদেব শিষ্যকে একটি আধ্যাত্মিক নাম দান করেন। যদি শিষ্য অন্ততঃ আরো ছ'মাস একনিষ্ঠভাবে ভক্তিসেবাচর্চা অব্যাহত রাখেন, তাহলে তিনি পূর্বোক্ত পদ্ধতিক্রমে যথাসময়ে ব্রাহ্মণদীক্ষা এবং গায়ত্রীমন্ত্রাদি লাভ করতে পারেন।

যদিও দীক্ষার বিষয়ে গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন রয়েছে, তবু অত্যন্ত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করাও অনুমোদন করা হয় নি। সচরাচর যারা চারটি বিধিনিয়ম পালন করেন এবং প্রতিদিন ১৬ মালা মহামন্ত্র জপ করেন (বিশেষ করে যাঁরা মন্দিরের সেবায় পূর্ণসময় নিয়োজিত), তাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণের এক থেকে দু'বছরের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন।

দীক্ষাদানকারী গুরুদেব ছাড়াও অন্যান্য ভক্তদের (বিশেষতঃ ইসকনের প্রবীণ ভক্তদের) কাছে থেকে শ্রবণ করা এবং তাঁদের সেবা করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা যদিও খুব স্বাভাবিক যে ভক্ত তাঁর নিজ গুরুর প্রতি প্রীতিপরায়ণ হবেন, তবু বৈষ্ণব শিষ্টাচার অনুসারে গুরুভ্রাতাদেরকেও গুরুর মতই সম্মান করতে হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, যদি পূর্বে এমন কোন ব্যক্তির কাছে দীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে যিনি যথার্থ স্বীকৃত বৈষ্ণব নন, তাহলে অপর কোন সদ্‌গুরুর আশ্রয়গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাঁকে (শাস্ত্রানুসারে) অবশ্যই ত্যাগ করা কর্তব্য। যাদের এরকম "গুরু" ইতিমধ্যেই রয়েছে, তারা অপরাধের বা শাস্তির ভয়ে প্রায়ই তাদেরকে

পরিত্যাগ করতে ভীত হন, কিন্তু সেজন্য তাঁদের উৎকণ্ঠিত হবার কোনই কারণ নেই। গুরুত্যাগের বিরুদ্ধে শাস্ত্রে যে সতর্কবাণী করা হয়েছে, তা অযোগ্য বা ভণ্ড গুরুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আর স্বয়ং শাস্ত্রেই উপযুক্ত কারণে গুরুত্যাগ বিহিত হয়েছে। উপযুক্ত একজন বৈষ্ণবকে গুরুরূপে বরণ করলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যকে পালন ও রক্ষা করবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই (এ-ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত ৮-২০-১ এ শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য দেখুন)

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী থেকে ঐ বিষয়ের উপর উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে, নাম হল—'দি স্পিরিচুয়াল মাষ্টার এণ্ড দি ডিসাইপল্', ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত। দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে প্রত্যেক ভক্তকে এই গ্রন্থটি সযত্নে পাঠ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একাদশী ব্রত

একাদশীর দিন সমস্ত ভক্ত উপবাস পালন করে থাকেন। একাদশীব্রত পালন না করা একটি অপরাধ বিশেষ। প্রতিমাসে দু'দিন এই উপবাস পালন করতে হয়।

সাধারণতঃ শ্রীল প্রভুপাদ সবচেয়ে সরল শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে উপবাস পালন করতেন—অর্থাৎ শস্যদানা, কড়াই বা মটরশুঁটি, ডাল —এসব সেদিন খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতেন না। কিছু ভক্ত একাদশীর দিন কেবল ফল গ্রহণ করেন। কেউ কেউ কেবল জলপান করে ব্রত উদযাপন করেন। আবার কিছু ভক্ত কোন কিছু গ্রহণ না করে পূর্ণরূপে উপবাস ব্রত পালন করেন (একে বলা হয় নির্জলা ব্রত)।

একাদশীর দিন এই সমস্ত খাদ্যগুলি ভক্তদের বর্জন করতে হবে : সকল প্রকার শস্যদানা (চাল, গম ইত্যাদি), ডাল, মটরশুঁটি, বীন জাতীয় সব্জী, সরিষা, এবং এসব থেকে তৈরী খাবার যেমন আটা, সরষের তেল, সোয়াবীন তেল প্রভৃতি। এগুলি যদি কোন খাদ্যে মিশ্রিত থাকে তবে তাও বর্জন করতে হবে (যেমন বাজারের গুঁড়ো মশলা—অনেক সময় এতে ময়দা জাতীয় কিছু মেশানো থাকে, তাই এটি বর্জনীয়)।

পরদিন দ্বাদশীতে শস্যদানা হতে তৈরী প্রসাদ গ্রহণের মাধ্যমে উপবাস ব্রত ভঙ্গ (পারণ) করতে হয়। পারণ অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করা উচিত । একাদশীর দিন-তারিখ এবং পারণের সময় জানার জন্য বৈষ্ণব পঞ্জিকা ব্যবহার করুন (ইসকন কেন্দ্রে পাওয়া যাবে)। ইসকনের পঞ্জিকাই ব্যবহার করা উচিত, কেননা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একাদশী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উৎসবাদির দিনক্ষণ নির্ধারণের পন্থা ভিন্ন ভিন্ন। একাদশী ব্রত পালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবশ্য কেবল উপবাস করা নয়; নিরন্তর শ্রীগোবিন্দের স্মরণ-মনন ও শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে একাদশীর দিন অতিবাহিত করতে হয়। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের একাদশীর দিন পঁচিশ মালা বা যথেষ্ট সময় পেলে আরও বেশী জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন—একাদশীর দিন ক্ষৌরকর্মাদি নিষিদ্ধ।

চাতুর্মাস্য এবং দামোদর ব্রত

বর্ষাকালে চারমাস ধরে যে ব্রত পালিত হয় তাকে চাতুর্মাস্য বলে। কৃষ্ণবিমুখ জনগণকে কৃষ্ণভক্তিতে উদ্দীপিত করার জন্য সাধু-

সন্ন্যাসীগণ সারা বছর এক স্থান হতে অন্য স্থানে পরিভ্রমণরত থাকেন। নিয়মানুসারে বর্ষার চারমাস তারা কোন ধামে অবস্থান করেন এবং চাতুর্মাস্য ব্রতের মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করেন।

অবশ্য, শ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে ইসকনের সদস্যগণ বর্ষাকালেও তাদের প্রবল প্রচার কর্মসূচী বন্ধ রাখেন না, আর সেজন্য তাঁরা কঠোরভাবে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করেন না। তারা খাদ্যাখাদ্যের বিধি নিষেধগুলি পালন করেন, সেগুলি হল— চাতুর্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, দ্বিতীয় মাসে দই, তৃতীয় মাসে দুধ এবং চতুর্থ মাসে অড়হর ডাল বর্জন।

ভারতে বর্ষার সময়ে জুলাই থেকে অক্টোবর মাস হল চাতুর্মাস্য-কাল। আষাঢ় মাসের শয়ন একাদশী থেকে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত—অথবা শুধু শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস—এই হল চাতুর্মাস্যের সময় কাল। সঠিক সময় জানার জন্য বৈষ্ণব পঞ্জিকা দেখুন।

চাতুর্মাস্যের চতুর্থ মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসকে বলা হয় দামোদর মাস, কেননা এই মাসটি ভগবানের দামোদর রূপের আরাধনার জন্য নির্দিষ্ট। মা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে দাম বা রজ্জুর দ্বারা বন্ধন করেছিলেন—সেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম হল দামোদর।

কার্ত্তিক মাসে বহু বৈষ্ণব বৃন্দাবনে গিয়ে ব্রত উদযাপন করেন। এ-সময় মন্দিরগুলিতে দামোদর এবং রজ্জু বন্ধনোদ্যত মা যশোদার চিত্র বা প্রতিকৃতি রাখা হয়। এই মাসে প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় সকল ভক্তগণ সমবেতভাবে "দামোদর অষ্টক" কীর্তন করতে করতে ঘৃত প্রদীপে (বিগ্রহ কক্ষের বাইরে মন্দিরকক্ষ থেকে) বিগ্রহগণকে আরতি নিবেদন করেন।

বিভিন্ন উৎসব পালন

কৃষ্ণভাবনাময় প্রতিটি দিনই কার্যতঃ একটি উৎসব। ভক্তসঙ্গে নৃত্য-গীত করে, বিগ্রহসমূহের মধুর অনুপম রূপদর্শন করে ভক্তগণ প্রত্যহ কৃষ্ণসেবার দিব্য আনন্দ আস্বাদন করেন। তবু ভগবানের অবতারসমূহ এবং তাঁর মহান ভক্তগণের আবির্ভাব দিবস ও ভগবানের দিব্য লীলাসমূহের দিনগুলি বিশেষ উৎসব হিসাবে পালিত হয়।

এসব উৎসব পালন করলে ভগবদ্ভক্তি বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়। উৎসবকে সেজন্য ভক্তির জননীস্বরূপ বলে ভাবা হয়। সকলে একত্রে মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনের জন্য উৎসবগুলি অনবদ্য আনন্দময় সুযোগ সৃষ্টি করে। যে-সমস্ত ভক্ত যে কারণেই হোক ইসকন কেন্দ্রে নিয়মিত আসতে পারেন না, তাঁরা প্রায়ই উৎসবের দিনগুলিতে মন্দিরে আসার উদ্যোগ নেন। যেসব ভক্তগণ ইসকন কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে থাকেন, তাঁরা তাঁদের সাধ্যানুসারে কোন সুন্দর একটি উৎসবের আয়োজন করতে পারেন এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য প্রতিবেশীদের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।

উৎসবের দিন প্রচুর ফুল, পাতা, ফুলের মালা ও অন্যান্য নানা দ্রব্য দিয়ে মন্দিরকে সুন্দরভাবে সাজানো হয়। প্রচুর সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য এ উপলক্ষ্যে রন্ধন করে তা শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয় এবং তারপর পর্যাপ্ত পরিমাণে সকলকে তা বিতরণ করা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর শুদ্ধ ভক্তগণের গুণমহিমা কীর্তনের দিব্য শব্দতরঙ্গ এক আনন্দঘন চিন্ময় পরিবেশ রচনা করে।

ভক্তিমূলক নাট্যানুষ্ঠান এবং নগর সংকীর্তনের জন্য উৎসবের দিনগুলি খুবই উপযুক্ত। বিগ্রহগণকে নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ

নিবেদনের জন্যও উৎসবের দিনগুলি খুবই সুন্দর উপলক্ষ্য (ইসকন মন্দিরে এটি করা হয়)।

উৎসবের দিন একটি নির্দিষ্ট সময়কাল উপবাস করার পর প্রসাদের ভূরিভোজ (Feasting)—এই নিয়মে অনেক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এ সময় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রসহ উৎসব উপযোগী কিছু ভজনগীতিও কীর্তন করা হয় (যেমন, কোন মহান বৈষ্ণবের তিরোভাব তিথিতে—'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর'-এই বৈষ্ণব বিরহ-গীতিটি গাওয়া হয়)। যথোপযোগী লীলাকথাও পাঠ করা হয় (যেমন, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব দিবসে আমরা তাঁর দিব্য কার্যকলাপের কাহিনী পাঠ করে থাকি, গোবর্দ্ধন পূজার দিন আমরা শ্রীল প্রভুপাদের 'লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থ থেকে 'গোবর্ধন পর্বত পূজা'—শীর্ষক অধ্যায়টি পাঠ করি)। বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীল প্রভুপাদের ভাষণ সমন্বিত অডিও ক্যাসেটও রয়েছে (ইংরাজী)-যা Festivals with Srila Prabhupada এই সিরিজে পাওয়া যায়, এগুলি শ্রবণ করা যেতে পারে।

ইসকন ভক্তবৃন্দ যে সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান পালন করেন, তার প্রধান কিছুর তালিকা নীচে দেওয়া হল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব বর্ষের প্রথম দিন গৌর পূর্ণিমা থেকে উৎসব পালন শুরু হয়। এসব উৎসবাদির সঠিক দিন-ক্ষণ ইসকনের **বৈষ্ণব পঞ্জিকায়** পাওয়া যাবে। একাদশীর মত সমস্ত উৎসব-তিথিগুলি চান্দ্র গণনা অনুসারে নির্ধারণ করা হয়; সেজন্য সৌর-ক্যালেণ্ডারে প্রতিবছর তারিখের পরিবর্তন ঘটে।

গৌরপূর্ণিমা

ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব দিবস। ফাল্গুনের শেষ কিং বা চৈত্রমাসে এই পূর্ণিমা আসে। চন্দ্রোদয় পর্যন্ত উপবাস; তারপর প্রসাদ ভোজন (Feasting)। এদিন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, আদি

লীলা, ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করুন। গৌরপূর্ণিমা ও তার আগের দিনগুলিতে শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন কেন্দ্রে বিপুল সমারোহপূর্ণ উৎসব হয়। এ-সময় সারা বিশ্ব থেকে কৃষ্ণভক্তগণ উৎসবে যোগদানের জন্য প্রতি বছর শ্রীধাম মায়াপুরে আগমন করেন।

রামনবমী

ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আর্বিভাব দিবস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস, তারপর শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্দের দশম ও একাদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা পাঠ করুন।

নৃসিংহ চতুর্দশী

ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব দিবস। সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস। তারপর মহাভোজ। প্রভুকে 'পনকম্' নিবেদন করুন। পনকম্ হল শীতল জল, তাল-মিছরি, লেবুর রস এবং আদা দিয়ে তৈরী একরকম পানীয় যা শ্রীনৃসিংহদেবের অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব লীলা পাঠ করুন।

রথযাত্রা

পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রা দিবস। ভগবান শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব এবং সুভদ্রা-মহারাণীর বিগ্রহসমূহ রথে আরোহণ করিয়ে ভক্তগণ মহানন্দে নৃত্যকীর্তন করতে করতে ঐ রথ শহরের মধ্য দিয়ে নিয়ে যান। শ্রীল প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে এই রথযাত্রা-উৎসবের প্রচলন করেছেন। এ দিন কলকাতা, ভুবনেশ্বর এবং বরোদার ইসকন কেন্দ্র থেকে মহাসমারোহে বিপুল আড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পৃথিবীর নানা কেন্দ্রে বছরের নানা সময়ে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা দিবসে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ত্রয়োদশ অধ্যায় পাঠ করুন।

ঝুলনযাত্রা

এটি হল পাঁচ দিনের এক জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব, এ সময় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে প্রচুর পুষ্প-সজ্জিত একটি দোলনায় স্থাপন করে ধীরে ধীরে দোলানো হয়, সেই সাথে কীর্তন চলতে থাকে। রাধাকৃষ্ণের আলেখ্যের (চিত্রপটের) সাহায্যেও এভাবে ঝুলনোৎসব করা যেতে পারে।

ভগবান শ্রীবলরামের আবির্ভাব দিবস

ঝুলনযাত্রার শেষ দিনটি হল ভগবান শ্রীবলরামের আবির্ভাব দিবস। দুপুর পর্যন্ত উপবাস, তারপর মহাভোজ। বলরামকে মধু নিবেদন করুন; এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলার ষষ্ঠ অধ্যায় এবং লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ থেকে ভগবান শ্রীবলরামের মাহাত্ম্য পাঠ করুন।

জন্মাষ্টমী

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবস। কৃষ্ণাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-গোকুলাষ্টমী—প্রভৃতি নামেও এটি পরিচিত। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উপবাস এবং জাগরণ; তারপর একাদশীর দিনের মত প্রসাদ সেবন। লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ থেকে সারাদিন প্রচুর পাঠ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা

জন্মাষ্টমীর ঠিক পরের দিন হল নন্দোৎসব; শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্বক এই দিনে এই জড়জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সকল ইসকন ভক্তবৃন্দের কাছে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসব; কেননা শ্রীল প্রভুপাদের করুণা ব্যতীত আমাদের কেউই কৃষ্ণভক্তি অবলম্বনে সমর্থ হব না। ব্যাসপূজা উৎসব এইভাবে উদযাপিত হয় ঃ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত উপবাস পালিত হয়। ভক্তগণ একত্রে সমবেত হয়ে শ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কার্যাবলী সম্বন্ধে

শ্রবণকীর্তন করেন। পূর্ব দিনের জন্মাষ্টমী পালনের ফলে ভক্তরা একটু ক্লান্তি অনুভব করতে পারেন; কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে শ্রীল প্রভুপাদের মহিমাকীর্তনের উদ্দেশ্যে তারা সে ক্লান্তি উপেক্ষা করেন। এই দিন শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী গ্রন্থগুলি (যেমন শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত) এবং ব্যাসপূজা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ পুস্তিকাগুলি থেকে পাঠ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের স্বকণ্ঠের ভজন কীর্তন এবং ভাষণের রেকর্ডিং বাজানো হয়। ভক্তগণ—বিশেষতঃ শ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যক্ষ শিষ্যগণ প্রভুপাদের মহিমা কীর্তন করেন এবং প্রভুপাদ সম্পর্কে তাদের নিজ নিজ অনুভব ব্যক্ত করেন।

দুপুর বারোটায় একই সঙ্গে বিগ্রহসমূহকে এবং প্রভুপাদকে প্রচুর উপকরণ সমন্বিত এক মহাভোজ নিবেদন করা হয়। এর পর অনুষ্ঠিত হয় পুষ্পাঞ্জলী (শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসাসনে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন)।

পুষ্পাঞ্জলী অনুষ্ঠানটি এরকম ঃ প্রত্যেক ভক্তকে অঞ্জলি-ভর্তি ফুল দেওয়া হয়। একজন ভক্ত গুরুপ্রণাম মন্ত্র (নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায়) উচ্চারণ করেন, আর সমবেত ভক্তবৃন্দ তাঁকে অনুসরণ করেন। মন্ত্রোচ্চারণের শেষে পূর্বোক্ত ভক্তটি বলেন "পুষ্পাঞ্জলী", তখন গুরুদেবের (প্রভুপাদের) চরণকমলে পুষ্প অর্পণ করা হয়। তারপর সকল ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করেন। এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সকল ইসকন ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ব্যাসপূজাও পালন করেন।

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস দুপুর পর্যন্ত উপবাস এবং তারপর ভোজ—এইভাবে উদ্‌যাপিত হয়।

রাধাষ্টমী

জন্মাষ্টমীর দু'সপ্তাহ পর শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাব তিথি আসে। দুপুর পর্যন্ত উপবাস, তারপর ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলার অধ্যায় ২৩, ৮৬-৯২ শ্লোকসমূহে শ্রীমতী রাধারাণী সম্পর্কে পাঠ করুন; এছাড়াও লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থে 'গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা'—শীর্ষক দ্বাদশ অধ্যায় পাঠ করুন।

বামন দ্বাদশী

ভগবানের অবতার শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব দিবস। শ্রীমদ্ভাগবত, অষ্টম স্কন্ধ ১৮-২২ অধ্যায়ে শ্রীবামনদেবের লীলাকথা পাঠ করুন।

গোবর্ধন পূজা, অন্নকূট মহোৎসব এবং গোপূজা

এই তিনটি অনুষ্ঠান একই দিনে উদযাপিত হয়। গোবর্দ্ধন পর্বতের পূজার মাধ্যমে গোবর্দ্ধন-পূজা উৎসব করা হয়। আর অন্নকূট মহোৎসব করার জন্য প্রথমে অন্নাদি বহুবিধ প্রসাদের "গোবর্দ্ধন পর্বত" তৈরী করুন। তারপর সেই প্রসাদ-পর্বতের পূজা করুন এবং প্রসাদ-পর্বতটি পরিক্রমা করুন। তারপর জনে জনে সকলকে এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করুন।

শ্রীল প্রভুপাদের তিরোভাব দিবস

গোবর্দ্ধন পূজার পর এই দিবস আসে। আর এই অনুষ্ঠানটি ঠিক ব্যাসপূজার মত; তবে এ-দিন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় প্রভুপাদের বিরহ-অনুভূতি খুব তীব্র থাকে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-এর তিরোভাব দিবসও একইরকমভাবে পালিত হয়। দুপুর পর্যন্ত উপবাস, তারপর ভোজ।

মহান বৈষ্ণবগণের এই জগত থেকে অপ্রকট হবার দিনগুলিতে তিরোভাব উৎসব উদযাপন করা হয়। এই দিনগুলিকেও উৎসব হিসাবে পালন করা হয়, কেননা জড়দেহ ত্যাগের মাধ্যমে একজন বৈষ্ণব প্রদর্শন করেন—কিভাবে মায়াকে জয় করতে হয় এবং ভগবদ্ধামে ভগবানের নিত্যলীলা প্রবেশ করতে হয়।

শ্রীঅদ্বৈত-আচার্যের আবির্ভাব দিবস

দুপুর পর্যন্ত উপবাস এবং তারপর ভোজ। **শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত,** আদিলীলা ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ করুন।

বরাহ দ্বাদশী

ভগবান বরাহদেবের আবির্ভাব তিথি। **শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয়স্কন্ধ,** ত্রয়োদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করুন।

নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী

ভগবান নিত্যানন্দের আবির্ভাব দিবস। **শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত,** আদিলীলা, পঞ্চম অধ্যায় শ্রবণ করুন।

দিব্যধাম দর্শন

সারা ভারত-জুড়ে অসংখ্য বৈষ্ণব তীর্থস্থান ছড়িয়ে রয়েছে; আজও ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ সে-সব স্থান দর্শন করে থকেন। এরকম দিব্যস্থান দর্শনের মাধ্যমে ভ্রমণের প্রবণতা সঠিকভাবে চরিতার্থ করা যায়।

ধামবাসী সাধুদের সঙ্গ এবং তাদের কাছ থেকে ভাগবৎকথা শ্রবণের মাধ্যমে এরকম তীর্থযাত্রার যথার্থ সুফল গ্রহণ করতে হয়—এটাই শাস্ত্রসমূহের উপদেশ। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই আধুনিক যুগে পারমার্থিক শিক্ষাদানের কেন্দ্রস্থল হিসাবে তীর্থক্ষেত্রগুলির গুরুত্ব মানুষ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবন এবং শ্রীধাম মায়াপুর এই ব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ দুটি স্থান, কেননা তা হল পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবস্থল। মায়াপুর এবং বৃন্দাবন ধামে ইসকনের সুন্দর সুন্দর মন্দির রয়েছে, যেখানে দূরাগত অতিথি এবং ভক্তদের আহার ও রাত্রিযাপনের সুবন্দোবস্ত রয়েছে, এই দুটি কেন্দ্রেই শিক্ষিত উন্নত সব ভক্তরা রয়েছেন যাদের সংগে আধ্যাত্মিক জ্ঞান এবং পারমার্থিক প্রগতির জন্য আলোচনা পরামর্শ করা যেতে পারে। সকল ভক্তগণকে শ্রীমায়াপুর এবং শ্রীবৃন্দাবনের ইসকন মন্দির যে-কোন সময় পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অন্যান্য যে-সমস্ত তীর্থস্থানে ইসকনকেন্দ্র রয়েছে সেগুলি হল ঃ তিরুপতি, পুরী, কুরুক্ষেত্র, গুরুভায়ুর এবং পাঞ্জাবপুর।

শাস্ত্রানুসারে যে-স্থানে বিষ্ণু-বিগ্রহ অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং বিশেষতঃ যে স্থানে ভক্তগণ কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়াই ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত, সেই স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র।

সেইজন্য সকল ইসকন কেন্দ্রসমূহ—এমনকি বড় বড় শহরে স্থাপিত কেন্দ্রগুলিও কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তদের দর্শন, তাদের কৃপাশীষ লাভ এবং তাদের সেবা করার উপযুক্ত স্থান। অনেক ইসকন কেন্দ্র নিয়মিত ভাবে কৃষ্ণভক্তি-বিষয়ক সেমিনার, বিভিন্ন কোর্স এবং প্রশিক্ষণ কার্যসূচী পরিচালিত করে থাকে। এ-বিষয়ে আরও জানার জন্য আপনার নিকটবর্তী ইসকন কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।

নগর সংকীর্তন

যখন মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে অনেক ভক্তবৃন্দ মিলিত হয়ে গ্রাম নগরের পথ দিয়ে সংকীর্তন শোভাযাত্রা করেন তখন তাকে বলা হয় নগর সংকীর্তন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হলেন পরম

পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং, তিনি নিজে সংকীর্তন আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন। এভাবে প্রকাশ্য পথে কৃষ্ণের দিব্য নাম সংকীর্তনের ফলে পারমার্থিক চেতনা-বিহীন কৃষ্ণবিমুখ জনগণ—প্রকৃতপক্ষে সকল জীব-সত্তাই কৃষ্ণকৃপা লাভ করে, যাদের কৃষ্ণভক্তি অর্জনের অন্য কোন সুযোগ নেই।

এরকম প্রকাশ্যে দিব্যনাম সংকীর্তনের ফলে কলিযুগের প্রভাবে কলুষিত হয়ে যাওয়া পরিবেশ পবিত্র হয়, আর সংকীর্তনে অংশ-গ্রহণকারী সকলেই মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের প্রিয়জন হয়ে ওঠেন। এই কীর্তনে যতবেশী ভক্ত যোগদান করেন ততই ভাল। তবে যদি অনেক সংখ্যক ভক্ত না মেলে তাহলে তিন-চারজন এমনকি দুজন বা একজনও প্রকাশ্য কীর্তনে যেতে পারেন। সংকীর্তন দলের সাথে যদি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহ এবং কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, তাহলে পরিবেশটি আরও বেশি অপ্রাকৃত ভাবোদ্দীপক হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে যদি বহুবর্ণ চিত্রিত রঙীন ফেস্টুন, পতাকা ইত্যাদি নেওয়া হয়, তাহলে এক আনন্দোচ্ছল উৎসবমুখর পরিবেশ গড়ে ওঠে। আর মেগাফোনদি যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে উচ্চগ্রামে কীর্তন সম্প্রচারের ব্যবস্থা করলে তা আরও বেশী সংখ্যক জীবের কাছে ভগবানের মঙ্গলময় দিব্য নাম পৌঁছে দিতে পারে।

এভাবে হরিনাম সংকীর্তন করুন—যত বেশি সম্ভব, যত দীর্ঘক্ষণ সম্ভব—তাহলে অচিরেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে আপনি ধন্য হবেন, সন্দেহ নেই।

ভগবানের দিব্য নামের প্রচার

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় (১৮/১৯) বলেছেন, যে ভক্ত তাঁর বাণী জগতে প্রচার করে সেই ভক্তের চেয়ে প্রিয়তর তাঁর আর কেউ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

যারে দেখ তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার' এই দেশ ॥

"যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকেই তুমি ভগবদ্‌গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান কর। আমার আজ্ঞায় এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে তুমি এই দেশ উদ্ধার কর।" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৭-১২৮)

অতএব কেবল নিজের উন্নতির জন্য ভক্তি-অনুশীলন করে সন্তুষ্ট থাকলে হবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে কৃষ্ণভাবনামৃতকে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ভক্তকে অবশ্যই উদ্যমশীল হতে হবে।

প্রত্যেকেই প্রচার করতে পারেন। এমনকি কোন ভক্ত যদি বৈষ্ণব দর্শনে খুব অভিজ্ঞ নাও হন, তাতে কিছু ক্ষতি নেই। তিনি কেবল যারই সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হবে, তাকেই হরেকৃষ্ণ কীর্তনের অনুরোধ জানাতে পারেন। অবশ্য যারা প্রচার কার্যে সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত তাদের নিয়মিত শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী পাঠ করা প্রয়োজন।

প্রচারের সবচেয়ে ভাল পন্থা হল শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী বিতরণ। আমরা কারও সংগে শুধু কয়েক মিনিট কথা না বলে তাকে যদি একটি গ্রন্থ দিই, তাহলে তিনি এটি বাড়ীতে অন্যান্যদের সংগে তা পড়তে পারেন, অন্যকেও দিতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপাশক্তিপ্রাপ্ত শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গ্রন্থ সমূহে কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শনকে সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর গ্রন্থ পাঠ খুব ফলপ্রদ। আর একটি গ্রন্থ কাউকে দিলে অনেকে তা পড়তে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ সেজন্য গ্রন্থ বিতরণকে সবচেয়ে কার্যকরী প্রচাররূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

"সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতের মত কোন সাহিত্য নেই, এর কোন তুলনাই নেই। এ-গ্রন্থটি অন্য কিছুর সাথে তুলনীয় হতে পারে না—এটি অনুপম, অ-প্রতিদ্বন্দ্বী। এই অপ্রাকৃত গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ মানব সমাজের মঙ্গলের জন্য। প্রতিটি শব্দ—প্রত্যেকটি শব্দ। সেজন্য আমরা গ্রন্থ-বিতরণের উপর এত গুরুত্ব দিচ্ছি। যে-ভাবে হোক, যদি কারও হাতে গ্রন্থটি পৌঁছায়, তাহলে সে উপকৃত হবে। অন্ততঃ সে চিন্তা করবে, "ওরা বইটির এত দাম নিয়েছে, দেখিই না এর মধ্যে কি আছে!" যদি সে একটি শ্লোকও পাঠ করে, তাহলে তার জীবন সার্থক হবে, সে ধন্য হবে। একটি শ্লোক—যদি সে কেবল একটি শব্দও পাঠ করে—সে ধন্য হবে। এটি এমনই এক অপূর্ব ব্যাপার। সেজন্য আমরা এত গুরুত্ব দিয়ে বলছি : কেবল গ্রন্থ বিতরণ কর, গ্রন্থ বিতরণ কর, গ্রন্থ বিতরণ কর।"

—শ্রীল প্রভুপাদ

প্রচারকার্য এবং গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীদের কর্তব্য সম্পর্কে নীচের উদ্ধৃতাংশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় :

"সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে দ্বারে দ্বারে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে—তাঁর সাধ্য অনুসারে সারা পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ করে গৃহীদেরকে কৃষ্ণচেতনার অমৃতময় আলোক বিতরণ করা। যিনি গৃহী কিন্তু একজন সন্ন্যাসীর দ্বারা দীক্ষিত, তাঁর কর্তব্য হল গৃহে থেকে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। সাধ্যানুসারে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজনদের গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা তাঁর কর্তব্য। অর্থাৎ তাঁর উচিত গৃহে কৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন এবং ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে পাঠের অনুষ্ঠান করা। পাঠ করা মানে হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা এবং ভগবদ্গীতা থেকে কৃষ্ণকথা আলোচনা করা।

কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য বিপুল গ্রন্থ-সম্ভার রয়েছে। প্রত্যেক গৃহস্থের কর্তব্য হল তাঁর সন্ন্যাসী গুরুদেবের নিকট থেকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করা। ভগবৎ সেবার পন্থায় একটি শ্রম-বিভাজন রয়েছে। গৃহস্থের কর্তব্য অর্থসংগ্রহ করা—এটি সন্ন্যাসীর কর্তব্য নয়। সন্ন্যাসীকে অর্থ-উপার্জন করতে হয় না—এ বিষয়ে তিনি পূর্ণরূপে গৃহীদের উপর নির্ভরশীল। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য বা বৃত্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা, এবং তাঁর আয়ের অন্ততঃ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কৃষ্ণভক্তির প্রচার কার্যে ব্যয় করা; শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁর পরিবার প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করা এবং বাকি পঁচিশ ভাগ কোন জরুরী অবস্থার জন্য সঞ্চয় করে রাখা। শ্রীল রূপ গোস্বামী এই দৃষ্টান্তটি দিয়ে গেছেন, এবং ভক্তদের কর্তব্য হচ্ছে তা অনুসরণ করা।" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩-২১-৩১-তাৎপর্য)

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
'আচার,' 'প্রচার,' নামের করহ দুই কার্য্য ।
তুমি—সর্বগুরু, তুমি—জগতের আর্য্য ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪/১০২-১০৩)

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ' উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৭/১২৮)

মায়াবাদ দর্শন

'মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ'।

-শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬, ১৬৯

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গ্রন্থাবলীর সর্বত্র পুনঃ পুনঃ মায়াবাদীদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। "মায়াবাদী" আখ্যাটি প্রায়ই

'জড়জাগতিক ভোগবিলাসে লিপ্ত বিষয়াসক্ত মানুষ'-কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। প্রকৃত অর্থে "মায়াবাদী" বলতে মায়াবাদ দর্শনের অনুগামীকে বোঝায়। মায়াবাদ হল আদি শঙ্করাচার্য প্রচারিত 'অদ্বৈতবাদ'-এর অপর নাম।

মায়াবাদ অনুসারে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে সম্পাদিত সেবামূলক কর্ম (ভক্তি)—সবই হল মায়ার সৃষ্টি। তারা বিশ্বাস করে যে সবকিছুই "এক "(অদ্বৈত) এবং অধ্যাত্ম-জীবনের চরম লক্ষ্য হল ভগবানের সংগে লীন বা এক হয়ে যাওয়া। এদের বলা হয় নির্বিশেষবাদী; এরা ভগবানকে নিরাকার বলে মনে করে। পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—একথা তারা স্বীকার করতে চায় না।

এই মায়াবাদ-দর্শন সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাইরেও বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে ব্যাপ্তি লাভ করেছে। পরমেশ্বর ভগবান হতে মানুষের মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করে, 'তারা ভগবানের সংগে এক হয়ে যেতে পারে'—মানুষকে এরকম মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এই মায়াবাদ বিশ্বের পারমার্থিক জীবনধারায় এক চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। সেইজন্য বৈষ্ণব আচার্যবর্গ, বিশেষ করে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য, শ্রীপাদ মাধ্বাচার্য এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দৃঢ়তার সাথে মায়াবাদের বিরোধিতা করেছেন। বহুবিধ শাস্ত্রপ্রমাণ এবং সাধারণ জ্ঞান-ভিত্তিক যুক্তি-বিচারের সাহায্যে মায়াবাদ-দর্শনের অসংখ্য মৌলিক দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করে তারা সুসম্বদ্ধভাবে এই মতবাদ খণ্ডন করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ (বিষ্ণু) হচ্ছেন পরমপুরুষ—এটিই হল পরম সত্যের যথার্থ উপলব্ধি। *ভগবদ্গীতাতে* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিপাদন করেছেন এবং সকল বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শীগণ

তা গ্রহণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। তিনি নিরাকার নন, তিনি শাশ্বত কাল ধরে তার নিত্য চিন্ময় রূপে ('সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ' রূপে) বিরাজিত। ভগবান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, এবং অপর সকল জীব তাঁর নিত্য সেবক-এটাই হল অপ্রাকৃত পারমার্থিক সত্যের সর্বোচ্চ উপলব্ধি। সেইজন্য আমাদের ভগবান হবার চেষ্টা করা উচিত নয়। আমাদের কেবল বিনম্রচিত্তে ভগবানের অধীনতা স্বীকার করে নিতে হবে, তাঁর শরণাগত হতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর পূর্বতন মহান বৈষ্ণব আচার্যগণের অনুসৃত ধারায় সর্বদাই মায়াবাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বারবার দৃঢ়ভাবে এই মতবাদের দোষত্রুটি অসারতা তুলে ধরে তা খণ্ডন করেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থসমূহের সর্বত্রই মায়াবাদ ও মায়াবাদীদের উল্লেখ রয়েছে, তবে বিষয়টির সামগ্রিক বিশ্লেষণ পেতে হলে পাঠকবৃন্দকে "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা" গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে হবে।

আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ

প্রায়ই পরিবারের কোন সদস্য কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করলে অন্য সকলেই ভক্তে পরিণত হন। এটি একটি অনুকূল পারিবারিক পরিবেশ।

অবশ্য যদি পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভক্ত হতে না চায়, তখন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। কখনো কখনো শুধু পরিবারের সদস্যরাই নয়, বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীরাও উদ্যমী নবীন ভক্তকে বাতিকগ্রস্ত বলে মনে করে এবং তার উপর সবধরনের চাপ দিতে শুরু করে। কখনো কখনো তারা ভক্তটিকে অকৃতজ্ঞ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন বলেও ভাবতে থাকে।

এটা নতুন কিছু নয়। বহুযুগ আগে মহান কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুর হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের একমাত্র অপরাধ ছিল যে তিনি তাঁর বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

যাঁরা শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির প্রতি এমনকি অল্পমাত্রও আকৃষ্ট হয়েছেন, প্রহ্লাদ মহারাজের দৃষ্টান্ত স্মরণ করে তারা কোন কিছুর বিনিময়েই তা ত্যাগ করতে পারেন না। ভক্তটি হয়ত তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে কৃষ্ণভক্তি গ্রহণে সম্মত করাতে ব্যর্থ হচ্ছেন, কিন্তু আত্মীয় স্বজনরাও সেই ভক্তকে কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগে রাজী করাতে পারেন না।

সর্বদা আমাদের অস্তিত্বের আসল বাস্তবসত্যের কথা ভেবে দেখুন ঃ বন্ধুবান্ধব, পরিবার, দেশ এবং আরও সকলকিছুর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সদা পরিবর্তনশীল এবং ক্ষণস্থায়ী। এটি ঠিক নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়া তৃণের মত। কখনো হয়ত কিছু তৃণ একত্রে মিলে একটি গুচ্ছ তৈরী করে; তার পর অচিরেই ঢেউয়ের আঘাতে তারা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হয়, এবং আবার হয়ত অন্যান্য তৃণের সঙ্গে নুতন গুচ্ছ তৈরী করে। ঠিক তেমনি প্রবল পরাক্রমশালী কাল-রূপ নদীতে আমরা এক দেহ হতে অপর দেহে ভেসে চলেছি। প্রতিবারই আমরা আমাদের নুতন পাওয়া একটি কুকুরদেহ, শূকরদেহ, মানব দেহে বা অন্য কোন জীবদেহে প্রবলরূপে আসক্ত হয়ে পড়ছি।

আরেকটি উপমাও দেওয়া যেতে পারে ঃ একটি পান্থশালায় বা হোটেলে যখন কিছু অপরিচিত ভ্রমণরত অতিথি দু'একদিন থাকবার উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়, তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়। কিন্তু তারা পরস্পরের খুব বেশী ঘনিষ্ঠ হয় না—কেননা তারা জানে যে সামান্য কয়েকদিন পরই প্রত্যেকই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।

জড়জাগতিক জীবনধারায় পারিবারিক সম্পর্ক এবং দায়-দায়িত্বকে সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে ভাবা হয়। কারণ পারিবারিক জীবনই জড়-অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ (শ্রীমদ্ভাগবত ৫-৫-৫)। কিন্তু সমস্ত ভক্তদের—এমনকি যেসব ভক্ত গৃহে পরিবারের সদস্যদের সাথে জীবন কাটাচ্ছেন তাদেরও দৃঢ়ভাবে জানতে হবে, এই পারিবারিক আসক্তির আসল উৎসটি কি; আর তা হল : মায়া।

আরেকটি কথা হল, যাঁরা নিজেদের সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের পারিবারিক বা সামাজিক—কোনরকম দায় দায়িত্ব থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১-৫-৪১) স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে :

দেবর্ষি-ভূতাপ্ত-নৃণাং পিতৃণাম্
ন কিঙ্করো নায়ং ঋণী চ রাজন্ ।
সর্বাত্মনা য শরণং শরণ্যম্
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্ ॥

"যিনি সকল বাসনা পরিত্যাগ করে অনন্য চিত্তে মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দের পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করেছেন এবং সর্বান্তঃকরণে ভক্তিযোগ অবলম্বন করেছেন, তাঁর দেব, ঋষি, জীবকুল, পিতৃপুরুষগণ, মানবসমাজ বা পরিবারের প্রতি কোন ঋণ, দায়বদ্ধতা বা কর্তব্য থাকে না।"

প্রকৃতপক্ষে, যে-ভক্ত নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের চরণাম্বুজে সমর্পণ করেছেন, তিনি তাঁর পরিবারের সবচেয়ে বড় সেবা করেন। কারণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শুদ্ধ ভক্তের উর্ধ্ব ও অধঃ অনেক পুরুষকে দুরতিক্রম্য এই জড়-সংসার-কূপ হতে উদ্ধার করেন (শ্রীমদ্ভাগবত-৭-১০-১৮)।

কৃষ্ণভক্তির জন্য যা কিছু অনুকূল তা সবই গ্রহণ করতে হবে, আর যা কিছু প্রতিকূল তা বর্জন করতে হবে। যে পরিবেশ একজন

ভক্তের পক্ষে অনুকূল, তা অন্য একজনের পক্ষে সহায়ক নাও হতে পারে।

যদি আমাদের গৃহ যথার্থ কৃষ্ণভক্তি অর্জনের পক্ষে অনুকূল না হয়, তবে পরিবারের সদস্যদের কৃষ্ণসেবায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য সবরকমে আমাদের চেষ্টা করা কর্তব্য। অন্ততপক্ষে তাঁরা যাতে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনকে সহ্য ও শ্রদ্ধা করতে শেখেন—সেজন্য আমরা চেষ্টা করতে পারি।

যারা কৃষ্ণভক্তি অর্জনের বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প, অথচ যদি অভক্ত-পরিবৃত গৃহে তাদের বাস করতে হয়, তবে আমরা তাদের এটুকুই বলতে পারি যে কৃষ্ণভক্তি চর্চার বিধি-নিয়মের সঙ্গে আপস না করেও তারা যেন গৃহে যতদূর সম্ভব শান্তি রক্ষা করে চলেন। অবশ্য এসব পরিবারের সদস্যরা এমনিতে খুব ভালই; কিন্তু আমরা এমন আশা করতে পারিনা যে সকলেই কৃষ্ণভাবনামৃতের সর্বোচ্চ গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। এটা প্রায়ই ঘটে থাকে যে একজন ভক্ত ধৈর্য ও অধ্যাবসায়ের সাথে চেষ্টা চালিয়ে তাঁর পরিবারের কৃষ্ণবিমুখ, এমনকি শত্রুভাবাপন্ন সদস্যদেরও উত্তম কৃষ্ণভক্তে পরিণত করেছেন।

আর সবরকম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি পরিবারের সদস্যবর্গ কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি অনমনীয়রূপে বিরূপভাবাপন্ন থাকেন, তাহলে সেই গৃহত্যাগ করে পূর্ণ সময়ের জন্য শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হওয়া কর্তব্য। অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ভক্তদের সঙ্গে পরামর্শের মাধ্যমে এই গৃহত্যাগের বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত। যে-ব্যক্তি কৃষ্ণভক্তি লাভ করাকে জীবনের পরমলক্ষ্যরূপে নির্ধারিত করেছেন, এমনকি ইতিমধ্যে তিনি গৃহস্থ জীবনে জড়িয়ে পড়লেও যতশীঘ্র সম্ভব গৃহস্থালীর আকর্ষণ পরিত্যাগ করার জন্য তাঁর সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩-২৩-৪৯, তাৎপর্য)।

অবশ্য যে-সব গৃহস্থের স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি তার উপর নির্ভরশীল, তাদের হঠাৎ গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় না। কিন্তু যাদের বয়স পঞ্চাশ বছরের বেশী এবং যে-সব যুবক এখনো অবিবাহিত, তাদের গৃহত্যাগ করে ভক্তসঙ্গে যোগদান করে পূর্ণ সময় কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনের কথা গভীর ভাবে ভেবে দেখা কর্তব্য। সাধারণ জড় বিষয়াসক্ত মানুষের মত তাদের সমগ্র জীবনটি গৃহে অতিবাহিত করার কোন প্রয়োজন নেই। বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে গৃহীদের অবশ্যই পঞ্চাশ বছর বয়সের পর গৃহত্যাগ করা কর্তব্য (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩-২৪-৩৫, তাৎপর্য)।

একটি বিষয়ে সর্বদা দৃঢ় নিশ্চিত থাকা উচিত : যত কষ্টকরই হোক না কেন—কোন পরিস্থিতিতেই ভগবদ্ভক্তির পথ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে ভোলেন না, দৃঢ় শ্রদ্ধায় ভক্তিচর্চায় নিয়োজিত থাকেন, কৃপাময় কৃষ্ণ তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন।

কৃষ্ণভক্তিতে অবিচলিত থাকবার জন্য আমাদের দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ থাকা উচিত। যদি পরিবার পরিজন, বন্ধুবান্ধবেরা আমাদের না বুঝতে পারে—এমন কি সমগ্র জগতও যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায়, তবু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পক্ষে রয়েছেন, সুতরাং আমাদের কিছুই হারানোর নেই, বা শঙ্কিত হবারও কোন কারণ নেই।

নারী-পুরুষ সংসর্গে বিধিনিষেধ

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোঽয়মহং মমেতি ॥

"নারী পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ জড় অস্তিত্বের মূল ভিত্তি। এই অলীক আকর্ষণ, যা নারী এবং পুরুষের হৃদয়কে পরস্পর সংবদ্ধ করে—তার বশবর্তী হয়ে মানুষ দেহ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি আত্মীয় পরিজন এবং ধনের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এই ভাবে সে মায়ার অলীকতায় মোহিত হয়ে পড়ে এবং 'আমি', 'আমার'—এরূপ মিথ্যা, ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে সবকিছু চিন্তা করতে থাকে।" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৫-৫-৮)

বৈদিক সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষ মেলামেশায় বিধিনিষেধ কেবল ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের জন্যই নয়, বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রেও তা আরোপিত হয়েছে। বিবাহিত দম্পতি অবশ্যই পরস্পর মেলামেশা করবেন; কিন্তু সে মেলামেশায় উদ্দেশ্য হবে কৃষ্ণভক্তিতে উন্নতি সাধনে পরস্পরকে সহায়তা করা। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর অনাবশ্যক মেলা-মেশাও উভয়ের অধঃপতনের কারণ হয়ে উঠতে পারে (বিষয়টি কৃষ্ণভাবনাময় ব্রহ্মচর্য গ্রন্থটিতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে)।

কৃষ্ণভক্ত দম্পতি ভক্তসন্তান জন্মদানের জন্য মিলিত হয়ে তাদের দাম্পত্য সম্পর্ককে পবিত্র করে তোলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গৃহী শিষ্যদের যৌনসংসর্গের পূর্বে অন্ততঃ পঞ্চাশ মালা জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মিলনকালে পিতামাতার চেতনা অনুসারে তদুপযোগী একটি জীবাত্মা মাতৃগর্ভে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং কৃষ্ণচেতনাময় হয়ে সন্তানের জন্মদান করা হলে সন্তানেরাও কৃষ্ণভক্ত হবে।

কলহ ও প্রতারণাপূর্ণ এই আধুনিক যুগে বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর শান্তিপূর্ণভাবে একত্রে বসবাস প্রায়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য যদি স্বার্থকেন্দ্রিক ইন্দ্রিয় ভোগতৃপ্তির পরিবর্তে

কৃষ্ণভক্তি অর্জন হয়, তাহলে অবশ্যই পারিবারিক জীবন পবিত্র ও শান্তিময় হয়ে উঠবে।

কৃষ্ণভাবনাময় গার্হস্থ্য জীবনের বিষয়টি খুব বিস্তৃত; বর্তমান গ্রন্থে এটির বিশদ আলোচনা পরিসর নেই। যাঁরা পারিবারিক জীবনধারাকে পারমার্থিক করে তুলতে আগ্রহী, তাঁরা ইসকনের অভিজ্ঞ, প্রবীণ গৃহস্থ সদস্যগণের সঙ্গে পরামর্শ এবং পথনির্দেশের জন্য যোগাযোগ করলে উপকৃত হবেন।

ভক্তদের প্রাথমিক করণীয় ও অকরণীয় কিছু নির্দেশ

১। বৈষ্ণবভক্তের সবসময় গুরু, ভগবান, ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে প্রণাম করা উচিত।

২। সর্বদা কাচা, ধোয়া কাপড় জামা পরা উচিত।

৩। কখনো রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়।

৪। কখনোই নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়।

৫। অতিরিক্ত ঘুমানো বা জেগে থাকা উচিত নয়।

৬। তিলক ধারণ করার পর আচমন করা উচিত নয়।

৭। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা উচিত নয়।

৮। প্রস্রাব করার পর জল ব্যবহার করা উচিত।

৯। পায়খানা করার পর স্নান করা উচিত।

১০। প্রসাদ পাওয়ার পূর্বে ও পরে হাত-পা ও মুখ ভালো ভাবে ধোওয়া উচিত।

১১। কখনো মিথ্যাকথা বলা, হিংসা করা, অপরের বদনাম করা, কারো সঙ্গে শত্রুতা করা উচিত নয়।

১২। কখনো কারো কিছু চুরি করা উচিত নয়।

১৩। অট্টহাস্য করা বা ব্যঙ্গ করা উচিত নয়।

১৪। মুখ না ঢেকে হাঁচা, হাইতোলা উচিত নয়।

১৫। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়।

১৬। প্রসাদ পাওয়ার সময় থু থু করা বা প্রসাদ পাওয়া অবস্থায় কাউকেও পরিবেশন করা উচিত নয়।

১৭। মহিলাদের প্রতি হিংসা করা বা তাদের প্রতি অপমান করা উচিত নয়।

১৮। কখনো কারো ক্ষতি করা উচিত নয় বরং উপকার করার চেষ্টা করা উচিত।

১৯। বিবেকহীন অসৎ লোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

২০। অসৎশাস্ত্র পাঠ বা অধ্যয়ন করা উচিত নয়।

২১। পতিত ব্যক্তির আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়।

২২। রাত্রিতে অসতী মহিলার সঙ্গে ঘোরা উচিত নয়।

২৩। অসৎ লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।

২৪। অজ্ঞ, বোকা, পীড়িত, কুৎসিত, খোঁড়া ও পতিত লোককে আঘাত করা উচিত নয়।

২৫। ক্ষৌরকর্ম করলে, শ্মশানে গেলে এবং যৌনসঙ্গ করলে স্নান করা উচিত।

২৬। কারো মাথায় আঘাত করা বা চুল ধরে টানা উচিত নয়।

২৭। বস্ত্রবিহীন স্ত্রী বা পুরুষের দিকে তাকানো উচিত নয়।

২৮। একমাত্র পুত্র বা শিষ্য ছাড়া শিক্ষাদানের সময় কাউকেই প্রহার করা বা তিরস্কার করা উচিত নয়।

২৯। প্রসাদ পাওয়ার পর ঐস্থান সত্বর পরিস্কার করা উচিত।

৩০। রাত্রিতে ছোলার ছাতু এবং দই খাওয়া উচিত নয়।

৩১। কোলের উপর রেখে কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়।

৩২। সন্ন্যাসীদের তিন এবং ব্রহ্মচারীদের দুইবার স্নান করা উচিত।

৩৩। গর্ভ মন্দিরে ঘুমানো উচিত নয়।

৩৪। কখনো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়।

৩৫। খাওয়ার জলে থুথু ফেলা উচিত নয়।

৩৬। কেউ যদি অপমান করে তাকে তিরস্কার করা উচিত নয়, বরং বোঝানো উচিত, যদি না বোঝে তবে সেই স্থান ত্যাগ করা উচিত।

৩৭। ভোর চারটের আগে শয্যা ত্যাগ করা উচিত।

৩৮। প্রতিদিন মঙ্গল আরতিতে যোগ দেওয়া উচিত।

৩৯। খাওয়ার জন্য ডান হাত ব্যবহার করা উচিত।

৪০। ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধোওয়া ও স্নান করা উচিত।

৪১। ব্রহ্মচারীদের কখনো একা একা ঘোরা উচিত নয়।

৪২। ঘরের মধ্যে চুল, দাঁড়ি, নখকাটা বা দাঁত মাজা উচিত নয়।

৪৩। প্রতিদিন ভালোভাবে ঘর ঝাড়ু দেওয়া ও ধোওয়া উচিত।

৪৪। গুরুদেবের আদেশ বা নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেই আদেশ পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

৪৫। শ্লোক এবং স্তোত্রাবলী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা উচিত।

৪৬। কারো নিকট যাতে কোনরূপ অপরাধ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

৪৭। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে হাত-পা ভালো করে ধোওয়া উচিত।

৪৮। ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ, কৃষ্ণলীলার চিন্তা বা কৃষ্ণনাম করা উচিত।

৪৯। সকালে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবি দর্শন করা এবং প্রণাম করা উচিত।

৫০। জপ-মালা কখনো মাটিতে রাখা উচিত নয়; জপমালা নিয়ে বাথরুমে যাওয়া উচিত নয়; জপমালাকে সর্বদা পবিত্র বলে মনে করা উচিত। ১৬ মালার বেশি জপ করতে অভ্যাস করা উচিত; কমপক্ষে মালা সম্পূর্ণ করে রাখা উচিত। কারো চরণ স্পর্শ করে সেই হাতে জপমালা স্পর্শ করা উচিত নয়।

দশবিধ নাম অপরাধ

১। যে সমস্ত ভক্ত ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করার জন্য নিজেদের সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছেন তাঁদের নিন্দা করা।

২। শিব, ব্রহ্মা আদি দেবতাদের নাম ভগবানের নামের সমান অথবা তা থেকে স্বতন্ত্র বলে মনে করা।

৩। গুরুদেবের আজ্ঞার অবজ্ঞা করা।

৪। বৈদিক শাস্ত্র অথবা বৈদিক শাস্ত্রের অনুগামী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

৫। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার মাহাত্ম্যকে কাল্পনিক বলে মনে করা।

৬। ভগবানের নামে অর্থবাদ আরোপ করা।

৭। নাম বলে পাপ আচরণ করা।

৮। 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' উচ্চারণ করাকে বৈদিক কর্মকাণ্ডে বর্ণিত পুণ্যকর্ম বলে মনে করা।

৯। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে ভগবানের দিব্য নামের মহিমা সম্বন্ধে উপদেশ করা।

১০। ভগবানের নামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস না থাকা এবং তাঁর অগাধ মহিমা শ্রবণ করার পরও বিষয়াসক্তি বজায় রাখা।

দশবিধ ধাম অপরাধ

১। শিষ্যের নিকট শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী গুরুদেবকে অপমান বা অসম্মান প্রদর্শন করা।

২। শ্রীধামকে অস্থায়ী বলে মনে করা।

৩। শ্রীধামবাসী অথবা শ্রীধাম যাত্রীগণের কারও প্রতি উৎপীড়ন বা অনিষ্ট করা অথবা তাঁদেরকে সাধারণ জড়লোক বলে মনে করা।

৪। শ্রীধাম বাসকালে জড়কর্ম করা।

৫। বিগ্রহ অর্চন ও শ্রীনাম কীর্তনকালে অর্থসংগ্রহ করা ও তদ্দ্বারা ব্যবসা করা।

৬। শ্রীধামকে বাংলার মতো কোন জড়দেশ বা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা, শ্রীধামকে কোন দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত স্থানের সমান বলে মনে করা, অথবা শ্রীধামের সীমা নিরূপণের চেষ্টা করা।

৭। শ্রীধাম বাসকালে পাপ কর্ম করা।

৮। বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা।

৯। শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী শাস্ত্রের নিন্দা করা।

১০। শ্রীধামের মাহাত্ম্যকে কল্পিত মনে করে অবিশ্বাস করা।

সেবা অপরাধ

ভগবৎ সেবার বিধিনিষেধ

বৈদিক শাস্ত্রে—৩২টি সেবা অপরাধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে—

১) গাড়িতে করে বা পালকিতে করে অথবা জুতো পায়ে দিয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

২) পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতার জন্য জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা ইত্যাদি মহোৎসব পালনে অবহেলা করা উচিত নয়।

৩) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করতে অবহেলা করা উচিত নয়।

৪) খাওয়ার পর হাত-পা না ধুয়ে ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

৫) দূষিত অবস্থায় মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত নয়।

৬) এক হাতে দণ্ডবৎ প্রণাম করা উচিত নয়।

৭) শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে পরিক্রমা করা উচিত নয়। মন্দির পরিক্রমা করার বিধি হচ্ছে, ভগবানের শ্রীমূর্তিকে দক্ষিণ দিকে রেখে প্রদক্ষিণ করা। প্রতিদিন অন্তত তিনবার মন্দির পরিক্রমা করা উচিত।

৮) শ্রীবিগ্রহের সামনে পা ছড়িয়ে বসা উচিত নয়।

৯) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে হাত দিয়ে হাঁটু, কনুই অথবা পায়ের গোড়ালি ধরে বসা উচিত নয়।

১০) শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে শোয়া উচিত নয়।

১১) ভগবানের সামনে প্রসাদ খাওয়া উচিত নয়।

১২) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়।

১৩) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে জোরে জোরে কথা বলা উচিত নয়।

১৪) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অপরের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়।

১৫) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ক্রন্দন বা চিৎকার করা উচিত নয়।

১৬) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ঝগড়া করা উচিত নয়।

১৭) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে কাউকে তিরস্কার করা উচিত নয়।

১৮) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করা উচিত নয়।

১৯) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে কাউকে কঠোর বচন বলা উচিত নয়।

২০) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে চর্ম ধারণ করা উচিত নয় অর্থাৎ চর্ম নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে যাওয়া উচিত নয়।

২১) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্য কারও স্তুতি বা প্রশংসা করা উচিত নয়।

২২) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে খারাপ কথা বলা উচিত নয়।

২৩) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে বায়ু ত্যাগ করা উচিত নয়।

২৪) ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের পূজা করা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

২৫) শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন না করে কোন কিছু খাওয়া উচিত নয়।

২৬) ঋতু অনুসারে টাটকা ফল এবং শস্য শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা উচিত।

২৭) খাবার প্রস্তুত হওয়ার পর তা ভগবানকে নিবেদন না করে কাউকে দেওয়া উচিত নয়।

২৮) নিঃশব্দে গুরুদেবকে প্রণতি নিবেদন করা উচিত নয়, অর্থাৎ গুরুদেবকে দণ্ডবৎ করার সময় উচ্চস্বরে 'গুরু প্রণতি' উচ্চারণ করা উচিত।

৩০) গুরুদেবের সান্নিধ্যে এলে তাঁর গুণকীর্তন করতে অবহেলা করা উচিত নয়।

৩১) গুরুদেবের সামনে নিজের প্রশংসা করা উচিত নয়।

৩২) ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সামনে অন্যান্য দেবদেবীর নিন্দা করা উচিত নয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে পরমেশ্বর ভগবান তার প্রকৃত প্রমাণ

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই কলিযুগে শচীমাতার গর্ভে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এবং বলরাম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু রূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের হাজার হাজার বছর পূর্বে বিভিন্ন শাস্ত্রে তার প্রমাণ রয়েছে।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ভাঃ (১১/৫/৩২)

এই কলিযুগে, সুমেধা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ অবিরাম কৃষ্ণ-কীর্তনকারী ভগবানের অবতারকে আরাধনা করার জন্য সংকীর্তন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যদিও তাঁর গায়ের বর্ণ অ-কৃষ্ণ, তবুও তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। তিনি তাঁর সঙ্গী, সেবক, অস্ত্র এবং অন্তরঙ্গ পার্ষদে পরিবৃত। (মহারাজ নিমির প্রতি শ্রীকরভাজন মুনি)

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ (মহাভারত)

মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের গায়ের রঙ সোনার মতো। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সুললিত সমগ্র দেহটি কাঁচা সোনার মতো। তাঁর সমস্ত দেহ চন্দন-চর্চিত। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন এবং খুব আত্মসংযমশীল হবেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তিনি ভক্তিমূলক সেবায় নিষ্ঠাপরায়ণ এবং সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করবেন।

পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে শচীসূতো ভবিষ্যতি ॥ (কৃষ্ণযামলতন্ত্র)

শচীদেবীর পুত্রসন্তানরূপে পবিত্রধাম নবদ্বীপে আমি আবির্ভূত হব।

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মদ্ভক্তরূপধৃক্ ।
মায়ায়াঞ্চ ভবিষ্যামি কলৌ সংকীর্তনাগমে ॥ (ব্রহ্মযামলতন্ত্র)

ভক্তরূপে পৃথিবীর বুকে আমি স্বয়ং কখনও আবির্ভূত হই। বিশেষ করে, কলিযুগে সংকীর্তন আন্দোলন সূচনার উদ্দেশ্যে শচীনন্দন রূপে আমি আবির্ভূত হই।

কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহহং মহীতলে ।
ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসূতঃ ॥ (পদ্ম পুরাণ)

কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভাগিরথী তীরস্থ রম্যস্থানে গৌরাঙ্গ রূপধারী শচীপুত্ররূপে আমি ভবিষ্যতে অবতীর্ণ হইব।

কলিঘোরতমশ্ছন্নান্ সর্বানাচারবর্জিতম্ ।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ ॥ (বামন পুরাণ)

হে নারদ। কলির ঘোর তমসাচ্ছন্ন-কালে শচীগর্ভে আবির্ভূত হইয়া আমি জগৎকে অনাচার বিবর্জন করাইয়া উদ্ধার করিব।

কলৌ সংকীর্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ।
স্বর্নদীতীরমাস্থায় নবদ্বীপে জনাশ্রয়ে ।
তত্র দ্বিজকুল শুদ্ধসত্ত্বে দ্বিজালয়ে ॥ (বায়ু পুরাণ)

আমি কলিযুগে যুগোচিত নামসংকীর্তন প্রচারের নিমিত্ত, বহুজন সমাকীর্ণ, গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপধামে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে শচীদেবীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব।

অহংপূর্ণো ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ ॥ (আদিযামল)

শচীপুত্ররূপে নবদ্বীপের মায়াপুরে যুগসন্ধিক্ষণে আমি ভবিষ্যতে পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইব।

এছাড়া আরও বহু শাস্ত্র প্রমাণ রয়েছে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ

‘‘কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম-সঙ্কীর্তন।
চারিযুগে চারি ধর্ম-জীবের কারণ ॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
সেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁ'র মহাভাগ্য ॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্তনে মিলিবে সকল ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র ।
ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে ।
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১৪ অধ্যায়)

হরিনাম বিনা জীবের গতি নাহি

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ-নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি 'হরে র্নাম-উক্তি তিনবার ।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম-আদি নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার ॥
(চৈঃ চঃ আ ১৭/২১-২৫)

এই মহামন্ত্র জপ্য ও কীর্তনীয়

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে ।
কৃষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে- ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
প্রভু বলে,—'কহিলাম এই মহামন্ত্র ।
ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥

ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইবে সবার ।
সর্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর ॥
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা জাগরণে ।
অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥
দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া ।
কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মিলি' ।
কীর্তন করেন সবে দিয়া করতালি ॥
এই মত নগরে নগরে সংকীর্তন ।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন ॥ (চৈঃ ভাঃ ম ২৩)
সর্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে' ।
বলিতে আনন্দ-ধারা নিরবধি ঝরে ॥
(চৈঃ ভাঃ আ ১/১৯৯)
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব ।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
(চৈঃ চঃ আ ৭/৮৩)
গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও ।
অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও ॥

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আবির্ভূত হন ১৮৯৬ সালে কলকাতায়। তাঁর সঙ্গে তাঁর

গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রথম মিলন হয় কলকাতায় ১৯২২ সালে। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিলেন তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং সর্বাগ্রগণ্য ভগবদ্ভক্ত। তিনি গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সমস্ত ভারত জুড়ে ৬৪টি মন্দির স্থাপন করেন। এই শিক্ষিত যুবক অভয়চরণকে তাঁর খুব ভাল লাগে এবং বৈদিক জ্ঞান শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে তিনি তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং ১১ বছর পরে ১৯৩৩ সালে এলাহাবাদে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১৯২২ সালে যখন তাঁদের প্রথম মিলন হয়, তখন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রচার করতে অনুরোধ করেন। শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয় মঠের কার্যে সাহায্য করতে থাকেন এবং বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ভাষ্য রচনা করেন। ১৯৪৪ সালে এককভাবে তিনি Back to Godhead নামক একটি ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি নিজেই পাণ্ডুলিপিগুলি টাইপ করতেন, সম্পাদনা করতেন, প্রুফ দেখতেন, সেই পত্রিকাগুলি বিতরণ করতেন এবং সেই প্রকাশনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সংগ্রাম করতেন। একবার শুরু হওয়ার পর, সেই পত্রিকা আর বন্ধ হয়নি; এখনও পর্যন্ত সেই পত্রিকাটি ৩০টি ভাষায় তাঁর পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শিষ্যদের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদের দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তির স্বীকৃতি হিসাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ ১৯৪৭ সালে তাঁকে 'ভক্তিবেদান্ত' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৫০ সালে ৫৪ বছর বয়সে শ্রীল প্রভুপাদ সং

সার-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তার ৪ বছর পরে অধ্যয়ন ও রচনার কাজে আরও গভীরভাবে মনোনিবেশ করবার জন্য তিনি বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেন এবং তার কিছুদিন পরে তিনি বৃন্দাবন ধামে গমন করেন। সেখানে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরের একটি ঘরে তিনি কয়েক বছর ধরে অধ্যয়ন ও গ্রন্থরচনার কাজে গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীরাধা-দামোদর মন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান—আঠারো হাজার শ্লোক সমন্বিত সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সার *শ্রীমদ্ভাগবতের* ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য রচনার কাজ শুরু করেন। তিনি সেখানে Easy Journey to the Other Planets নামক গ্রন্থটিও রচনা করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর, শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুমহারাজের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তারপর শ্রীল প্রভুপাদ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সার সমন্বিত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রামাণিক অনুবাদ, ভাষ্য ও মূল ভাব সহ ৮০টি গ্রন্থ রচনা করেন।

একটি মালবাহী জাহাজে করে যখন তিনি প্রথম নিউ ইয়র্ক শহরে আসেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ সম্পূর্ণ কপর্দকশূন্য। কিন্তু প্রায় এক বছর কঠোর সংগ্রাম করার পর, তিনি ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে 'আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৭ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর অপ্রকট লীলাবিলাস করা পর্যন্ত তিনি নিজেই এই সংস্থাটির পরিচালনা করেন এবং একশটিরও অধিক মন্দির, আশ্রম, স্কুল ও ফার্ম কমিউনিটি সমন্বিত একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে যান।

১৯৬৮ সালে শ্রীল প্রভুপাদ আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে নব বৃন্দাবন নামক একটি পরীক্ষামূলক বৈদিক সমাজ গড়ে তোলেন। প্রায় ২০০০ একর জমির ওপর এই নব বৃন্দাবনের সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁর শিষ্যরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনেক দেশে এই রকম আরও কয়েকটি সমাজ গড়ে তুলেছে।

এ ছাড়া ১৯৭২ সালে শ্রীল প্রভুপাদ ডালাস ও টেক্সাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্য জগৎকে বৈদিক প্রথা অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা দান করে গেছেন। তারপর, তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁর শিষ্যরা ভারতবর্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থাপিত প্রধান শিক্ষাকেন্দ্রের আদর্শ অনুসরণে আমেরিকা ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শিশুদের বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন।

১৯৭৫ সালে বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদের অপূর্ব সুন্দর 'কৃষ্ণ-বলরাম মন্দির' এবং আন্তর্জাতিক অতিথিশালার উদ্বোধন হয়। তা ছাড়া সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের কারুকার্য-খচিত স্মৃতিসৌধ ও মিউজিয়াম বিরাজ করছে। ১৯৭৮ সালে জুহুতে বোম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূলে চার একর জমির ওপর অপূর্ব শ্রীশ্রীরাধা-রাসবিহারীর মন্দির, আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ, অপূর্ব সুন্দর অতিথিশালা ও নিরামিষ ভোজনশালা সমন্বিত একটি বিশাল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীল প্রভুপাদের সব চাইতে উচ্চাভিলাষপূর্ণ পরিকল্পনা হচ্ছে পশ্চিমবাংলার মায়াপুরে ৫০ হাজার কৃষ্ণভক্তদের নিয়ে বৈদিক শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসম্পন্ন বৈদিক জীবনধারার দৃষ্টান্তরূপে সমস্ত পৃথিবীর কাছে আদর্শরূপে প্রতীয়মান হবে।

শ্রীল প্রভুপাদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে তাঁর গ্রন্থসম্ভার। বিদ্বৎ-সমাজ দিব্যজ্ঞান সমন্বিত এই গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা, গভীরতা ও প্রাঞ্জলতা এক বাক্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন এবং এই সমস্ত গ্রন্থগুলিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রভুপাদের লেখা বইগুলি প্রায় ৫০টিরও বেশি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, যা প্রভুপাদের গ্রন্থগুলি প্রকাশ করবার জন্য ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা আজ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত বৃহত্তম গ্রন্থ-প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট এখন ৯টি খণ্ডে শ্রীল প্রভুপাদের ইংরেজী অনুবাদ ও ভাষ্য সমন্বিত বাংলা শাস্ত্রীয়গ্রন্থ *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* প্রকাশ করেছে, যা শ্রীল প্রভুপাদ কেবল ১৮ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ করেছিলেন।

কেবলমাত্র ১২ বছরের মধ্যে, এত বয়েস হওয়া সত্ত্বেও, শ্রীল প্রভুপাদ ছয়টি মহাদেশেরই বিভিন্ন স্থানে ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত ভাষণ দেওয়ার জন্য ১৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন। এই রকম কঠোর কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও শ্রীল প্রভুপাদ প্রবলভাবে তাঁর লেখার কাজ চালিয়ে যান। তাঁর গ্রন্থসমূহ হচ্ছে বৈদিক দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি প্রামাণ্য গ্রন্থাগার।

১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর অপ্রকট লীলাবিলাস করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী—"*পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম*"—সার্থক করার জন্য তিনি এখানে এসেছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করে সমস্ত জগৎকে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করার অমৃতময় পথ প্রদর্শন করে গেছেন। পৃথিবীর

মানুষ যে দিন বৈষয়িক জীবনের নিরর্থকতা উপলব্ধি করতে পেরে পারমার্থিক জীবনে ব্রতী হবেন, সেই দিন তাঁরা সর্বান্তঃকরণে শ্রীল প্রভুপাদের অবদান উপলব্ধি করতে পারবেন এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর চরণারবিন্দে প্রণতি জানাবেন। ১৯৭৭ সালে শ্রীধাম বৃন্দাবনে তিনি অপ্রকট হয়েছেন, কিন্তু আজও তিনি তাঁর অমৃতময় গ্রন্থের মধ্যে, ভগবানের বাণীর মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন। তাঁর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়াসী, তাঁদের পথ দেখাবার জন্য তিনি চিরকাল তাঁদের হৃদয়ে বিরাজ করবেন।

সমাপ্ত